L

মোটর ড্রাইভিং ও মেরামতী শিক্ষা

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মোটর ড্রাইভিং ও মেরামতী শিক্ষা

(ডিজেল ইঞ্জিনের বিস্তৃত বিবরণ)

ডিজেল ইঞ্জিন, প্রযত্ন ব্যবস্থাদি, মোটর-বিজ্ঞান
সম্পর্কে টেকনিক্যাল জ্ঞান, ট্র্যাফিক নিয়ম
কানুন, সিগ্‌ন্যাল ও বর্তমান পেট্রোল
সংকটে খরচ কমানোর উপায় সম্বলিত

বি. ডি. এম.

হরিশ পাবলিকেশন
৩৭৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

লেভেল ক্রসিং
(পাহারা আছে)

স্কুল ; সাবধানে
গাড়ি চালান

সামনে এবড়ো
খেবড়ো রাস্তা

আঁকাবাঁকা
রাস্তা (ডাইনে)

হেয়ার-পিন
বাঁক (ডাইনে)

ডাইনে ঘুরুন

সামনে ছোট
রাস্তা (ডাইনে)

খুব আস্তে—
সামনেই বড়
সড়ক

খুব আস্তে চালান

নির্দেশমত
গাড়ি চালান

স্পীড লিমিট
শেষ

৬ টনের বেশী
ওজনের গাড়ির
যাতায়াত নিষেধ

আঁকাবাঁকা
রাস্তা (বাঁয়ে)

হেয়ার-পিন
বাঁক (বাঁয়ে)

বাঁয়ে ঘুরুন

বিনা নির্দেশে
বাঁয়ে ঘুরবেন না

হাসপাতাল :
হর্ণ বাজাবেন না

সামনে ছোট
রাস্তা (বাঁয়ে)

পার্কিং নিষেধ

গাড়ি রাখার
জায়গা

সামনে চৌরাস্তা

ওয়ান-ওয়ে

প্রবেশ নিষেধ

পারাপারের
ক্ষেরি

বাস স্টপ

দ্বীপের চারধারে
ঘুরুন

ওভারটেক করা
নিষেধ

সামনে লেভেল
ক্রসিং (পাহারা
নেই)

পার্কিং নিষেধ

হর্ণ
বাজাবেন না

সামনে রাস্তা
শেষ

চিহ্নিত পথে
প্রবেশ নিষেধ

সামনে সরু
ব্রীজ

'ইউ' এর মত
মোড় নেবেন না

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী নির্মলা গুপ্ত
হরিণ পাবলিকেশন
৩৭৩, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৫

নবম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ ১৪০১

পরিবেশক ঃ
রাধা পুস্তকালয়
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য- ৫০.০০

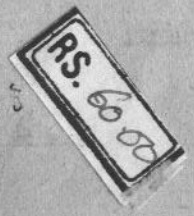

মুদ্রাকর ঃ
শীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৬, রেভারেণ্ড কালী ব্যানার্জী রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

C প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

॥ সূচীপত্র ॥

পেট্রোল খরচ কমানোর উপায় ৯
গোড়ার কথা ১৪
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ মোটর যানের প্রাথমিক কথা ১৬—৩৪

মোটর গাড়ির চেসিস ১৬ ; গাড়ির বডি ১৬ ; মোটর গাড়ির চালন পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ ১৯ ; পেট্রোল ব্যবহারকারী মোটর গাড়ি ১৯ ; পেট্রোল ও ইলেকট্রিক ব্যবহারকারী মোটর গাড়ি ১৯ ; বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ি ১৯ ; বাষ্পচালিত মোটর গাড়ি ১৯ ; ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত মোটর গাড়ি ২০ ; কেরোসিন তৈল ব্যবহারকারী মোটর গাড়ি ২০ ; মোটর গাড়ি চালানোর গোড়ার কথা ২০ ; মোটর গাড়ির বডি ও তার বিভিন্ন সরঞ্জাম ২৩ ; মাড'গার্ড ২৩ ; গদি ও পিঠ ২৩ ; বনেট ২৪ ; হর্ণ ২৪ ; উইণ্ডস্ক্রীন বা কাঁচের ফ্রেম ২৪ ; ড্যাস বোর্ড ২৪ ; মোটরের আলো ২৫ ; মোটরের ফ্রেম ২৬ ; সামনের চাকা ২৬ ; ব্যাক গ্লাস বা মিরার ২৬ ; সাইড মিরার ২৬ ; ওয়াইপার ২৬ ; সিগন্যাল লাইট ২৭ ; লাগেজ কেরিয়ার ২৭ ; বিভিন্ন ধরনের চেসিস ২৭ ; ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ গাড়ি ২৮ ; চার চাকাতে শক্তিযুক্ত বাস বা ট্রাক ২৮ ; এক্সিল ২৮ ; রিয়ার এক্সিল ২৮ ; ড্রাইভিং শ্যাফট ২৮ ; ড্রাইভিং পিনিয়ান ২৯ ; ক্রাউন পিনিয়ান ২৯ ; ফ্রন্ট এক্সিল ২৯ ; ক্রস রড বা ক্রস বার ২৯ ; টাই রড ৩০ ; স্প্রীং ৩০ ; বিভিন্ন ধরনের স্প্রীং ৩২ ; (১) হ্যালিকল কম্প্রেশান স্প্রীং ৩২ ; (২) হ্যালিকল টেনশান স্প্রীং ৩৩ ; (৩) ব্যালেট স্প্রীং ৩৩ ; (৪) মালটিপল্ লোফ স্প্রীং ৩৩ ; (৫) হুইর‍্যাল স্প্রীং ৩৩ ; শক্ এ্যাবজর্বার ৩৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ মোটরের বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন ৩৪—৪১

বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ৩৪ ; পেট্রোল ইলেকট্রিক মিশ্রিত ইঞ্জিন ৩৫ ; বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বা স্টীম ইঞ্জিন ৩৫ ; গ্যাস চালিত ইঞ্জিন ৩৬ ; ইণ্টারন্যাল কম্বাস্শন ইঞ্জিন ৩৬ ; কি কি পদার্থের দ্বারা চলে ৩৭ ; T-টাইপ ইঞ্জিন ৩৭ ; L-টাইপ ইঞ্জিন ৩৯ ; I-টাইপ ইঞ্জিন ৪০ ; V-টাইপ ইঞ্জিন ৪১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ইঞ্জিনের গঠন ৪২—৫৭

সিলিণ্ডার ৪২ ; সিলিণ্ডার ব্লক ৪২ ; মনোব্লক টাইপ ৪৪ ; প্যারালাল বা সিঙ্গল ব্লক টাইপ ৪৪ ; সিলিণ্ডার ভাল্‌ব্‌ ৪৪ ; V-টাইপ ইঞ্জিন ৪৫ ; সিলিণ্ডার মেট্যাল ৪৫ ; সিলিণ্ডার লাইনার ৪৫ ; এ্যালুমিনিয়াম সিলিণ্ডার ৪৬ ; পিস্টন ৪৬ ; পিস্টন রিং ৪৭ ; গাজন রিং বা গাজন পিন ৪৯ ; ক্র্যাঙ্ক কেস ৪৯ , কানেক্‌টিং রড ৫০ ; ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট ৫০ । ফ্লাই হুইল ৫২ ; বিয়ারিং ৫৩ ; ইঞ্জিন ভালব্‌ ৫৪ ; ভাল্‌ব্‌ সিটিং ৫৪ ; ভাল্‌বের সমষ্টি ৫৪ ; ওভারহেড ভাল্‌ব ৫৪ ; ক্যাম শ্যাফ্‌ট্‌ ৫৫ ; গ্যাস ইন্‌লেট ও এক্‌জস্ট পাইপ ৫৬ ; ইঞ্জিনের কর্মপদ্ধতি ৫৭ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ৫৭—৬০

ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিনের ক্রিয়াচক্র

সাক্‌শন স্ট্রোক ৫৯ ; কম্প্রেশন স্ট্রোক ৫৯ ; ইগ্নিশান্‌ বা এক্সপ্যান্‌শন স্ট্রোক ৫৯ ; এক্‌জস্ট স্ট্রোক ৬০ ; ফ্লাই হুইলের কাজ ৬০ ; দুই স্ট্রোকযুক্ত ইঞ্জিন ৬০ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ৬০—৭১

মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশ

ড্যাস্‌ বোর্ডের বিভিন্ন সুইচ ৬১ ; ড্যাস্‌-বোর্ডের সুইচ ৬১ ; ইগ্নিশান সুইচ (Ignition Switch) ৬১ ; চোক সুইচ (Choke Switch) ৬১ ; স্টার্টিং সুইচ (Starting Switch) ৬২ ; হেড লাইট ও সাইড লাইট সুইচ (Head Light & Side Light Switch) ৬২ ; ওয়াইপার সুইচ (Wiper Switch) ৬৩ ; ইলেকট্রিক হর্ণ সুইচ (Electric Horn Switch) ৬৩ ; মিটারসমূহ (Meters) ৬৩ ; স্পীডোমিটার (Speedometer) ৬৩ ; মাইলো-মিটার (Milometer) ৬৩ ; এম্পায়ার মিটার (Ampire Meter) ৬৩ ; হীট মিটার (Heat Meter) ৬৪ ; ফুয়েল মিটার (Fuel Meter) ৬৪ ; অয়েল মিটার (Oil Meter) ৬৪ ; ইগ্নিশান সুইচ (Ignition Switch) ৬৫ ; অয়েল চেম্বার (Oil chamber) ৬৫ ; ওয়াটার চেম্বার (Water chamber) ৬৫ ; গ্যাসকেট্‌ (Gasket) ৬৫ ; হ্যাণ্ড থ্রটল কণ্ট্রোল (Hand throttle control) ৬৬ ; পেট্রোল গেজ টেপ (Petrol Gauge Tape) ৬৬ ;

রেডিয়েটার টেম্পারেচার গেজ (Rediator Temperature gauge) ৬৬ ; ডিফার (Defar) ৬৭ ; ফায়ারিং চেম্বার (Firing chamber) ৬৭ ; স্পার্ক প্লাগ (Spark Plug) ৬ ; কারবোরেটার (Carburetor) ৬৮ ; নিড্‌ল্‌ ভাল্‌ব (Needle Valve) ৬৯ ; থ্রটল্‌ ভাল্‌ব (Throttle Valve) ৭০ ; চোক ভাল্‌ব (Choke Valve) ৭০ ; জেট (Jet) ৭০ ; ফ্লোট্‌ চেম্বার ৭০ ; বিভিন্ন ধরনের কার্বোরেটার ৭০ , (১) জেনিথ কার্বোরেটার ৭০ ; (২) এস-ইউ কার্বোরেটার ৭০ ; (৩) সোলেক্স সেল্‌ফ স্টার্টিং কার্বোরেটার ৭১ ; (৪) পাম্প সংযুক্ত কার্বোরেটার ৭১ ; (৫) হব্‌সন কার্বোরেটার ৭১ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ গাড়ি পিচ্ছিল ও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা ৭১—৭৭

গাড়ি পিচ্ছিল ও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা (Lubrication and cooling system) ৭১ ; ইঞ্জিন শীতল রাখার ব্যবস্থা ৭২ ; রেডিয়েটার বা কুলিং ট্যাঙ্ক ৭৩ ; সাক্‌শান ফ্যান (Suction Fan) ৭৫ ; (১) থার্মো সাইফন্‌ সিস্‌টেম ৭৫ ; (২) পাম্পিং সিস্‌টেম ৭৫ ; রেডিয়েটারের পরিচ্ছন্নতা ৭৫ ; কুলিং ট্যাঙ্ক (Cooling Tank) ৭৫ ; শব্দ কম করার ব্যবস্থা (Silencing system) ৭৬ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ গাড়ির আলোক ব্যবস্থা ৭৭—৮৭

সিগ্‌ন্যাল লাইট (Singnal light) ৭৮ ; স্টোরেজ ব্যাটারী (Storage Battery) ৭৯ ; ব্যাটারীর প্রকারভেদ ৮০ ; কানেকশানের প্রকারভেদ ৮০ ; ব্যাটারীর দোষ দূর করা ৮১ ; ধীরে ধীরে ব্যাটারীর চার্জ বন্ধ হয় কেন ৮১ ; ব্যাটারী তাড়াতাড়ি খারাপ হয় কেন ৮১ ; ব্যাটারীকে মরচে ধরা থেকে বাঁচাবার উপায় ৮১ ; ডিফার সিস্‌টেম ৮২ ; জেনারেটার ৮২ ; ডায়নামোর কর্মপদ্ধতি ৮৩ ; ফীল্‌ড সার্কিট ৮৩ ; শর্ট সার্কিট ৮৫ ; মেন চার্জিং সার্কিট ৮৫ ; বিদ্যুৎ উৎপন্নের প্রকারভেদ ৮৬ ; ডায়নামোর দেখাশুনা ও রক্ষণ ৮৬ ; স্টার্টার (Starter) ৮৭ ; (১) মেকানিক্যাল স্টার্টার ৮৭ ; (২) স্টার্টিং ম্যাগ্নেটো ৮৭ ; (৩) কম্প্রেসড এয়ার স্টার্টার ৮৭ ; (৪) ইলেকট্রিক মোটর স্টার্টার ৮৭ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ স্টীয়ারিং ও গীয়ার ব্যবস্থা ৮৩—১০৩

স্টীয়ারিং ব্যবস্থা ১০২ ; স্টীয়ারিং-এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ৮৮ ; রক্ষণা-

বেক্ষণ ৯০ ; স্টীয়ারিং চালনা শিক্ষা ৯০ ; গীয়ার বক্স (Gear Box) ৯২ ; গীয়ার লিভার (Gear lever) ৯২ ; গীয়ার পরিবর্তন করার কৌশল ৯৪ ; কেন গীয়ার পাল্টাতে হয় ৯৬ ; স্টীয়ারিং গীয়ার সিসটেম ৯৭ ; গীয়ার পাল্টাবার নিয়ম ৯৭ ; তৃতীয় গীয়ার ৯৮ ; চতুর্থ গীয়ার ৯৮ ; গীয়ার ডাউন করার নিয়ম ৯৯ ; গাড়ির প্যাডেল ৯৯ ; ক্লাচ প্যাডেল ৯৯ ; এ্যাকসিলারেটার প্যাডেল ১০১ ; ফুট ব্রেক প্যাডেল ১০২ ।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ ব্রেক ও তার কাজ ১০৩—১০৮

ব্রেকের প্রকারভেদ ১০৩ ; সার্ভিস ব্রেক বা ফুট ব্রেক ১০৩ ; ব্রেকের আরও নানা প্রকারভেদ ১০৬ ; মেকানিক্যাল ব্রেক্ ১০৬ ; ভ্যাকুয়াম ব্রেক্ ১০৬ ; হাইড্রলিক ব্রেক ১০৬ ; হ্যাণ্ড ব্রেক লিভার (Hand break lever) ১০৭ ।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ মোটর গাড়ির টায়ার ও টিউব ১০৮—১১২

টায়ার ১০৮ ; টিউব ১০৯ ; রিম্ ১০৯ ; টায়ার ও টিউব লাগাবার নিয়ম ১১০ ; ভল্‌ক্যানাইজিং ১১১ ; টিউবের লিক মেরামত করার নিয়ম ১১২ ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ পেট্রোল বা ফুয়েল সিসটেম ১১৩—১১৫

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ডিজেল ইঞ্জিনশিক্ষা ১১৫—১৪০

ডিজেল ও পেট্রোল ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান পার্থক্য ১১৬ ; জ্বালানী তেল (Fuel Oil) ১২০ ; ডিজেল তেল ব্যবহারের বিপদ ও প্রতিকার ১২১ ; ডিজেল তেলের গতিপথ ১২২ ; ফুয়েল পাম্প (Fuel Pump) ১২২ ; নোজ্‌ল হোল্ডার ও স্প্রে নোজল ১২৩ ; ফুয়েল পাম্পের বর্ণনা ও কাজ ১২৫ ; স্প্রে নোজলের কাজ ১২৬ ; এয়ার কম্‌প্রেসার (Air Compressor) ১২৭ ; স্টার্টিং এয়ার কম্‌প্রেসার ১২৭ ; স্ক্যাভেজিং এয়ার কম্‌প্রেসার ১২৭ ; অক্সিলিয়ারি কম্‌প্রেসার ১২৭ ; ডিজেল সিলিণ্ডার ১২৮ ; গভার্ণার (Governors) ১২৮ ; কুলিং সিসটেম (Cooling system) ১২৯ ; ডিজেল ইঞ্জিনের স্টার্টিং ১৩০ ; স্টার্টার আগে দ্রষ্টব্য ১৩২ ; ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় না কেন ১৩২ ; ইঞ্জিন ঘুরলেও জ্বালানী না জ্বালার কারণ ১৩২ ; ঠাণ্ডার জন্যে স্টার্ট না নেবার কারণ ১৩৩ ; ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করার উপায় ১৩৩ ; কিছুতেই ইঞ্জিন বন্ধ হয় না কি কারণে ১৩৪ ; ইঞ্জিনের শক্তি কম হয় কেন ১৩৪ ; ইঞ্জিন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলে কেন ১৩৫ ; ইঞ্জিন অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয় কেন ১৩৫ ; সাদা ধোঁয়া ছাড়তে থাকে কেন

১৩৬ ; কালো ধোঁয়া বের হয় কেন ১৩৬ ; ইঞ্জিন চালাবার নিয়মকানুন ১৩৬ ; ইঞ্জিনের দৈনিক যত্ন ১৩৭ ; ডিজেল ইঞ্জিনের ফিল্টার ১৩৭ ; এয়ার সিস্‌টেম ১৩৯ ; ডিজেল ইঞ্জিনের গঠন ১৩৯ ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

ডিজেল ইঞ্জিনের আরও বিশেষ কথা ১৪০—১৬৮

সাকশন স্ট্রোক ১৪০ ; কমপ্রেশন স্ট্রোক ১৪১ ; পাওয়ার স্ট্রোক ১৪২ ; একজস্ট স্ট্রোক ১৪২ । দুই স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিন, একটি মডেল ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ১৪৪ ; প্রত্যক্ষ (Direct) ইন্‌জেক্‌শন ১৪৪ । বিভিন্ন আকারের কম্বাস্‌শন চেম্বার ১৪৫ ; প্রি-কম্বাস্‌শন চেম্বার ১৪৬ ; হিটার প্লাগ ১৪৭ ; ডিজেল ফুয়েল ফিড সিস্‌টেম ১৪৮ ; ফুয়েল ইনজেক্‌শন পাম্পের গঠন ও কার্যকারিতা ১৪৯ ; ইঞ্জিনের পাওয়ার আউটপুটের নিয়ন্ত্রণ (Control) ১৫১ ; ফুয়েল ইনজেকশন ব্যবস্থা পরীক্ষা ১৫৩ ; (১) কেলিব্রেশান ব্যবস্থা ১৫৩ ; (২) ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের Phasing ব্যবস্থা ১৫৩ ; ফুয়েল ফিড পাম্প ১৫৪ ; ফুয়েল ফিড পাম্পের বিভিন্ন অংশ ১৫৫ ; হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প ১৫৬ ; ইনজেক্‌টরের বিশেষ কথা ১৫৭ ; বিভিন্ন ধরণের ইনজেকটর নোজল ১৫৮ ; সিঙ্গল হোল ১৫৮ ; মালটি হোল ১৫৯ ; পিণ্টল নোজল ১৫৯ ; ডিলে নোজল ১৬০ ; ইনজেক্‌টরনোজ্‌ল ১৬০ ; টাইমিং অফ ফুয়েল ইনজেক্‌শন ১৬১ ; ফুয়েল পাম্প গভার্নার ১৬২ ; নিউমেটিক গভার্নার ১৬৩ ; ইঞ্জিনের গতির বৃদ্ধি ১৬৫ ; ব্যাটারী ১৬৫ ; ব্যাটারীর বিভিন্ন অংশ ১৬৬ ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ ১৬৮—১৭৭

মোটর গাড়ি চালাবার বিশেষ কৌশল (Driving system) ১৬৮ ; পেট্রোল ইঞ্জিন স্টার্ট করার কৌশল ১৭৪ ; ধাক্কা (Push) দিয়ে গাড়ি স্টার্ট ১৭৫ ; চালাবার প্রথম অভ্যাস ১৭৫ ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ নানা বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা ১৭৮—১৯৩

ড্রাইভিং সিস্‌টেম্ বা ড্রাইভারের পর পর কর্তব্য ১৭৯ ; গাড়ি ওভারটেক করার কৌশল ১৮১ ; গতিপথে ওভারটেকিং ও চালানো ১৮৩ ; সামনে পূর্ণ দৃষ্টিসঞ্চার ১৮৪ ; অন্ধ গলিপথ থেকে মোড় পার হাওয়া ১৮৭ ; উঁচু-নীচু পথ

১৮৯ ; পথ ও ট্রাফিক বিষয়ে জ্ঞান ১৯০ ; মোড় ঘোরার সময় জ্ঞান ১৯০ ; গাড়ি ঘোরাবার সময় জ্যামিতিক জ্ঞান ১৯২ ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ ১৯৪—২০৪

সঠিকভাবে গাড়ি ঘোরাতে না পারার জন্য দুর্ঘটনা

জটিল পথের মোড় ১৯৯ ; পাঁচ বা ততোধিক পথের জোট ২০১ ; ভুল পাশ-অন সংকেত ২০২ । যদি পথে গাড়ি আটকে যায় ২০৩ ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ ২০৪—২১৪

ড্রাইভিং-এর উপরে আবহাওয়ার প্রভাব

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ গাড়ি রাখার নিয়ম বা গ্যারেজিং ২১৪—২১৬

গাড়ি রাখার নিয়ম ২১৪ ; বড় লরী ও বাস চালানোর নিয়ম ২১৬ ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও তার চিকিৎসা ২১৭—২২৩

আগুন নেভানো ২১৭ ; প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) ২১৯ ; অগ্নি-দগ্ধ বা আগুনে পোড়া ২১৯ ; ক্ষত (Wound) ২২০ ; হাড়ভঙ্গ (Fracture) ২২০ ; সন্ধিভঙ্গ (Fractre of joint) ২২১ ; সন্ধিতে মোচড় (Tortion) ২২১ ; কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহানো (Artificial Respiration) ২২২ ; আকস্মিক অবসাদ (Shock) ২২৩ ; ফার্স্ট এডের দরকারী বস্তু ২২৩ ।

বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ রোড সিগ্‌ন্যাল ২২৪—২৩০

সিগ্‌ন্যাল ১—আমি গতি কমাব বা থামাব ২২৫ ; সিগ্‌ন্যাল ২—আমি ডাইনে ঘুরব ২২৫ ; সিগ্‌ন্যাল ৩—আমি বাঁয়ে ঘুরব ২২৫ ; সিগ্‌ন্যাল ৪—আমাকে ওভারটেক করতে পার ২২৫ ; ব্যাক লাইট ও হাতের সিগ্‌ন্যাল ২২৬ ; ট্রাফিক পুলিশের সিগ্‌ন্যাল ২২৭ ; আলোর সিগ্‌ন্যাল ২২৮ ; ট্রাফিক সাইন ২২৮ ; পথচারীদের প্রতি পরামর্শ ২২৯ ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৩০—২৩৩

মোটর এ্যাক্ট বা মোটর গাড়ি চালাবার আইনকানুন

সাধারণ আইন ২৩০ ; লাইসেন্সের নিয়ম ২৩১ ; বিশেষ নিয়মাবলী ২৩২ ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৩৪—২৪৫

গাড়ি চালাবার বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও উত্তর

পরিশিষ্ট ২৪৬—২৫৬

সূচীপত্র সমাপ্ত

পেট্রোল খরচ কমানোর উপায়

১। ঝট্ করে স্টার্ট নিয়েই যত সত্বর পারবেন, যথাসম্ভব উঁচু গীয়ারে গাড়ি চালাবেন। ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে স্টার্ট এবং নীচু গীয়ারে গাড়ি চালিয়ে গেলে পেট্রোল খরচ বেশী হয়। আর ঝট্ করে স্টার্ট নিয়ে যত সত্বর সম্ভব্ উঁচু গীয়ারে চালালে পেট্রোল খরচ শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ কমে যাবে। এভাবে চালালে প্রতি লিটার পেট্রোল খরচ কম হবে—প্রতি মাইলে কম তেল পুড়িয়ে যেতে পারবেন।

২। আগে থেকে ঠিক করে নেবেন, কোথায় গাড়ি থামতে পারে। ধীরে ধীরে গাড়ি থামান। ঝট্ করে গাড়ি থামালে ইঞ্জিনের মধ্যে যে এনার্জী (Energy) জমে উঠেছে, তা শেষ হয়ে যাবে। অনেক পেট্রোল তাতে অযথা নষ্ট হয়ে যায়। ঘন ঘন ব্রেক ব্যবহার বন্ধ করুন। পরিছন্ন ড্রাইভিং প্রচুর পেট্রোল বাঁচায়।

৩। শহরের পথে গাড়ি চালনায় পেট্রোল খরচ কমাতে গেলে যেসব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হলো—ধীরে ধীরে স্টার্ট, কম গীয়ারে গাড়ি চালনা, ঘন ঘন ব্রেক ও বেশি উঁচু-নীচু পথে গাড়ির ঝাঁকানিকে অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। তাহলে সব মিলে মোট ৩৩ ভাগ পেট্রোল খরচ কমে যেতে বাধ্য। মফঃস্বলের লম্বা রাস্তায় যে গাড়ি ১ লিটারে ১০ কিলোমিটার যায়, তা শহরে এক লিটারে বিঃ মিঃ মাত্র যায়—তার কারণ হলো উপরের জিনিষগুলি। বুদ্ধিমানের মতো গাড়ি চালান—প্রতি পাঁচ লিটারে ১৫ থেকে ২২ কিঃ মিঃ পথ বেশি যেতে পারবেন।

৪। অতিরিক্ত স্পীড দেবেন না। ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার স্পীডে তেল খরচ কম হবে। ৮০।৯০ কিলোমিটার স্পীড দিলে তার চেয়ে পেট্রোল খরচ হবে অনেক বেশি—এমন কি শতকরা ৪০ ভাগ পেট্রোল বেশি খরচ হতে বাধ্য। তাছাড়া স্লো-ড্রাইভিং নিরাপদও বটে। পেট্রোল খরচ কম হয় ৫০।৬০ কিলোমিটার স্পীডে—তার বেশি দিলে হবে ঠিক তার উল্টো।

৫। ইঞ্জিন ঠিকমতো শব্দ না করলে, বেশি বা উল্টো-পাল্টা শব্দ করলে গাড়ির ত্রুটি—আর তাতে পেট্রোল খরচ অন্ততঃ ২০।২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রথমে কাজটা কঠিন বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তা ঠিক কঠিন নয়। চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলেই কাজটি ঠিক হবে। তা হলো—

(খ) ডিস্ট্রিবিউটার—শহরের ড্রাইভিং ও লম্বা জার্নি ড্রাইভিং-এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটার পৃথকভাবে সেট্ করতে হয়। যদি সেটে কোন গোলমাল না থাকে তাহলে শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ পেট্রোল খরচ কম হতে বাধ্য।

(খ) স্পার্ক প্লাগ—পোড়া পেট্রোলের কার্বন স্পার্ক প্লাগে লেগে ঠিকমত ফায়ারিং হতে দেয় না। তার ফলে পেট্রোল অপচয় হয় ও ইঞ্জিনের শব্দ হতে পারে। প্রতিদিন স্পার্ক প্লাগটিকে পরিষ্কার করতে হবে ও ১৫০০ কি. মি. পথ চলার পর, স্পার্ক প্লাগটিকে পাল্টে দিতে হবে।

(গ) কার্বোরেটার এ্যাডজাস্টমেন্ট—ঠিকমতো কার্বোরেটার এ্যাডজাস্ট করা না হলে গাড়িতে শব্দ হতে পারে। এর ফলে প্রতি ট্যাঙ্ক পেট্রোলে ১৫।২০ কিলোমিটার পথ আপনার নষ্ট হবে। নিয়মিত কার্বোরেটারকে ঠিকমতো এ্যাডজাস্ট করতে হবে।

(ঘ) ফুয়েল পাম্প ও ইলেকট্রিক্যাল—যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখবেন। এগুলো খারাপ হয়েছে সন্দেহ হলে ঠিক করবেন—তাহলে পেট্রোল খরচ শতকরা ১০ ভাগ কম হবে।

৬। ভাল ফিল্টার—ব্যবহার করলে বিরাট সুবিধা। ভাল ফিল্টার ব্যবহারে গাড়ি শান্ত ও পরিচ্ছন্নভাবে ছুটবে। বেশি ব্যবহার না করে নিয়মিত ফিল্টার পাল্টাতে হবে—যাতে তা জাম হয়ে না যায়। নিয়মিত ফিল্টার চেক করা ও খারাপ হলেই পাল্টানো উচিত।

তাছাড়া ফিল্টার পাল্টাবার একটা নিয়ম আছে।

তেলের ফিল্টার—প্রতি ৬৫০০ মাইল ভ্রমণের পর।

জ্বালানীর " " ৮০০০ " " "

বাতাসের " " ১৮০০০ " " "।

দ্রষ্টব্য—ভারতের অনেক গাড়ির ফুয়েল ফিল্টার বা জ্বালানীর ফিল্টার থাকে না। না থাকলে তা লাগিয়ে নিলে অনেক টাকা খরচ কম হবে।

৭। টায়ার যেন ঠিকমতো ফোলা থাকে। টায়ার ঠিকমতো ফোলা না থাকলে অনেক বেশি পেট্রোল খরচ হয়।

৮। শক্ এ্যাবজর্বার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শক্ এ্যাবজর্বার ঠিকমতো কাজ না করলে অনর্থক ঝাঁকানি দিতে থাকতে পারে—তার ফলে পেট্রোল বেশি খরচ হতে বাধ্য।

৯। পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখে গল্প করা খারাপ অভ্যাস। তাতে প্রচুর তেল বাজে খরচ হবে। কখনো ১ থেকে ২ মিনিটের বেশি থামিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয়।

১০। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিলেমিশে প্ল্যান করে ভ্রমণ করা উচিত। যে তেল খরচ হবে, তাতে যেন গাড়িতে যত জন আঁটে, সকলে ভ্রমণ করতে পারে। আবার বন্ধুর গাড়িতে একদিন ভ্রমণ করতে হবে। এই ভাবে ছক বেঁধে কাজ করলে অনেক খরচ কমানো যায়।

১১। গাড়ির কতকগুলি দোষ হবার সম্ভাবনা আছে। এগুলি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতেই হবে। যেমন—

(ক) পিছনের এগজস্ট স্মোক বেশি হলে অবশ্যই জ্বালানী ঠিকমতো জ্বলছে না বুঝতে হবে। অবিলম্বে মেরামত না করলে অযথা ভীষণভাবে পেট্রোল বাজে খরচ হবে।

(খ) কয়েকবার মোড় ঘুরে যদি ইঞ্জিনে 'ব্যাক্ ফায়ার' করতে থাকে অর্থাৎ পিছন থেকে ভট্ ভট্ শব্দ করে, অবশ্য মেরামত করাতে হবে।

(গ) পেট্রোলের বেশি কাঁচা গন্ধ বের হওয়া—মানেই কোথাও লিক হয়েছে। পেট্রোল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাইপ লাইন বা পেট্রোল লাইন চেক করতে হবে, তা না হলে ভীষণ অপচয় অবশ্যই হতে থাকবে।

(ঘ) তাপ বেশি হচ্ছে—অর্থাৎ রেডিয়েটার ঠিকমতো কাজ করছে না ও ঠান্ডা করছে না। সঙ্গে সঙ্গে মেরামত না করালে নানা ক্ষতি হতে পারে। এ্যাডজাস্টমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটার দেখতে হবে। না হলে পেট্রোল বেশি খরচ হবে।

(ঙ) ঠিকমতো ব্রেক হচ্ছে না বা গীয়ার ইত্যাদি কোন যন্ত্র কদাচ যেন ঢিলে না থাকে—তৎক্ষণাৎ তা মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন।

(চ) গাড়ি একদিকে বেশি বেঁকে থাকা মানেই ভীষণ গীয়ারের ক্ষতি ও জ্বালানী নষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করাতেই হবে—তা না হলে বিপদ ও বাজে খরচ, তা মনে রাখতে হবে

(ছ) গাড়ির ঝাঁকুনি বেশী হওয়া মানে স্প্রীং, এ্যাবজর্বার প্রভৃতির গোলমাল ; সঙ্গে সঙ্গে মেরামত না করালে পেট্রোল বাজে খরচ হতে বাধ্য।

১২। গাড়ির আর একটি প্রধান বিষয় হলো গাড়ির চাকা। এদিকে সব সময় নজর রাখবেন। দুটি সামনের ও দুটি পিছনের চাকার মধ্যে যেন পূর্ণ সমান্তরাল থাকে। তা না থাকলে বা একটু ঢিলে থাকলে অযথা গাড়ি ঝাঁকুনি খাবে। গাড়ির ঝাঁকুনি সব সময় বেশি পেট্রোল খরচ করায়।

(ক) গাড়ির চাকার হুব্‌স্‌ বিয়ারিং ঠিক আছে কিনা এবং তা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখতে হবে এবং একটু গোলমাল থাকলে তার ফলে গাড়ির অন্যান্য সব কিছু ঠিক থাকলেও গাড়ি অযথা ঝাকুনি খেতে পারে। এর পালিশ যেন ঠিক থাকে। তা না হলে এর ফলে প্রতি লিটার তেলে কিছু মাইল আপনার নষ্ট হবে।

(খ) সব সময় দেখতে হবে **স্ট্যাগ নাট** যেন ঠিক থাকে ও তা ঠিকমতো আঁটা থাকে। তা না থাকলে গাড়ির গতি ঠিকমতো হবে না। জোরে চালালে মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি খাবে গাড়ি, তার ফলে তেলের অপচয়।

(গ) **ক্রাউন ও টেল** পিনিয়ানের কোন দাঁত ভাঙা নেই তো এটা ভাল করে নজর রাখবেন। কারণ হয়তো দেখা গেল, গাড়ি অন্য সবদিকে স্বাভাবিক আছে, কিন্তু ক্রাউন বা টেল পিনিয়ানের একটি দাঁত ভাঙা থাকার জন্যে গাড়ি ঝাঁকুনি খাচ্ছে অনাবশ্যক ভাবে। এরূপ দেখা গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করিয়ে নিতে হবে। গাড়ি গ্যারেজে থাকার সময় তা খুলে ভাল-ভাবে চেক্‌ করে নিন, ওগুলোর কোনও দাঁত ভাঙা আছে কিনা।

(ঘ) **টেল বিয়ারিং** যেন সব সময় ঠিক থাকে। অনেক সময় তাতে ময়লা জমে যেতে পারে। এইভাবে তার মধ্যে ময়লা জমলে তার ফলে এটি কিছুটা জাম হবে এবং তার ফলে গাড়ি চলবে বটে ঠিকমতোই, তবে গাড়ি একটু কাঁপতে পারে বা মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দেবে। তাই টেল বিয়ারিং পরিষ্কার করে নিতে হবে নিয়মিত। যদি সন্দেহ হয় যে এটি ঠিক কাজ করছে না, তাহলে গ্যারেজে গাড়ি প্রবেশ করলে তা চেক করে নেবেন ও তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবেন। যদি মনে করেন প্রতি মাসে একবার করে এই সবগুলি

চেক্‌-আপ্‌ ও পরিষ্কার করতে হবে। যদি বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশান ঠিক না থাকে, তাহলে তা লুব্রিকেট করে নিতে হয়।

(ঙ) ক্রাউন ও টেলের এ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট ঠিক আছে কি না তা ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। এই এ্যাড্‌জাস্টমেণ্টে একটু গোলমাল থাকলে গাড়ি মাঝে মাছে ঝাঁকুনি খেতে পারে। তার ফলেও তেল খরচ বেশি হবে।

১৩। সব সময় আপনি যখন বাড়ি থেকে বের হবেন, তখন পর পর কোথায় কোথায় যাবেন তা আগে থেকে মনে মনে ছক করে নেবেন। তা না করলে আপনাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ করার মধ্যে হয়তো বেশি ঘুরতে হলো। আজকের যুগে পেট্রোল বেশি খরচ করা যে অন্যায় তা নিশ্চয়ই আপনি মানতে বাধ্য।

১৪। যদি একান্ত প্রয়োজন না হয়, তা হলে লম্বা জার্নি পরিহার করা উচিত। যদি সুবিধা থাকে এবং অন্যভাবে লম্বা জার্নি সহজে করা যেতে পারে বোঝেন, তা হলে আজকের তেলের অভাবের দিনে অনর্থক মোটরে করে লম্বা **ভ্রমণ যতটা সম্ভব** পরিহার করে চলার চেষ্টা করুন।

সব শেষে বক্তব্য—প্রতি তিন মাস অন্তর, কারণ থাক বা না থাক, **মেকানিককে** দিয়ে গাড়ি চেক করানো ও সার্ভিসিং প্রয়োজন, তাতে অনেক **সুফল পাওয়া** যেতে পারে।

———

গোড়ার কথা

আধুনিক মোটরগাড়ি বা স্বয়ংচালিত স্থলযান, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Automobile road vehicle—তা হলো অনেকগুলি জটিল যন্ত্রের সমষ্টি।

দিনের পর দিন এইসব যন্ত্রের নানা অংশ নিয়ে গবেষণা চলছে। তার ফলে দিনে দিনে এই স্থলযানের প্রচুর উন্নতিও হয়েছে এবং হচ্ছে।

এখন একটা কথা হলো, এই যানের প্রতিটি অংশের কার্যকারিতা না জানলে ভালভাবে মোটর চালনা শিক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করলেই গাড়ি চালানো যায়। কিন্তু সেটা বেশ ভালভাবে প্র্যাকটিস বা অভ্যাস করতে হবে। তাছাড়া গাড়ি চালাবার বিভিন্ন নিয়ম ও ভারতীয় মোটরগাড়ির আইনকানুন (১৯১৪ সালে প্রবর্তিত ৮নং আইন) সম্পর্কে ও জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে।

মোটরযান এমন একটি যন্ত্র, যার একটি অংশ যদি খারাপ হয়ে যায় এবং তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা না হয়, তাহলে তার সঙ্গে যুক্ত অন্য অংশগুলিও খারাপ বা বিকল হয়ে পড়তে পারে। তাই জটিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে জ্ঞান না থাকলেও মোটরের সাধারণ পার্টসগুলির বিষয়ে ও তার মেরামতী বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান মোটরচালকের থাকা অবশ্য কর্তব্য।

মোটরযান নানাধরনের আছে। যেমন, পেট্রোল ইঞ্জিনযুক্ত মোটরগাড়ি, ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত মোটরগাড়ি, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাযুক্ত গাড়ি প্রভৃতি। এই সব বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ইঞ্জিনের সাহায্যে গতিবেগ সংগ্রহ করে গাড়ি চালানোই হলো মোটরগাড়ির মূল কথা। এই গতিবেগ কতভাবে ও কি কৌশলে সঞ্চালিত হয়—তা প্রথমে জানতে হবে।

বর্তমান গ্রন্থে অতি সহজ, সরল ভাষায় মোটরগাড়ির বিভিন্ন অংশের পরিচয়, মোটর ড্রাইভিং-এর কৌশল ও আইনকানুন থেকে মোটরের কোনও অংশ খারাপ হলে তা কি করে ধরা যাবে এবং তা কি উপায়ে মেরামত করতে হবে—এসব বিষয়েই সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়াও গাড়ির

বিভিন্ন অংশের সহজ স্কেচ বা ছবি দিয়ে সহজে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতটা সরলভাবে বিষয়গুলি বোঝানো যায়, তার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে এবিষয়ে একটা কথা ; বিভিন্ন পার্টস সম্পর্কে যে-সব আলোচনা ও ছবি দেওয়া হলো, তা বাস্তব পার্টস দেখে মিলিয়ে নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে, বোঝা খুব সহজ হবে।

তাছাড়া বই পড়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে সব পরীক্ষা করে দেখলেও খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষালাভ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া নিয়মিত কিছুদিন ধরে ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করতে হবে।

তবে বর্তমান বইটিকে যদি মোটরের সবকিছু শিক্ষার একটি মূল চাবিকাঠি রূপে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এটি একটি আদর্শ 'মোটর শিক্ষক' রূপে কাজ করবে একথা বলা চলে।

মোটর চালনা এবং মেরামতী শিক্ষা করতে যাঁরা আগ্রহী, এটি তাঁদের কাছে যদি মূল্যবান গ্রন্থ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক।

এই বই সম্পর্কে যে-কোনও ভাল-মন্দ সমালোচনা সাগ্রহে আমন্ত্রিত হচ্ছে।

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোটরযানের প্রাথমিক কথা

এমন একদিন ছিল, যখন শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি নানা ধরনের জন্তুর সাহায্যে যানবাহন চলাচল করত।

কিন্তু তারপর আবিষ্কৃত হলো, বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে চালিত স্বয়ংযান। শক্তিকে গতিশক্তিতে পরিণত করা করা যায়, এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রথম পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন মহাত্মা হেনরী ফোর্ড।

তাঁর সৃষ্ট মোটরগাড়ির প্যাটার্ন আর আজকের দিনের নানা আকৃতির মোটরযানের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এমনকি যে থিওরীর উপরে নির্ভর করে তিনি তাঁর প্রথম মোটরযানটি চালু করেছিলেন তার সঙ্গে আজকের দিনের মোটরযানের অনেক পার্থক্য।

আজকের দিনে নানা ধরণের মোটরযান আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তার মধ্যে অন্তর্দাহ ইঞ্জিনযুক্ত (Internal combustion engine) মোটরগাড়িই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। অত্যন্ত হালকা ধরনের এই ইঞ্জিনযুক্ত মোটরগাড়ির থেকে শুরু করে এই পদ্ধতিতে লরী, বাস প্রভৃতি সব কিছুই তৈরি করা হয়।

মোটরগাড়িতে নানা ধরনের কলকব্জা থেকে শুরু করে ইঞ্জিন, বডি সব কিছু মিলিয়ে যে জটিল অংশ তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **মোটরগাড়ি চেসিস** (Chassis)—চেসিস হলো মোটরগাড়ির নিচের অংশ—যার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে ইঞ্জিন, ইঞ্জিন চালাবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও তার নিচে সংলগ্ন চাকা পর্যন্ত সবটুকু।

এই চেসিসটাই হলো মোটরগাড়ির মূল অংশ। এটা আপনা থেকেই গতিশক্তিসম্পন্ন—এটাই হলো গাড়ির গতিবেগের উৎস।

২। **গাড়ির উপরের অংশ বা বডি** (Body)—এতে থাকে গাড়ির উপরের বাইরের আবরণ, দরজা, বসার সীট প্রভৃতি। আজকাল সকলেই বডির সঙ্গে বিদ্যুৎ কানেকশন যুক্ত করে গাড়ির ভেতরটা আলোকিত করেন। অনেকে ট্রানজিস্টার, ওয়্যারলেস সেট, ইলেক্ট্রিক ফ্যান প্রভৃতিও যুক্ত করেন।

গাড়ির দেহ বা বডি সম্পর্কে কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তার কারণ বডির সঙ্গে গাড়ির গতির কোনও সম্পর্ক নেই। গাড়ির চালনা ও

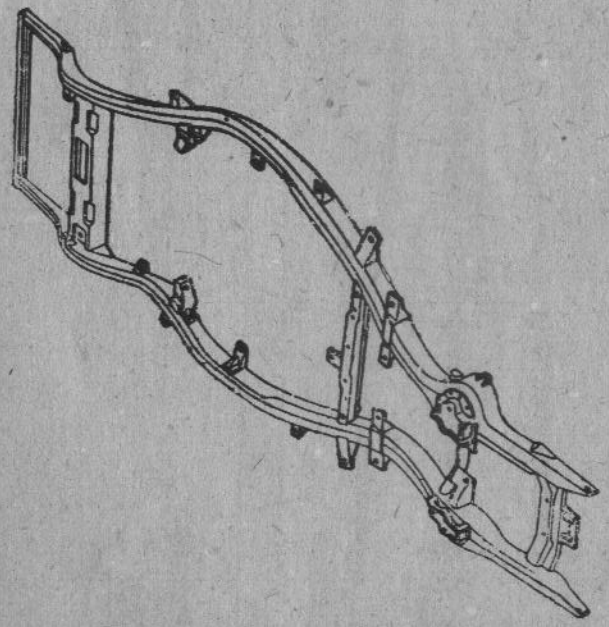

মোটরগাড়ির ফ্রেম

মেরামতী শিখতে হলে তাই চেসিস—বিশেষ করে ইঞ্জিন ও তার চালাবার ব্যবস্থা সম্পর্কেই বেশি করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

চেসিসের নির্মাণের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন হলো গাড়ির ফ্রেম (Frame)—যার সঙ্গে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ ও চাকা প্রভৃতি যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ চেসিসটি নির্মিত হয়।

চাকা অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে গাড়ির সঙ্গে না আটকিয়ে স্প্রিং-এর মাধ্যমে লাগানো হয়। তার ফলে গাড়ি চলতে চলতে ধাক্কা খায় না। উঁচু-নীচু পথে

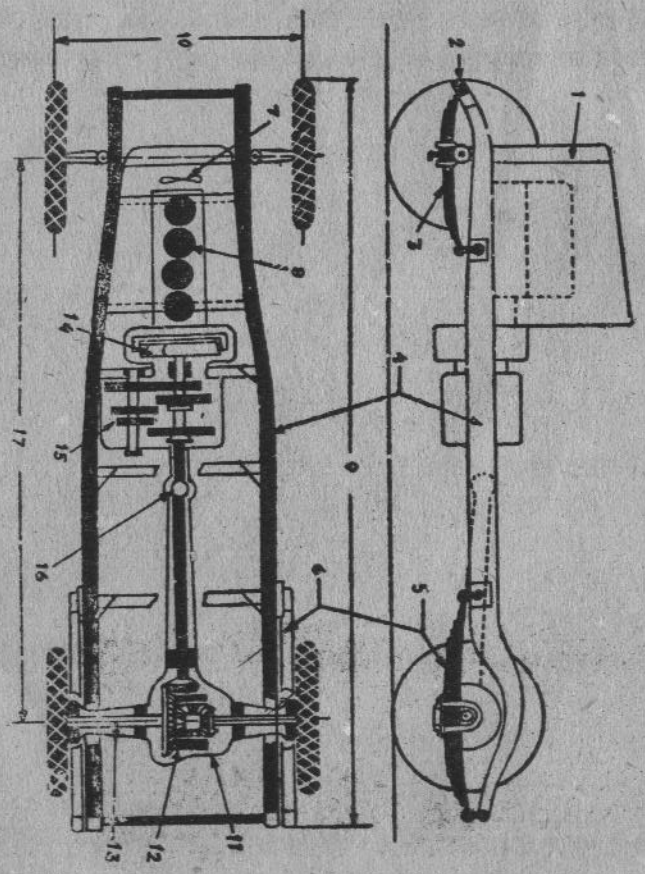

মোটরগাড়ির চেসিস ক। নিচের দৃশ্য। পার্শ্ব দৃশ্য

১। রেডিয়েটার ; ২। ডাম্‌ব আয়রণ ; ৩। সেমি এলিপটিক স্প্রিং ; ৪। চেসিস ফ্রেম ; ৫। সেমি এলিপটিক স্প্রিং ; ৬। স্প্রিং ; ৭। কুলিং ফ্যান ; ৮। ইঞ্জিন ; ৯। ওভারল্‌ লেংথ ; ১০। হুইল ট্রাক ; ১১। কেসিং ; ১২। ডিফারেন্সিয়াল গীয়ার ; ১৩। রিয়ার অ্যাক্সিল , ১৪। ফ্রিকসান ক্লাচ্‌ ; ১৫। গীয়ার বক্‌স ; ১৬। ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ; ১৭। হুইলবেস্‌।

ওঠা-নামা করলেও ভেতরের যাত্রীরা এই স্প্রিং-এর জন্য তা অনুভব করেন না।

১৭নং পৃষ্ঠায় একটি ফ্রেমের ছবি দেওয়া আছে। এই ফ্রেমটির সঙ্গে চাকা ইঞ্জিন ও বিভিন্ন অংশ যুক্ত হয়নি। এটি হলো চেসিসের গোড়ার অংশ।

১৮নং পৃষ্ঠায় অন্তর্দাহ ইঞ্জিনযুক্ত একটি মোটরগাড়ির সম্পূর্ণ চেসিসের ছবি দেখানো হলো। এর সঙ্গে ইঞ্জিন, শ্যাফট, চাকা প্রভৃতি সবকিছু যুক্ত হয়ে তার সঙ্গে বডি যুক্ত হলে তা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মোটরগাড়ি।

এবার মোটরগাড়ি বা স্বয়ংচালিত গাড়ি কত ধরনের হয় তা বলা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের চালাবার পদ্ধতি অনুযায়ী এগুলির গঠন ও বিভিন্ন।

মোটরগাড়ির চালন-পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ

গাড়ির চালন-পদ্ধতির পার্থক্য অনুযায়ী মোটরগাড়ি নানা ধরনের হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন মোটরগাড়ি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

১। **পেট্রোল ব্যবহারকারী মোটরগাড়ি** (Petrol engine)—এই ধরনের গাড়িতে পেট্রোল ইঞ্জিনই প্রধান। পেট্রোল ইঞ্জিনের শক্তি ও ক্ষমতাকে নানা যন্ত্রাদির সাহায্যে চাকার মধ্যে সঞ্চালিত করা হয় ও গাড়ি চলে।

২। **পেট্রোল ও ইলেকট্রিক ব্যবহৃত মোটরগাড়ি** (Petrol and Electric car)—এই মটরগাড়িতে যদিও পেট্রোল ও ইলেকট্রিক ব্যবহৃত হয়, তাহলেও এতে পেট্রোলই প্রধান। তবে এই মোটরে মূল ইঞ্জিনের গতিশক্তি প্রত্যক্ষভাবে চাকায় সঞ্চালিত না হয়ে তা একটি ডায়নামোর মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটিতে রূপান্তরিত হয় ও তার শক্তিতেই গাড়ি চলে। তাই একে পেট্রোল ইলেক্‌ট্রিক মোটরগাড়ি বলে।

৩। **বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ি** (Electric car)—এই গাড়িতে কতকগুলি বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটির সঞ্চয়-কোষ থাকে। তাকে বলা হয় অ্যাকিউমুলেটার (Accumulater)। এর সাহায্যেই বৈদ্যুতিক মোটরগাড়ি চলে। এটি অনেকে পছন্দ করেন। এবিষয়েও অল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। **বাষ্পচালিত ইঞ্জিনযুক্ত মোটরগাড়ি** (Steam engine car)—এই গাড়িতে জল থেকে বাষ্প তৈরি করে, যে শক্তি তৈরি হয় তা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই স্টীম ইঞ্জিন সাধারণতঃ রেলগাড়ি চালাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকে মোটরগাড়িতেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

৫। **ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত মোটর গাড়ি** (Diesel engine car)—এই ইঞ্জিনের বেশ গাঢ় জ্বালানী তেল বা ডিজেল অয়েল ব্যবহৃত হয়। এতে পেট্রোল ইঞ্জিনের মতোই প্রত্যক্ষভাবে গতি চাকায় সঞ্চালিত হয়।

৬। **কেরোসিন তেল ব্যবহারকারী মোটরগাড়ি** (Kerosine engine car)—সাধারণতঃ মোটরগাড়িতে এটি ব্যবহৃত হয় না, ট্র্যাক্টর বা রাস্তার রোলার প্রভৃতির ইঞ্জিন এই ধরনের হয়। এতে কেরোসিন তেল পুড়িয়ে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

এইসব নানা ধরনের বস্তু ব্যবহার করে তা থেকে শক্তির সৃষ্টি করে, সেই শক্তিকে চাকায় পৌঁছে দেওয়া ও গাড়ীকে গতিবিশিষ্ট করাই হলো মোটর-গাড়ির মূল কথা।

ইঞ্জিনের মধ্যে প্রথম যা উৎপন্ন হয়, না হলো তাপশক্তি বা Heat।

তাপশক্তি পরে রূপান্তরিত হয় গতিশক্তি বা Speed-এ। এই গতিশক্তিকে আবার ইচ্ছামত কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থাও থাকে—যার দ্বারা গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ বা control করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার মোটরযানের নির্মাণপ্রণালী ও তার কার্যকারিতার বিষয়ে **পরে বিস্তৃত** আলোচনা করা হবে। আমরা প্রথমে সাধারণ মোটরগাড়ির **ড্রাইভিং সম্পর্কে** কিছু আলোচনা করছি।

মোটরগাড়ি চালানোর গোড়ার কথা

মোটরগাড়ি চালাতে গেলে সবার আগে শিখতে হবে গাড়ির স্টিয়ারিং **সম্পর্কে ও কি করে** স্টিয়ারিং দ্বারা গাড়িকে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো যায়।

স্টিয়ারিং-এর যোগ থাকে মাত্র দুটি সামনের চাকার সঙ্গে। পেছনের দুটি চাকার সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই। সামনের দুটি চাকা ঘুরলেই গাড়িটি আপনা থেকেই ঘুরে যায়।

পরপৃষ্ঠার ছবিতে কিভাবে গাড়ির সামনে দুটি চাকার সঙ্গে স্টিয়ারিং-এর যোগ থাকে ছবি দিয়ে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। চাকার সঙ্গে যে রডটি দিয়ে স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে যোগ থাকে, তাকে বলা হয়—স্টিয়ারিং আর্ম (Steering arm) এর সঙ্গে একটি বড় রড দুটি দিকের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

তাকে বলে Realy rod। এর একপ্রান্তে থাকে pitman's arm—যার সঙ্গে যুক্ত থাকে স্টিয়ারিং হুইলটি। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটি ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোরানো যায়। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

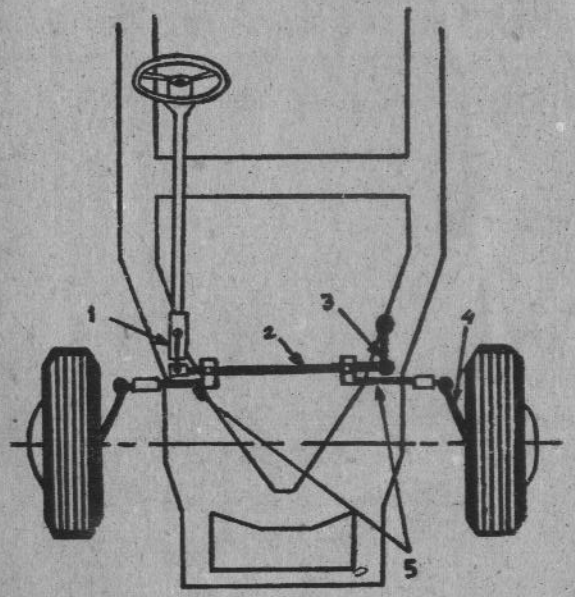

মোটরগাড়ির ফ্রন্ট অ্যাক্সিল ও স্টিয়ারিং

১। আইডলার আরম্; ২। রিলে রড; ৩। পিটম্যানস্ আরম্; ৪। স্টিয়ারিং আরম্; ৫। টাই রডস্।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে স্টিয়ারিং মাঝখানে আছে গাড়ি ঠিক সোজা চলছে। স্টিয়ারিং হুইলটি ডানদিকে ঘোরানো হলে গাড়ির সামনের দুটি চাকা ডান দিকে বেঁকে যাবে ও গাড়িটিও ডানদিকে বেঁকে যাবে।

এখন এই স্টিয়ারিং ঘোরানো সব সময় সমান হয় না। কম-বেশি ঘুরিয়ে গাড়িকেও কম-বেশী বাঁকানো যায় বা গাড়িকে বেশি পরিমাণে ডাইনে-বাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সাধারণতঃ এইভাবে কতট। ঘুরিয়ে গাড়িয়ে কতটা ডাইনে ও বাঁয়ে নিতে হবে তা অনেকটা অভ্যাস-সাপেক্ষ। ভাল ড্রাইভার ঠিকমতো এই ডাইনে বাঁয়ে বাঁকানোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গাড়ি যখন পূর্ণগতিতে চলছে তখন দ্রুত এই নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করতে হবে, তা না হলে অ্যাক্সিডেণ্ট হতে পারে।

গাড়ির গতি বৃদ্ধি করে অ্যাকসিলারেটর। ক্লাচ (Clutch)-এর কাজ হলো ফ্লাই হুইল থেকে ইঞ্জিনের গতি নিয়ে গীয়ার বক্স শ্যাফট্‌কে সেই শক্তি প্রদান করা। প্রত্যেকটি পার্টস সম্পর্কে পরে বিস্তৃত বলা হয়েছে।

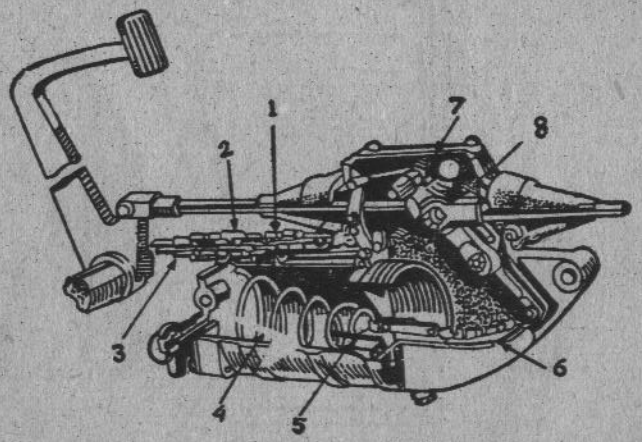

মোটরগাড়ির ব্রেক

১। অ্যাটমস্‌ফিরিক ভাল্‌ব, ২। সাক্সন ভাল্‌ব, ৩। ইণ্ডাক্সন পাইপের সংযোগ স্থল, ৪। স্প্রিং, ৫। পিস্টন, ৬। অয়েল ট্যাঙ্ক, ৭। ব্রেক, ৮। ফালক্রাম।

সব সময় বন্ধ অবস্থায় গাড়িতে চাবি দেওয়া থাকে। গাড়ি চালু করা হয় *পার্ক প্লাগ দিয়ে। এতে অটোমেটিক ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের জ্বালানীকে *পার্ক দিয়ে চার্জ করা হয়। উপযুক্ত পরিমাণে জ্বালানী যাতে সঙ্গে সঙ্গে চার্জ নেয় সেইজন্যে এটির কার্যকারিতা ঠিকমতো থাকা উচিত।

গতিশীল গাড়িকে যে-কোন কারণে থামাতে হলে, চাকার গতিকে বন্ধ করতে হবে। এই কারণেই গাড়িতে ব্রেক থাকে। চাকার হুবসের কাছে ব্রেক ড্রাম ফিট্‌ করা হয়—তাকে ব্রেক 'সু' দ্বারা চেপে চাকার গতিরোধ করা হয়। আধুনিক মোটরগাড়িতে মোটরের চারটে চাকার সঙ্গেই 'ব্রেক' ফিট করা থাকে। তাহলে অতি সহজে গাড়ির গতিরোধ করা যায়, আবার সহজে গতি-বৃদ্ধিও করা যায়।

অতি দ্রুতিগতিতে চলার সময়, হঠাৎ ব্রেক করা উচিত নয়—ধীরে ধীরে ক্লাচকে বিযুক্ত করে গ্যাস কমিয়ে ধীরে ধীরে ব্রেক করতে হয়। পূর্বপৃষ্ঠায় একটি ছবির দ্বারা কিভাবে ব্রেক কাজ করে, তা বোঝানো হয়েছে। বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মোটরগাড়ির বডি ও তার বিভিন্ন সরঞ্জাম

যার উপরে আরোহীরা বসে তাক বলে সীট। এই সীট ও তার সঙ্গে যুক্ত দরজা ও মোটরগাড়ির উপরের আবরণ সবকিছু মিলে তৈরী হয় মোটরের বডি। এই বডি নানা আকারের হয়। কখনো ডিম্বাকৃতি, কখনো টর্পেডোর মতো, কখনো অর্ধচন্দ্রাকৃতি। বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন আকৃতির মোটরগাড়ি তৈরি করে থাকেন। যেমন অ্যামবাসাডার, ফিয়েট, *ট্যাণ্ডার্ড কারের বডিগুলি।

মাড্‌গার্ড (Mudguard)—আজকাল মাডগার্ড নানা আকারের তৈরি হচ্ছে। মাডগার্ড গ্যাল্‌ভানাইজড বা ব্ল্যাক শিট্‌ দিয়ে তৈরি। বিদেশে আরও নানাবস্তু দিয়েও এটি তৈরি হচ্ছে—যেমন প্লাস্টিক প্রভৃতি।

মাডগার্ড এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত, যেন গাড়ির চাকা ঘুরলে রাস্তার কাদা উপরে না ওঠে।

গদি ও পিঠ—দামী দামী মোটরগাড়ির গদি ও পিঠ দামী চামড়া দিয়ে তৈরি হয়। আজকাল অবশ্য প্রায়ই অপেক্ষাকৃত কমদামী নকল চামড়া বা ইমিটেশন লেদার অথবা অয়েল ক্লথ দিয়ে গদি তৈরি করা হয়। নকল লেদার

দেখলে, আসল চামড়ার সঙ্গে তার পার্থক্য সহসা বোঝা যায় না—তবে আসল লেদার যতদিন টেকে, নকল চামড়া ততটা টেকসই হয় না। আধুনিক দামী মোটরে গদি ও পিঠের মধ্যে স্প্রিং এবং ছোবড়া প্রভৃতি দিয়ে ভেতরটা ভর্তি করা হয়। এই ভর্তির কাজ বা স্টাফিং যত ভাল হবে তত বেশিদিন এটি টিকবে। গদি ও পিটের উপরে পৃথক একটা ঢাকনা বা কভার করলে ভাল হয় —মোটা কাপড় দিয়ে এটি করাতে হয়।

বনেট (Bonnet)—ইঞ্জিনের উপরে যে ঢাকনা থাকে, তাকে বলে বনেট। প্রয়োজন হলে এটি একটানে তুলে ইঞ্জিন মেরামত করা হয়। আবার তারপরেই ঠিক আগের মতোই এটি টেনে নামিয়ে দেওয়া হয়।

বনেট তুললে তা স্প্রিং-এর সাহায্যে আটকে থাকে। কিন্তু স্প্রিং নষ্ট হয়ে গেলে তা Rod-এর সাহায্যে আটকে কাজ করা হয়।

হর্ন (Horn)—ড্রাইভার যেখানে স্টিয়ারিং নিয়ে বসে, তার ডানদিকে হর্ন থাকে। এটি পথচারীদের সতর্ক করে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ আগে হাত দিয়ে টেপা রবারের হর্ন ব্যবহৃত হতো। আজকাল ইলেকট্রিক হর্ন ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রিক হর্নের শব্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় ও বেশী জোর হয়। স্টিয়ারিং হুইলের ঠিক মাঝখানে স্টিলের একটি গোল চাকা বসানো থাকে। এটিই হলো ইলেকট্রিক হর্ন।

উইণ্ড স্ক্রীন বা কাচের ফ্রেম (Wind sereen or Glass frame)—ড্রাইভারের ঠিক সামনের কাচখানিকে বলে উইণ্ড স্কীন বা কাচের ফ্রেম। উপরের বা নিচের এই কাঁচে জল পড়লে ড্রাইভারের পথ দেখতে অসুবিধা হয়। আধুনিক মোটরগাড়িতে কাচের জল পরিষ্কার করার জন্য ওয়াইপার (Wiper) ব্যবহৃত হয়।

ড্যাস বোর্ড (Dash Board)—ড্রাইভারের সামনে তার সীটের ঠিক সম্মুখের দিকে যে বোর্ডটা থাকে তাকে বলে ড্যাস বোর্ড। এতে মিটারগুলি ঘড়ি, সুইচগুলি যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ এই ড্যাস বোর্ড লোহার বা কাঠের হয়। গাড়ি কত কিলোমিটার চলল, তা জানা যায় মাইলোমিটার থেকে। (পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।)

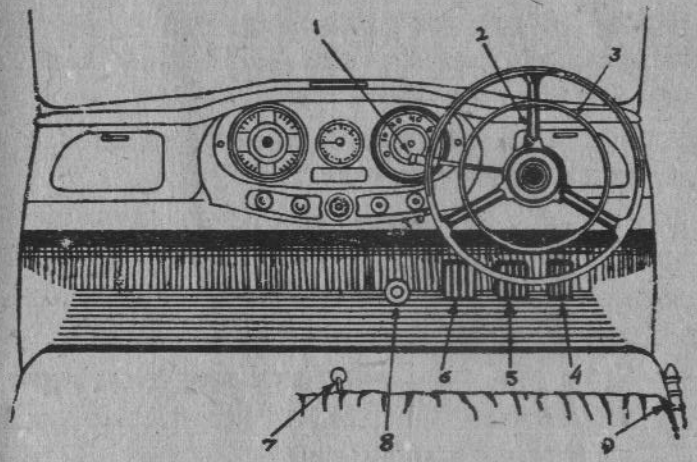

ড্যাস বোর্ড

১। গীয়ার লিভার, ২। স্টিয়ারিং, ৩। হর্ন রিং, ৪। অ্যাকসিলারেটর ৫। ব্রেক, ৬। ক্লাচ, ৭। সিট অ্যাডজাস্টমেণ্ট, ৮। হেডলাইট সুইচ, ৯। হ্যাণ্ড ব্রেক।

মোটরের আলো (Light System)—মোটরগাড়িতে অনেক আলো থাকে। দুটি হেডলাইট চেসিসের ঠিক সামনে সংযুক্ত থাকে। এটি রাতের বেলা সামনের পথ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। দুটি সাইডলাইট থাকে মাড্‌গার্ডের ওপরে বা উইণ্ড স্ক্রীনের দুই পাশে। পেছনে থাকে একটি ব্যাকলাইট। নাম্বার প্লেট পড়ার জন্য ও পেছনে লাল সংকেত দেবার জন্য এই ব্যাকলাইট ব্যবহৃত হয়—যাতে পেছনের গাড়ি সতর্ক হতে পারে।

এছাড়া মোটরের ভেতরে পেছনের আরোহীর মাথার ওপরে একটি আলো থাকে। যখন গাড়ির ভেতরটা আলো করার দরকার হয় তখন এটি জ্বালা হয়। এর বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়, গাড়ির স্টোরেজ ব্যাটারী থেকে। ব্যাটারীর সঙ্গে বিভিন্ন লাইট ও সুইচের যোগ থাকে।

মোটরের ফ্রেম

মোটরের ফ্রেম হলো মোটরের চেসিসটির মূল ধারক বিশেষ—অর্থাৎ যে জিনিসটার নিচে ফ্রন্ট এক্সিল (Front axle) ও রীয়ার এক্সিল (Rear axle) লাগানো হয়ে থাকে। এই এক্সিলের চার মাথায় চারটি চাকা বা হুইল লাগানো হয়ে থাকে। মোটরগাড়ির ফ্রেম হলো তাই নিচের অংশের মূল বস্তু —যার সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রাদি যুক্ত হয়ে মূল মেসিনটি তৈরি হয়।

সামনের চাকা

সামনের দুটি চাকা মোটরগাড়ি চলার বা মোড় নেবার এবং যেদিকে খুশি তাকে চালাবার প্রধান উপাদান। কি করে চাকা ঘুরিয়ে গাড়িকে ডাইনে বা বাঁয়ে নেওয়া যায়, তা পরে আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক সামনের চাকার ঘোরা অনুপাতে গাড়ি ঘুরলে, পেছনের চাকা আপনা থেকেই ঘুরে যায়। স্টিয়ারিং দিয়ে গাড়িকে কণ্ট্রোল করার এটাই মূল অংশ। কোন কোনও মোটরগাড়িতে সামনে ও পেছনের উভয় চাকাই central গীয়ার বক্স ও প্রপেলার শ্যাফটের সাহায্যে ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয়।

ব্যাক ভিউ গ্লাস বা মিরার

মোটরের ঠিক ড্রাইভারের সিটের সামনে একটি আয়না থাকে, যার সাহায্যে ড্রাইভার পেছনের সব কিছু দৃশ্য সামনে তাকিয়েই দেখতে পায়—তাকে পেছনে তাকাতে হয় না—তাকে ব্যাক ভিউ গ্লাস বা মিরার বলে। এটি ইচ্ছামতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যায়।

সাইড মিরার

অনেক আধুনিক গাড়িতে ব্যাক গ্লাসের মতো ঠিক পাশে দুটি গ্লাস থাকে। তার ফলে এই সব গাড়িতে দু'পাশেও তাকাতে হয় না—সেই আয়নাতে দুপাশের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়—তাকে সাইড মিরার বলা হয়।

ওয়াইপার

উইণ্ড স্ক্রীনের ওপরে দুটি স্টীলের রডের মতো জিনিস দেখা যায়—তাকে বলে ওয়াইপার। এর প্রান্তে একটি করে ব্রাশ থাকে, যা বর্ষাকালে জল পড়লে উইণ্ড স্ক্রীনকে পরিষ্কার করে। এটি ব্যাটারীর দ্বারা চালিত হয়। বর্ষাকালে জল পড়লে, ড্রাইভারের পথ দেখতে অসুবিধে হয় বলেই এটির প্রয়োজন।

সিগন্যাল লাইট

গাড়ির পেছনের দিকে এবং দুই দরজার মাঝখানে যে আলো থাকে তাকে সিগন্যাল লাইট বলে। গাড়ি ঘোরাবার বা থামাবার সময় রাত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। সুইচ টিপলে এই আলো জ্বলতে ও নিভতে থাকে। যেদিকে গাড়ি ঘোরাবার প্রয়োজন হয় সেই দিকের লাইট জ্বালানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন গাড়ির সুইচ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত থাকে—তবে সাধারণতঃ স্টিয়ারিং হুইলের মাঝখানে এটি অবস্থিত থাকে।

লাগেজ ক্যারিয়ার

মোটরের ঠিক পেছনে মালপত্র বহন করার জন্য একটি বড় খোল থাকে। পেছনের দিকে একটি ঢাকনা তুলে, এই ক্যারিয়ারে মালপত্র বোঝাই করা হয়, আবার তারপর ঢাকনা নামিয়ে দেওয়া হয়। আগেকার দিনে এটি গাড়ির পেছনে পৃথক ভাবে লাগানো থাকত—আজকাল গাড়ির ভেতরের দিকে থাকে বলে দেখতে ভাল দেখায়।

বিভিন্ন ধরনের চেসিস

যদিও সব মোটরগাড়ির চেসিসের আকৃতি আর শক্তি সঞ্চালিত করার ক্ষমতা একই রকম, তবুও খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলেই নানা পার্থক্য দেখা যাবে। ছোট গাড়ির চেসিস তৈরিতে খরচ কম হয় বটে, তবে তার নিখুঁত ছোট ছোট কলকব্জা তৈরি করা একটু কষ্টসাধ্য ও চালানোও ঠিক তাই। একটু বড় মোটর দেখতে সুন্দর হয়, কলকব্জাও বেশ মজবুত ও তাতে বেশী শক্তি সঞ্চালন করার সুবিধে হয়। পাহাড়ী-রাস্তায় উঠতে গেলে একটু বড় মোটরই সুবিধেজনক—কারণ তার অশ্বশক্তি বেশী থাকে। তিন চাকাযুক্ত গাড়িতে (টেম্পো প্রভৃতি) দুটি সিলিণ্ডার যুক্ত V আকারের ইঞ্জিন থাকে যা বাতাসের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা হয়। সিলিণ্ডার ইঞ্জিন জল দ্বারাও ঠাণ্ডা করা হয় (water cooled)।

বড় গাড়ির চেসিস্ সাধারণতঃ ছোট গাড়ির থেকে বেশি লম্বাটে হয়। অনেক গাড়িরও সামনের অংশে ট্রান্সভারস্ স্প্রিং থাকে। বড় গাড়ি ২০—২৮ হর্স পাওয়ার-এর হয়।

ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ গাড়ি

বেশীর ভাগ গাড়িতেই পেছনের চাকা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে গাড়িকে চালনা করে—সামনের চাকা দুটি গাড়ি ঘোরাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ গাড়িতে সামনের চাকাতেই গাড়ির শক্তি ও ঘোরাবার ব্যবস্থা একসঙ্গে থাকে বলে গাড়ি মোড় ঘোরাবার সময় উল্টো দিকে ঘুরে যেতে অর্থাৎ স্কীড্ করতে পারে না। তাই কাজের সুবিধার দিক থেকে এই প্রকার গাড়িই অনেক উপযোগী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

চার চাকাতে শক্তিযুক্ত বাস বা ট্রাক
(Four Wheel Drive)

ভারী বাস বা ট্রাকে সামনের ও পেছনের দু'জোড়া চাকাতেই শক্তি সঞ্চালিত করার ব্যবস্থা আছে। ভারী গাড়ীর পক্ষে ও বেশী মাল বহন করার কাজে এ ধরনের ব্যবস্থা বেশ উপযোগী হয়।

এক্সিল (Axle)

গাড়ির সামনের দিকে একটি ও পেছনের দিকে দুটি এক্সিল থাকে। সামনের এক্সিলের সঙ্গে স্টার এক্সিলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে সামনের দুটি চাকা। দুটি ব্যাক বা রীয়ার এক্সিলের সঙ্গে ডিফারেন্সিয়্যালের মাধ্যমে পেছনের দুটি চাকা যুক্ত থাকে।

রীয়ার এক্সিল (Rear Axle)

রীয়ার এক্সিল স্থাপনের নানা ধরণের ব্যবস্থা আছে। যেমন সেমিফ্লোটিং বা অর্ধ ভাসমান, তিন-চতুর্থাংশ ভাসমান এবং পূর্ণ ভাসমান বা Full Floating system। শেষের দুটি পদ্ধতিতে স্থাপিত রীয়ার এক্সিলটি বদল বা মেরামত করতে হলে সম্পূর্ণ ডিফারেন্সিয়্যাল গীয়ার বক্স না খুলেই সেটি বের করা যায়।

ড্রাইভিং শ্যাফট্ (Driving shaft)

এর একটি প্রান্ত ইউনিভার্সাল জয়েন্টের দ্বারা যুক্ত থাকে কার্ডেন শ্যাফটের সঙ্গে—অন্য প্রান্তটি ড্রাইভিং পিনিয়ানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে Tail পিনিয়ান শ্যাফ্টও বলা হয়।

ড্রাইভিং পিনিয়ান (Driving pinion)

এটি ড্রাইভিং শ্যাফ্ট থেকে গতি প্রাপ্ত হয়—ফলে এটি ক্রাউন পিনিয়ানকে চালনা করে।

ক্রাউন পিনিয়ান (Crown pinion)

এটির সঙ্গে ডিফারেন্সিয়াল পিনিয়ান, কেসিং বোল্ট দ্বারা যুক্ত থাকে—তার ফলে এটি কেসিংকেও ঘোরাতে থাকে। ঐ কেসিংয়ের সঙ্গে শ্যাফ্ট ও বেভেল পিনিয়ান যুক্ত থাকে, ফলে তারাও ঘুরতে থাকে। এর সঙ্গে রীয়ার এক্সিল, বেভেল পিনিয়ানের সঙ্গে বিয়ারিং অবস্থায় থাকে বলে তারাও একই সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এইভাবে চাকা দু'টি গতিপ্রাপ্ত হয়ে ঘুরতে থাকে ও গাড়ি চলতে থাকে।

ছোট ছোট গাড়িতে ডিফারেন্সিয়্যাল বক্সটি রীয়ার এক্সলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। কিন্তু ভারী গাড়িতে ডিফারেন্সিয়্যাল বক্সটি, চাকার এক্সিলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়ে, চেসিসে ঝুলান থাকে। এর গতি কগ হুইল ও চেনের সাহায্যে রীয়ার এক্সিল বা চাকায় প্রেরিত হয়।

অনেক সময় ডিফারেন্সিয়্যাল পিনিয়ানের সংযোগ ঠিক না থাকলে বা কোনও ঢিলাভাব থাকলে তা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বের হয়—তাতে গাড়ির ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে গাড়ি মেরামত না করে বের করা অনুচিত।

ফ্রন্ট এক্সিল (Front Axle)

ফ্রন্ট এক্সিল একটি লম্বা আকারের লোহার দন্ড দ্বারা তৈরি হয়। আধুনিক গাড়িতে এটি ক্রোম ভ্যানাডিয়াম্ স্টীল দ্বারা তৈরী হয়। এই স্টীলকে বহুবার বাঁকালে বা সোজা করলেও তার ক্ষতি হয় না বলেই এটি ব্যবহৃত হয়। ফ্রন্ট এক্সিল ধাক্কা লেগে বেঁকে গেলে, তা গরম করে সহজে মেরামত করা যায়। এক্সিলটি বেঁকে গেলে—গাড়ির গতির দিকও বেঁকে যায়—তাই কখনও মেরামত না করে, এরূপ অবস্থায় গাড়ি চালান নিষিদ্ধ।

ক্রশ রড বা ক্রশবার (Cross rod)

এই রডটি ফ্রন্ট এক্সিলের পেছনে অথবা সামনে স্থাপিত থাকে। এটি

সামনের এক্সিলের স্পিণ্ডলের দু'টি বাহুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। কোন কোন গাড়িতে এটিকে H আকারের বার দিয়ে তৈরি করা হয় এবং সরু হবার জন্যে, এক্সিলের সামনে রাখলে কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে বেঁকে যেতে পারে—তাই আধুনিক সব গাড়িতে, এটি এক্সিলের পেছনের দিকেই রাখা হয়। এই রড্‌টিকে কোন কোন গাড়িতে ছোট বা বড় করার জন্যে এ্যাড্‌জাস্টিং-এর ব্যবস্থাও থাকে। বেশিদিন ব্যবহার করলে অনেক সময় ঐ রডের প্রান্তসীমার দুটি পিন ক্ষয় হয়। সেদিকে নজর রাখা দরকার।

টাই রড্ (Tie rod)

এই রড্‌টির সাহায্যে রীয়ার এক্সিল কেসিং-এর সঙ্গে ইউনিভার্সাল জয়েন্ট অবধি একটি টানা দেওয়া থাকে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে। তার ফলে রীয়ার এক্সিলের লাইন তফাৎ হতে পারে না। এই রড্‌কে বলে টাই রড্ বা টাই বার। এটিও গাড়ির একটি প্রয়োজনীয় অংশ।

স্প্রীং (Spring)

চেসিস ও এক্সিলের মধ্যে যে সব স্টীলের পাত থাকে, তাদের সমষ্টিকে বলে স্প্রীং।

এই স্প্রীংগুলি খুব যত্ন সহকারে লাগালে, গাড়ির চলমান অবস্থায় পথের ধাক্কা ভেতরের আরোহীদের দেহে কম লাগে। স্প্রিং যত ভাল হবে, তত ধাক্কা কম লাগবে।

এই স্প্রীং-এ ঠিকমতো পাইন দেওয়া একটু কঠিন কাজ। তবে তা ঠিকমতো করতে পারলে গাড়ি খুব ভাল হয় ও চড়ে আরাম হয়। ঠিকমতো তৈরি হলে, এই স্প্রীং তাপের দ্বারা লাল করে নিয়ে তেলে ডুবিয়ে দিতে হয়—তাহলে তা ভাল স্প্রীং-এর কাজ করে। স্প্রীং ভাল না হলে, অসমতল পথে স্প্রীং-এর পাটিগুলির উপর জোর পড়ে—তা ভেঙে যায়। মাঝে মাঝে স্প্রীং-এ ভেসলিন বা চর্বি দিতে হয়। তা না হলে মরচে পড়ে।

স্প্রীং, সামনে ও পেছনে দুটি দিকেই থাকে। দুদিকে কিভাবে স্প্রীং যুক্ত থাকে, তা ছবি দিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

সাধারণতঃ দেখা যায় স্প্রীং যখন ভাঙে তখন মাঝখান থেকেই ভাঙে। তাই

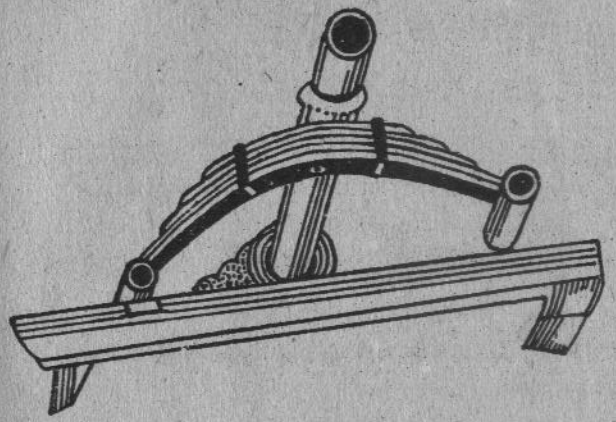

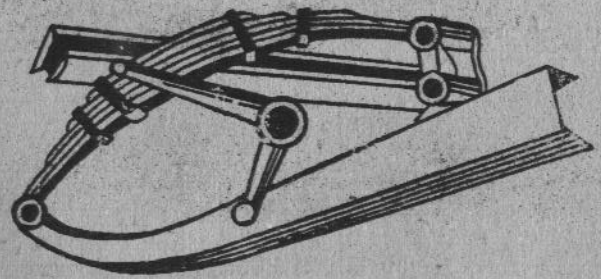

সামনের ও পেছনের রোড স্প্রীং

ঐ স্থানটি গর্ত করে দুর্বল করা হয়। অনেক মেকার বেশ চওড়া পাত দিয়ে স্প্রীং তৈরি করেন তাতে ভাঙার আশঙ্কা থাকে না।

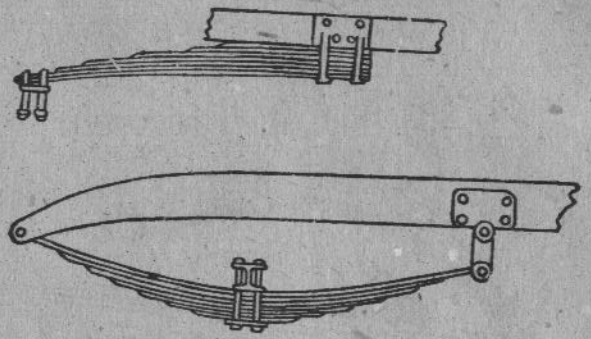

কোয়ার্টার এলিপ্‌টিক্‌ স্প্রীং ও হাফ্‌ এলিপ্‌টিক্‌ স্প্রীং

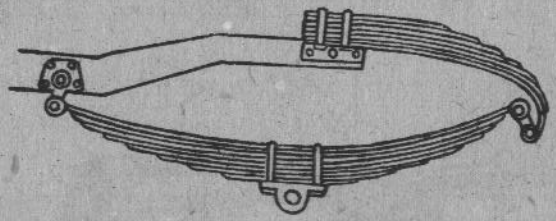

থ্রী কোয়ার্টার এলিপ্‌টিক্‌ স্প্রীং

বিভিন্ন ধরনের স্প্রীং

স্প্রীং নানা অংশে বা নানা গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এখানে নানা ধরনের স্প্রীং-এর সম্পর্কে বলে হচ্ছে ঃ

(১) **হ্যালিকল কমপ্রেশান স্প্রীং**—এই ধরনের স্প্রীং সাধারণতঃ ছোট ছোট মোটরের সামনের স্প্রীংরূপে ব্যবহৃত হয়। এই স্প্রীং-এর ওপরে চাপ পড়লে তা কার্যকরী হয়।

(২) **হ্যালিকল টেন্‌শান স্প্রীং**—এই স্প্রীং টানলে কাজ করে। বেকে ড্রামের রিটার্ণ স্প্রীং এই ধরনের হয়ে থাকে।

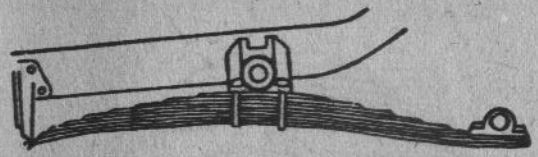

স্প্রীং-এর মাঝখানে লিভার

(৩) **ব্যালেট স্প্রীং**—এটিও চাপ দিলে কার্যকরী হয়ে থাকে। বেকে ড্রামের ভেতরটা আটকে রাখতে এটি ব্যবহৃত হয়।

(৪) **মালটিপল্‌ লোফ্‌ স্প্রীং**—এই স্প্রীং বড় বড় হয়—সাধারণতঃ গাড়ির রোড্‌ স্প্রীং এই ধরনের হয়ে থাকে। চওড়া লোহার পাত পর পর বসিয়ে, এই স্প্রীং তৈরি হয়। এই স্প্রীং মোটর গাড়ির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটি নানা আকৃতির হয়।

(৫) **হুইর‍্যাল স্প্রীং**—এই ধরনের স্প্রীং পাতলা লোহার পাত গোল করে মুড়ে তৈরি হয়। যেমন ঘড়ি বা গ্রামাফোনের স্প্রীং হয়—এগুলি ঠিক সেই প্রকারের।

শক্‌য়্যাব্‌ জর্বার (Shock abosorber)

যখন স্প্রীং খুব ভালভাবে ব্যবহার করেও কিছুতেই গাড়ির জার্ক বা ঝাঁকুনি কম করা যায় না, তখন তার সঙ্গে আর একটি স্প্রীং এমনভাবে যুক্ত করা হয়, যাতে গাড়িতে কোনও জার্ক না লাগে। এগুলিকে বলা হয় শক্‌ য়্যাব্‌জর্বার।

কোনও কোনও গাড়িতে সামনের স্প্রীং-এর মধ্যে এবং চেসিসে সঙ্গে হুইর‍্যাল স্প্রীং লাগানো হয়। এইভাবে লাগানো হলে গাড়ির সামনের দিকে জার্ক খুব কম লাগে।

স্প্রীং-এর পাটি যত পাতলা ও মজবুত হবে ততই ভাল। পাটি পাতলা হলে জার্ক কম লাগে। সামনের স্প্রীং-এ প্রায় সব গাড়িতেই আজকাল শক্

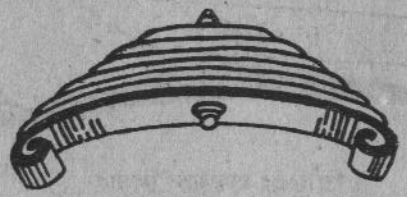

শক্ য়্যাব্জর্বারে ব্যবহৃত মাল্টিপল্ লোফ্ স্প্রীং

য়্যাব্জর্বার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কয়েক ধরনের গাড়িতে, ঐসঙ্গে পেছনেও শক্ য়্যাব্জর্বার থাকে। গাড়ির ব্যাক স্প্রীং-এর ফর্কের সঙ্গে কয়েল স্প্রীং জুড়ে এই কাজ করা হয়। গাড়ির দুদিকে দুটি বা চারটি এইপুপ স্প্রীং লাগানো হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোটরের বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন

ইঞ্জিন হলো মোটর গাড়ির চালনার শক্তি সরবরাহকারী যন্ত্র। এই ইঞ্জিন থেকেই গাড়ি গতি পায় ও সেই গতি নানা মেশিনের সাহায্যে চাকায় সঞ্চালিত হয়ে গাড়ি চালিত হয়।

সাধারণতঃ আজকাল আমাদের দেশে যে সব গাড়ি ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই হলো ইন্টারন্যাল কম্বাস্শন ইঞ্জিনযুক্ত। তবে অন্য সব ইঞ্জিন সম্পর্কে ও কিছু কিছুজ্ঞান লাভ করা দরকার বলে, সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন

এই ধরনের ইঞ্জিন প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্রিসিটি দ্বারা চালিত।

এই ধরনের ইঞ্জিন এদেশে বিশেষ ব্যবহার করা হয় না—তার কারণ হলো ৩০। ৪০ মাইল গাড়ি চলার পর গাড়ির ব্যাটারীকে আবার চার্জ করার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যাটারী চার্জের ব্যবস্থা কম বলেই এখানে এগুলি অপ্রচলিত।

এই গাড়িতে পেট্রোল ইঞ্জিনের বদলে কতকগুলি বৈদ্যুতিক ব্যাটারী বা সেকেণ্ডারী ব্যাটারী অর্থাৎ অ্যাকুমুলেটার থাকে। একটি সেলের বৈদ্যুতিক শক্তির চাপ ২ ভোল্ট—এইভাবে তৈরি ব্যাটারী বা অ্যাকুমুলেটার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি ইলেকট্রিক মোটরে প্রবেশ করে থাকে। এই প্রকার বৈদ্যুতিক গাড়ি চালাতে প্রায় ১১০ ভোল্ট ইলেকট্রিক চাপ দরকার হয়ে থাকে। ৫৫টি সেলযুক্ত ব্যাটারী দরকার হয়। তা ছাড়া সব সময় চাপ পূর্ণ রাখার জন্য আরও ৫।৭ টি সেল প্রয়োজন হয়। এই গাড়ির controller থাকে ড্রাইভারের সামনের পাটাতনের সঙ্গে। ইলেকট্রিক সুইচ যেমন অন্ অফ করে, এটিও সেইভাবে কাজ করে। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, রেগুলেটার ধরনের যন্ত্রের দ্বারা।

সব সময় সেলগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্যে ভোল্টমিটার ও ওম্মিটার রাখা থাকে।

পেট্রোল-ইলেকট্রিক মিশ্রিত ইঞ্জিন

পেট্রোল দিয়ে এই গাড়ির প্রাথমিক গতি সঞ্চারিত হয়। তার সাহায্যে Dynamo-তে ইলেকট্রিক শক্তি বা এনার্জি তৈরি হয় ও তার গতিশক্তি মোটরকে চালু করে।

এই ধরনের মোটর-ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ি অনেক দূর পথ অতিক্রম করতে পারে—এতে ঘন ঘন ব্যাটারী চার্জ করার প্রয়োজন হয় না।

ইলেকট্রিক মোটর পেছনের চাকা দুটির সঙ্গে স্পার গীয়ার বা চেন দ্বারা যুক্ত থাকে। এতে ব্যাটারী থাকে না—তার বদলে থাকে পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত Dynamo। ভারী মাল টানতে এই গাড়ি বেশ উপযোগী। বিদেশে অনেক কোম্পানী মাল বহনের কাজে এই গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। তবে এদেশে আজও এর ব্যবহার খুব কম।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বা স্টিম ইঞ্জিন

স্টিম ইঞ্জিন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস্ ওয়াট্।

পেট্রোল ইঞ্জিন অবিষ্কার হবার আগে এই ইঞ্জিনে যেমন ট্রেন চলতো, তেমনি চলতো মোটরগাড়ি।

আজকাল পেট্রোল বা ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হবার পর এর প্রচলন নেই বললেই চলে—কারণ পেট্রোল ইঞ্জিন অনেক কর্মক্ষম ও সুবিধাজনক।

স্টিম ইঞ্জিনে একটি বয়লার থাকে—তার সঙ্গে থাকে একটি বাষ্পবাহিত ইঞ্জিন। এর গতিবেগ ঘন্টায় ৩০ মাইলের বেশি হয় না। এতে ক্লাচ ও গীয়ার বক্স প্রয়োজন হয় না। ইঞ্জিনের এ্যাড্‌মিশান ভালবের মাধ্যমে বাষ্প প্রবেশ করলেই এই ইঞ্জিন চলতে থাকে। এই ইঞ্জিন দুই সিলিণ্ডারযুক্ত ও ডাবল্ এ্যাকটিং হয়। ইঞ্জিনটি ব্যাক এক্সলের কাছে থাকে।

আমেরিকা ও কানাডাতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের অনেক উন্নতি হয়েছিল। এই গাড়ি তৈরিতে খরচ বেশি হয়—এটি বেশ ভারীও হয়। তবে এর চালনা অনেকটা সহজ। আজকাল বিদেশে কিছু কিছু এই ধরনের গাড়ি চললেও আমাদের দেশে এরূপ গাড়ি নেই।

গ্যাস চালিত ইঞ্জিন

গ্যাস চালিত ইঞ্জিন তিন ধরনের থাকে।

১। সাকশন প্রফিউসার গ্যাস—এটি পেট্রোল ইত্যাদির খুব অভাব হলে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় স্কুটার, মোটর সাইকেল প্রভৃতিতে এই পদ্ধতিতে তৈরি ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

২। তরল জ্বালানী বা কেরোসিন তেল। এটি খুব কার্যকরী নয়।

৩। পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি তরলপদার্থ দ্বারা তৈরি গ্যাস চালিত ইঞ্জিন।

ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিন

এই ধরনের ইঞ্জিনই আজকের দিনের সবচেয়ে প্রচলিত ইঞ্জিন। এটি আজ কাল সকলের প্রিয়—ভারতে তথা বিশ্বে এইটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এই ইঞ্জিন দিয়ে অত্যন্ত হালকা গাড়ি থেকে শুরু করে খুব ভারী মোটর গাড়ি অবধি চালানো যায়। এমন কি ভারী লরী, বাস সবই এই ইঞ্জিনের দ্বারা দ্রুত গতিতে চালানো যায়।

ছোটগাড়িতে ছোট ছোট যন্ত্রাদি ও বড়গাড়িতে বড় বড় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইঞ্জিন ছাড়া গাড়িতে আরও যা যা যুক্ত থাকে তা হলো প্রধানত :—

১। রেডিয়েটার এবং তাদের মাঝে থাকে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার পাখা।

২। ক্লাচ—ইঞ্জিনের গীয়ার বক্স শ্যাফ্‌টের সঙ্গে সংযোগ ও বিয়োগকারী যন্ত্র। ড্রাইভার পা দিয়ে এটি যুক্ত বা বিযুক্ত করে।

৩। এক্‌সিলারেটার—যা ইঞ্জিনের গতি কমায় বা বাড়ায়।

৪। স্টিয়ারিং সিস্‌টেম—যা গাড়ি কোন্ দিকে যাবে তা চালনা করে।

৫। কার্বোরেটার ও কুলিং সিস্‌টেম—ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা।

৬। স্টোরেজ ব্যাটারী—এটি গাড়ীর মধ্যকার যা কিছু বৈদ্যুতিক কাজ করে—যেমন পাখা চালানো, লাইট জ্বালানো, স্পার্ক দেওয়া।

৭। এর সঙ্গেই থাকে লাইটিং সিস্‌টেম্।

৮। ইগ্নিশন সিস্‌টেম, স্পার্ক প্লাগ প্রভৃতি। তার সঙ্গে থাকে সুইচ অথবা হ্যাণ্ডেল মেরে গাড়ি স্টার্টের ব্যবস্থা। আধুনিক গাড়িতে চাবির সঙ্গে সুইচ যুক্ত থেকে কাজ করে।

৯। ব্রেক সিস্‌টেম্।

এছাড়াও আছে আরও নানা ছোটখাট ও খুঁটিনাটি অংশ—সব বিষয়ে এর পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে পৃথক পৃথক ভাবে।

কি কি পদার্থের দ্বারা চলে

ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিন নানা তরল পদার্থ দ্বারা চালনা করা যায়। তা হলো—

(১) পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ইঞ্জিন।

(২) ক্রুড্ অয়েল বা সেমি ডিজেল ইঞ্জিন।

(৩) ডিজেল বা কম্প্রেশান-ইগ্নিশন ইঞ্জিন।

এবারে ইঞ্জিনের আকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী যে নানা ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

T টাইপ ইঞ্জিন

এই ধরনের ইঞ্জিন দেখতে হয় অনেকটা ইংরাজী T আকারের মতো। এর কারণ হলো সিলিণ্ডার ও ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের সঙ্গে দুপাশে দুটি ইন্‌লেট পোর্ট ও

এগজস্ট পোর্ট থাকে। সব মিলিয়ে দেখায় T অক্ষরের মতো—তাই এই নামকরণ করা হয়েছে।

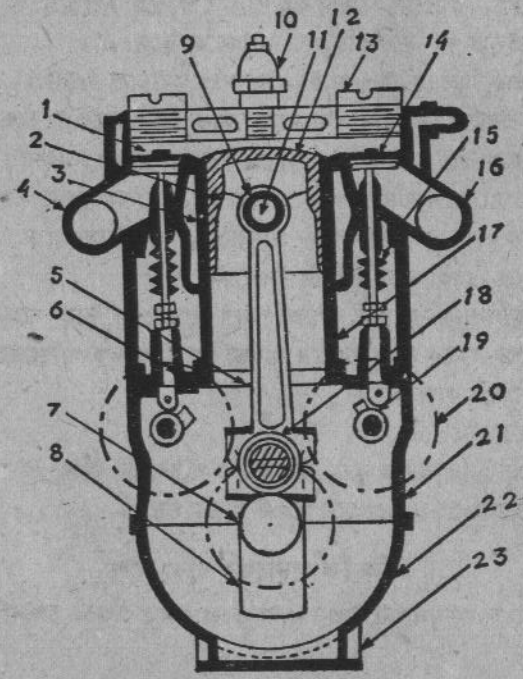

T টাইপ ইঞ্জিন

1—কম্বাস্‌শন চেম্বার। 2—পিস্টন রিং। 3—কুলিং ওয়াটার। 4—এগজস্ট পোর্ট। 5—কানেকটিং রড্‌। 6—ট্যাপেট। 7—ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট্‌। 8—ক্র্যাঙ্ক ওয়েব্‌। 9—পিস্টন পিন বুস। 10—স্পার্ক প্লাগ। 11—পিস্টন পিন। 12—ভাল্‌ব ক্যাপ। 13—পিস্টন হেড। 14—ভাল্‌ব। 15—ভাল্‌ব স্প্রীং। 16—ইনলেট পোর্ট। 17—সিলিণ্ডার। 18—কানেকটিং রড্‌। 19—ক্যাম্‌ শ্যাফট্‌। 20—ক্যাম্‌ শ্যাফট্‌ পিনিয়ান। 21—ক্র্যাঙ্ক কেসের উর্ধ্বাংশ। 22—ক্র্যাঙ্ক কেসের নিচের অংশ। 23—ক্র্যাঙ্ক কেসের কভার।

এই ইঞ্জিনের চারিদিকেই ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার জ্যাকেট থাকে—তাকে বলা হয় কুলিং সিস্‌টেম। এর ওপরের দিকে থাকে ছোট্ট স্পার্ক প্লাগ। এই ইঞ্জিনের পদ্ধতি খুব আধুনিক এবং এর কাজ এত নিখুঁত যে, এটি দীর্ঘস্থায়ী ও কর্মক্ষম হয়ে থাকে। এর বিস্তৃত অংশের বিবরণ পরে সম্পূর্ণভাবে বলা হবে।

L টাইপ ইঞ্জিন

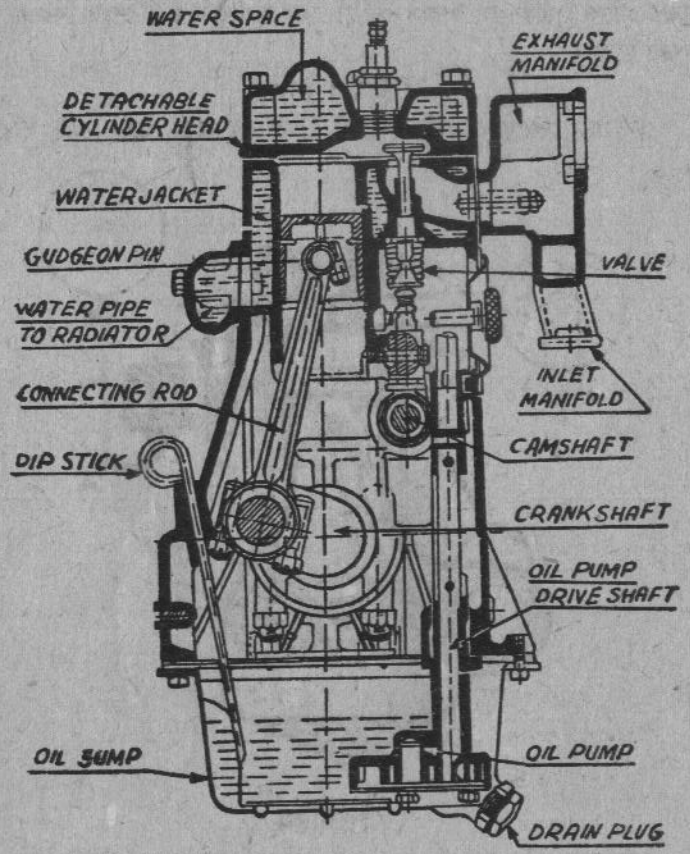

L টাইপ ইঞ্জিন

রিকার্ডো সাইড ভালব ইঞ্জিনের আকৃতি লম্বা ধরনের বলে তাকে বলা হয় L টাইপ ইঞ্জিন। সব যন্ত্র কোণাকুণি থাকে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। দেখতে এটা ঠিক ইংরাজী L অক্ষরের মতো। এর আকার দেখতে ভিন্ন হলেও এতে যে কর্মক্ষমতা ও ব্যবস্থা থাকে, তা অনেকটা T টাইপ ইঞ্জিনের মতোই। এতেও কুলিং সিস্টেম, সিলিণ্ডার ইত্যাদি সবকিছু থাকে। আকারে পার্থক্য হলেও এটিও ইণ্টারন্যাল কম্বাস্শন ইঞ্জিনের অন্তর্ভুক্ত। বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

I টাইপ ইঞ্জিন

এই ইঞ্জিন দেখতে অনেকটা ইংরাজী I অক্ষরের মতো হয়। এই ইঞ্জিনের

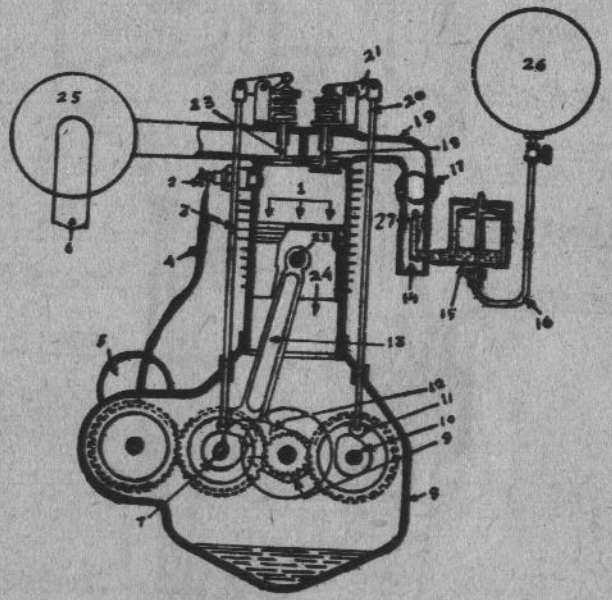

I টাইপ ইঞ্জিন

1—সিলিণ্ডার। 2—স্পার্ক প্লাগ। 3—কুলিং সিস্টেম। 4—হাই টেন্শন্ কেবল। 5—ম্যাগ্নেটো। 6—এগজস্ট। 7—গীয়ার এগজস্ট্। 8—ক্র্যাঙ্ক কেস।

9—ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট্; 10—ইনার ক্যাম্। 11—রোলার। 12—ক্র্যাঙ্ক। 13—কানেকটিং রড্। 14—এয়ার ইন্লেট। 15—কার্বোরেটার। 16—পেট্রোল সাপ্লাই পাইপ। 17—ইঞ্জিন ভালব্। 18—ইন্লেট ভালব্। 19—ইন্লেট ম্যানিফোল্ড। 20—পুশ্ রড্। 21—ওভারহেড ভালব্। 22—পিস্টন রিং। 23—এগজস্ট ভালব্। 24—পিস্টন। 25—সাইলেন্সার। 26—পেট্রোল ট্যাঙ্ক। 27—জেট।

একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, আগের দুই ধরনের ইঞ্জিনে যেমন ওয়াটার কুলিং সিস্টেম থাকে, এতে তার বদলে বায়ুর দ্বারা ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা থাকে। এটিও ৪টি স্ট্রোক প্রণালীতে কাজ করে। এই ইঞ্জিন আগের দু'ধরনের ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক হালকা করা যায় কিন্তু তাতে কর্মক্ষমতা কম হয় না। এটি পেট্রোলের সাহায্যে চলে এবং অনেক কম জটিল। আজকাল অধিকাংশ উন্নত শ্রেণীর মোটরে I টাইপ ইঞ্জিন বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাতে কাজও ভাল হচ্ছে। পার্টস ও কর্মপদ্ধতি একই প্রকার—তবে আকৃতিতে পার্থক্য থাকে অনেকটা।

চার স্ট্রোকবিশিষ্ট সব ইঞ্জিনেরই কর্মপদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। তবে তাদের আকৃতি ও পার্টস্গুলি সাজাবার পদ্ধতি ভিন্ন প্রকারের হয়।

একটি কথা মনে রাখতে হবে। পদ্ধতি যতটা জটিল মনে হয়, আসল কর্ম-পদ্ধতি জানতে পারলে, তা কঠিন বলে মনে হবে না। এই ধরনের ইঞ্জিনের একটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারলেই, অন্য সবগুলি সহজে বোঝা যায়।

V টাইপ ইঞ্জিন

যখন সাধারণ ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক বেশী সিলিণ্ডার ও পিস্টন ব্যবহার করা হয়, তখন ইংরাজী V অক্ষরের মতো সাজিয়ে সেগুলি বসানো হয়। তাকে বলে V টাইপ ইঞ্জিন। সিলিণ্ডারের বর্ণনার সময় এটি আরও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইঞ্জিনের গঠন

ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় না করলে তার কর্মপদ্ধতি ঠিক বোঝা যাবে না। তাই আগে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ ও তার কাজ বোঝান হচ্ছে।

সিলিণ্ডার (Cylinder)

ডাক্তাররা যে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেক্‌শন দেন, তার সিরিঞ্জ ও পিস্টনের আকৃতির মতোই হলো মোটর গাড়ির সিলিণ্ডার আর পিস্টন। ধাতুর তৈরি একটি বড় গোল চোঙের মতো আকৃতি হলো সিলিণ্ডারের। আধুনিক সিলিণ্ডারের মাথার দিকটা নাট-বল্টু ও প্যাকিং-এর সাহায্যে আট্‌কানো থাকে —প্রয়োজন হলে মাথাটা পৃথক করা যায়।

ঐ সিলিণ্ডারের মধ্যে, মাথার দিক বন্ধ আর একটি চোঙকে বায়ুনিরুদ্ধ যাতায়াতের উপযোগী করা হয়—তাকে বলে পিস্টন।

সিলিণ্ডারের বডি সাধারণতঃ ম্যালিয়েব্‌ল্‌ লোহাকে ঢালাই করে তৈরি করা হয়। এর ওপরের দিকে দুটি পথ বা পোর্ট রাখা হয়—একটিতে পোর্ট দিয়ে ইঞ্জিনের গ্যাস প্রবেশ করে ও অপরটিতে ক্ষয়প্রাপ্ত গ্যাস বের হয়ে আসে। ঐ দুটি পোর্ট, দুটি ভাল্‌ব দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

L টাইপের সিলিণ্ডারে, পোর্ট ও ভালব্‌, সিলিণ্ডারের সঙ্গে থাকে। সিলিণ্ডার একটি থাকে না—কোনও গাড়িতে চারিটি, কখনো ছটি বা আটটিও সিলিণ্ডার থাকে।

আধুনিক গাড়িতে যে ক'টি সিলিণ্ডার থাকে, তা একই সঙ্গে ঢালাই করে তৈরি করা হয়। তার ফলে সব ক'টি সিলিণ্ডারের, ব্যালেন্স ঠিক থাকে।

এই সব মিলিত সিলিণ্ডারকে একত্রে বলে ব্লক। সাধারণতঃ চার সিলিণ্ডারের, ছয় সিলিণ্ডারের বা আট সিলিণ্ডারের ব্লক তৈরি হয়।

বিভিন্ন ধরনের সিলিণ্ডার ও তার ব্লক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়—এ বিষয়ে পূর্ণভাবে বলা হচ্ছে।

সিলিণ্ডার ব্লক (Cylinder Block)

সিলিণ্ডার যেমন ব্লক হিসাবে তৈরি হয়, তেমনি সিলিণ্ডারের সঙ্গে তার

পিস্টন ও তার যোগাযোগও একত্রে তৈরি হয়, ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত করে। এর কারণ হলো, একই সঙ্গে যে ক'টি সিলিণ্ডার থাকে, তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঠিক রেখে, একই সঙ্গে পিস্টনের আনাগোনা চলতে থাকে।

যেসব সিলিণ্ডার, ব্লকে একসঙ্গে যুক্ত থাকে, তাদের পিস্টন ও কানেকটিং রড্‌ সকলকে একটিমাত্র ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সংযোগ ব্যবস্থা ঠিকমতো হয় বলে, সিলিণ্ডারের সংখ্যা বেশী হলেও তাদের আকৃতি বড় করার প্রয়োজন হয় না। সিলিণ্ডার ব্লকে সিলিণ্ডার সংখ্যা বেশী হলে, ফ্লাই হুইলের ওজনও সেই অনুপাতে কম হয়। সিলিণ্ডার ব্লক এমনভাবে তৈরি হবে যাতে চারটির সিলিণ্ডার ব্লকে, দুটি সিলিণ্ডারের যখন কম্প্রেশন হবে তখন অন্য দুটিতে এগ্‌জস্ট হবে। ছটির ব্লকে, তিনটির কম্প্রেশনের সময়ে অন্য তিনটির এগ্‌জস্‌শন হবে। আটটির ব্লকের চারটির কম্প্রেশন হলে বাকী চারটির এগ্‌জস্ট হবে।

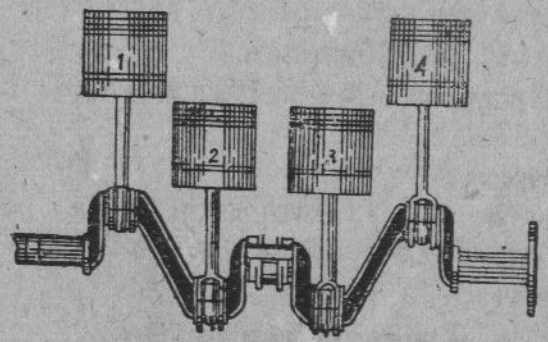

সিলিণ্ডার ব্লক

I, 4—সিলিণ্ডারে পিস্টন প্রবেশ করছে। 2,3—সিলিণ্ডার থেকে পিস্টন বেরিয়ে আসছে।

এইরকম Cyclic ভাবে কম্প্রেশন আর এগ্‌জস্‌শনের কাজ।

সিলিণ্ডার ব্লক দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১। মনোব্লক টাইপ।

২। প্যারালাল বা সিঙ্গল ব্লক টাইপ।

মনোব্লক টাইপ

মনোব্লক সিস্টেমে একই সঙ্গে সিলিণ্ডারগুলি পাশাপাশি বসিয়ে ব্লক তৈরি করা হয়। এতে প্রত্যেকটি সিলিণ্ডারে Water cooling ব্যবস্থা থাকে। আজ-কাল সব আধুনিক গাড়িতেই এটি ব্যবহৃত হয়।

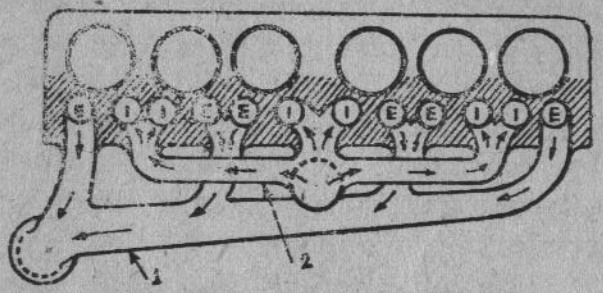

মনোব্লক টাইপ

1—গ্যাস প্রবেশের পাইপ। 2—গ্যাস বেরিয়ে আসার পাইপ। I—প্রবেশ E—নির্গমন।

এর সুবিধা হলো ঃ—

১। দৈর্ঘ কম হয়। ২। ওজনে হাল্কা হয়। ৩। শ্যাফ্ট ও বিয়ারিং কম লাগে। এগ্জস্ট ইত্যাদি সহজে হয়। ৫। ইঞ্জিন পুরোপুরি ঠাণ্ডা রাখা যায়।

প্যারালাল বা সিঙ্গল ব্লক টাইপ

এটি সাধারণতঃ মোটরগাড়িতে থাকে না—বেশীর ভাগই এরোপ্লেন বা ট্যাংকে ব্যবহৃত হয়। এটিতে air cooling system থাকে।

সিলিণ্ডার ভাল্ব (Cylinder Valve)

এখানে একটা কথা আসছে—তা হলো সিলিণ্ডার ভাল্ব সম্পর্কে। সিলিণ্ডারগুলির উপরে দু'টি পোর্ট থাকে ও তাতে দু'টি ভাল্ব থাকে, তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রতিটি সিলিণ্ডারের দু'টি ভাল্বের কাজ হলো গ্যাস প্রবেশ ও বের করানো। সিলিণ্ডার ব্লকে যখন একাধিক সিলিণ্ডার থাকে, তখন তার ভাল্বও বেশী হবে।

৪ সিলিণ্ডার ব্লকে ৮টি ভাল্ব থাকে।
৬ „ „ ১২টি „ „ ।
৮ „ „ ১৬টি „ „ ইত্যাদি।

ভাল্বগুলি বসানোতে কোনও জটিলতা—নেই কারণ Alternate ভাবে যখন কম্প্রেশন ও এগজস্শন চলে, তখন ভাল্বগুলিও ঠিকমতো কাজ করবেই।

আবার সবগুলি ভাল্বের গ্যাস মিলিয়ে, একত্রে বের হবার পথ তৈরি করা হয়। এই মিলিত পথে যে ভাল্ব থাকে, তাকে বলা হয় ওভারহেড ভাল্ব। সে বিষয়ে পরে বলা হচ্ছে।

V টাইপ ইঞ্জিন

বড় বড় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ১২টি বা ১৬টি সিলিণ্ডার একত্রে ব্যবহৃত হয়।

এসব ক্ষেত্রে ৬টি বা ৮টি করে একক তৈরি করে, তা ইংরাজী V অক্ষরের মতো করে এঙ্গেলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের ওপরে স্থাপিত হয়। তাই এই ধরনের ইঞ্জিনকে বলা হয় V টাইপ ইঞ্জিন। অবশ্য এই সব ইঞ্জিনের অন্যান্য সব ব্যবস্থা সাধারণ ইঞ্জিনের মতোই।

সিলিণ্ডার মেট্যাল

যে-সব সিলিণ্ডার বায়ুর দ্বারা ঠাণ্ডা হয়, তাদের অধিকাংশই কড়া ধরনের Cast iron দিয়ে তৈরি করা হয়।

কোন কোনও জাতের সিলিণ্ডার এক ধরনের বিশেষ 'এ্যালুমিনিয়াম Alloy' দ্বারা তৈরি হয়। যে-সব সিলিণ্ডার হাল্কাভাবে তৈরি করার প্রয়োজন হয়, তা এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে। এরোপ্লেনে ব্যবহৃত সিলিণ্ডারও এই ধাতু দিয়েই তৈরি হয়। যদি এ্যালয় ভাল হয়, তা হলে এটি যথেষ্ট শক্ত ও দৃঢ় হয়।

সিলিণ্ডার লাইনার (Cylinder liner)

সাধারণতঃ কাস্ট আয়রণ বা এ্যালুমিনিয়ামের সিলিণ্ডার তৈরি হয়। ঢালাই

করার পর সিলিণ্ডারের ভেতরটা ভাল করে পরিষ্কার করে, পৃথক একটা মিশ্র ধাতুর চোঙ ঢালাই করে, সিলিণ্ডারের মধ্যে লাইনার হিসাবে লাগানো হয়। ঐ মিশ্র ধাতুর নাম হলো, 'ক্রোমিডিয়াম সেন্‌টাড'।

আজকাল অধিকাংশ সিলিণ্ডারের মধ্যেই ভাল লাইনার থাকে। এতে যেমন একদিকে সিলিণ্ডারের শক্তিবৃদ্ধি হয়, তেমনি আবার অন্যদিকে পিস্টন সহজে যাতায়াত করতেও পারে। লুব্রিকেটিং তেল দিলে লাইনার বেশী কার্যকরী হয়। লাইনার ক্ষয় হয়ে গেলে নতুন লাইনার ব্যবহার করতে হয়—তার ফলে সিলিণ্ডার বা পিস্টন বদল করার প্রয়োজন হয় না। এরফলে সিলিণ্ডার ব্লক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যে-সব লাইনার জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা হয়, তাদের বলা হয় **ওয়েট লাইনার**। আর যে-সব লাইনার ঠাণ্ডা করতে জলের দরকার হয় না, তাদের বলে **ড্রাই লাইনার**। এ্যালুমিনিয়াম আর ক্রোমিয়াম মিশিয়ে এক ধরনের লাইনার তৈরি হয়—তাকে বলে **নাইট্রো-কাস্ট আয়রণ লাইনার**। এটি খুব কম ক্ষয় হয়।

এ্যালুমিনিয়াম সিলিণ্ডার

এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়ে সিলিণ্ডার তৈরি করতে হলে খরচ বেশী পড়ে বটে—তবে এর তাপ-প্রসারণ ক্ষমতা বেশী থাকে—তার ফলে এর দ্বারা ইঞ্জিনে বেশী কম্প্রেশন পাওয়া যায়।

যে সিলিণ্ডারের মাথা খুলে ফেলা যায়, তাকে বলে 'Detachable Head Cylinder'। এর ভেতরটা ভালভাবে কাঁদা যায় আর লাইনারও সহজে ফিট্ করা চলে। সিলিণ্ডার মেরামত করাও সহজ হয়। সিলিণ্ডার ব্লকটা না খুলে শুধু মাথাগুলো খুলেই ভেতরটা পরিষ্কার করা যায়।

পিস্টন (Piston)

পর পৃষ্ঠায় একটি পিস্টনের চিত্র দেওয়া হলো। এগুলি থেকে বোঝা যাবে, কিভাবে পিস্টন সিলিণ্ডারের মধ্যে, তার সম্পূর্ণ ব্লকের উপযোগীভাবে প্রবেশ করে ও দু'টিতে কম্প্রেশন ও দুটিতে একজস্‌শনের কাজ একসঙ্গে সাধিত হয়। ছয় সিলিণ্ডার ব্লকের বেলার ছটি পিস্টন এমনভাবে সেট করা থাকে যে, তিনটির দ্বারা কম্প্রেশন ও তিনটির দ্বারা একজস্‌শনের কাজ সাধিত হয়। যে রড্ দ্বারা পিস্টনগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাকে বলা হয় কানেকটিং রড্।

পিস্টনের কাজ হলো, শক্তি উৎপাদনের জন্যে একটি গ্যাস টাইট প্রকোষ্ঠ তৈরি করা। গ্যাস বিস্ফোরণের ফলে এর চাপ ও প্রসারণ কানেকটিং রডে সঞ্চালিত হয়।

পিস্টন প্রধানতঃ যে যে ধাতু দ্বারা তৈরি হয়, তা হলো—

১। কাস্ট-আয়রণ পিস্টন।
২। এ্যালয় বা মাইল্ড স্টীলপিস্টন।
৩। এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় পিস্টন।

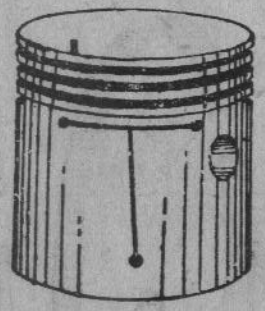
পিস্টন

আগেকার দিনে, পিস্টন কাস্ট-আয়রণ বা ঢালাই লোহা দিয়েই বেশীর ভাগ তৈরি হতো। আজকাল এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আজকাল এ্যালয় বা মাইল্ড স্টীল দিয়েই এটি বেশী তৈরী হয়। এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় পিস্টনে খরচ পড়ে বেশী —তবে তা বেশ হালকা অথচ মজবুত হয়ে থাকে।

পিস্টন আর সিলিণ্ডার যদি একই ধাতু দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে উত্তপ্ত হবার সময়, দুটির মধ্যে ফাঁক খুব কম থাকে। তবে দুটি পৃথক ধাতু (যেমন কাস্ট-আয়রণ সিলিণ্ডারে এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় পিস্টন) ব্যবহৃত হলে দু'টির মধ্যে ফাঁক একটু বেশী রাখতে হবে। তার কারণ হলো এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় উত্তাপে বেশী প্রসারিত হয়—যা কাস্ট-আয়রণে হয় না। এ বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ফিটিং-এর কাজে সুবিধা হয়।

পিস্টন রিং (Piston ring)

সিলিণ্ডারে যে ইন্ধন-গ্যাস ব্যবহৃত হয়, তার তাপ ও চাপ পিস্টনকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়। দু'টি পিস্টনকে ঠেললে তার চাপে ব্লকের Arrangement-এর প্রভাবে অন্য দু'টি পিস্টন আবার ভেতরে চাপ দেয় (৪টি সিলিণ্ডার ব্লকের বেলায়)। এইভাবে ৬টি ও ৮টির ক্ষেত্রে যথাক্রমে তিনটি বা চারটি পিস্টন যখন ঠেলার প্রভাবে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে, তখন অন্যগুলি ভেতরে ঢোকে।

এখন যদি পিস্টন ও সিলিণ্ডারের মধ্যে ফাঁক বেশী থাকে বা তা ঢিলা থাকে,

তাহলে এই চাপ লিক করবে ও পিস্টনও ঠিকমতো ঠেলা হবে না। তাই সব সময় পিস্টনের মাথার সঙ্গে একাট রিং যুক্ত থাকে।

ছবিতে তিনটি রিং দেখা যাচ্ছে। তিনটি রিং-এর পার্শ্বদৃশ্য দেখানো হলো।

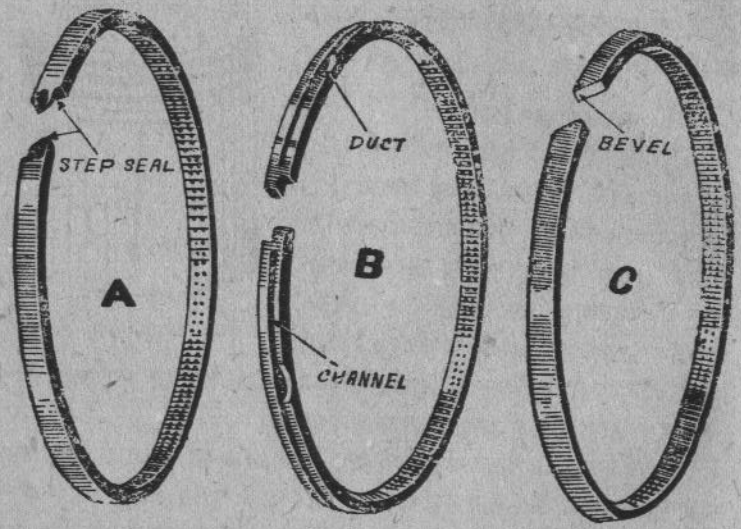

পিস্টন রিং

তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথক পৃথক পিস্টন ও সিলিণ্ডারের সাইজ অনুযায়ী রিং ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের হয়। প্রয়োজন হলে একটির বেশীও রিং, একটি পিস্টনের মাথায় যুক্ত করা হয়।

পিস্টন রিং কাস্ট-আয়রণ বা পিতল (Brass) দিয়ে তৈরি করা হয়। সিলিণ্ডার লাইনার নমনীয় হলে পিস্টন রিং পিতল দিয়ে তৈরি করাই ভাল।

পিস্টনের মাথায় ঢোকাবার সুবিধার জন্যে, পিস্টন রিংটি একদিকে কেটে দিতে হয়। এতে আরও সুবিধা হয় যে, তাপবৃদ্ধির জন্যে এটি সামান্য প্রসারিত হলেও কোনও অসুবিধা হয় না। সিলিণ্ডারের বেড় অনুযায়ী পিস্টন রিং কাটার পর সামান্য একটু অংশ কেটে বাদ দেওয়ারও প্রয়োজন হয়ে থাকে।

পিস্টন রিংটি পরাবার সুবিধার জন্যে অনেক সময় পিস্টনের মাথার দিকে Groove-ও থাকে।

আজকাল সাধারণতঃ একেবারে মাথায় একটি, মাঝে একটি ও নিচে একটি—মোট তিনটি পিস্টনের সঙ্গে লাগানো থাকে।

পিস্টন ও সিলিণ্ডারের কাজ যাতে বেশ সহজে হয়, তার জন্যে এর মধ্যে লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

গাজন রিং বা গাজন পিন (Gudgeon ring or pin)

গাজন পিন, পিস্টনের গা ভেদ করে পিস্টনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এ পিন ধারণ করার জন্য পিস্টনের গায়ে দু'পাশে, দু'টি বস (Boss) একত্রে ঢালাই করা হয়। এই পিনকে নানাভাবে পিস্টনের সঙ্গে আটকানো যায়। কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে।—

(১) ছোট বল্টু দ্বারা বসের সঙ্গে আট্‌কানো হয়ে থাকে। (২) দু'পাশে স্টীলের তারের রিং-এর সাহায্যে আটকানো হয়। তখন তাকে গাজন রিং বলা হয়। (৩) সারক্লিপের সাহায্যে আটকানো হয়। (৪) পিনকে গলিয়ে তার দু'টি প্রান্তে পিতলের ওয়াশারের সাহায্যেও আটকানো যায়।

কোনও কারণে এই পিন বের হয়ে এলে, তা সিলিণ্ডারের গায়ে আঁচড় বা দাগের সৃষ্টি করে—তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। সিলিণ্ডারের গায়ে আঁচড়ে বা দাগ পড়লে, তার মধ্যে দিয়ে গ্যাস লিক্ করে—গ্যাস টাইট থাকে না। এরূপ হলে সিলিণ্ডারকে রি-বোরিং (Re-boaring) করার প্রয়োজন হয়।

গাজন পিনকে ফাঁপা করা হয়—ফলে এর ওজন কম হয়। এই পিন কানেকটিং রডের সঙ্গে কব্জার মতো সংযুক্ত হয়ে গতিবেগের সৃষ্টি করে। স্টীলের সঙ্গে দামী কার্বন বা স্টীলের সঙ্গে নিকেল মিশিয়ে এই পিন তৈরি হয়। এই পিন ক্ষয় হয়ে ইঞ্জিন চলার সময় খট্ খট্ শব্দ সৃষ্টি করে। তখন পিন বদল করার প্রয়োজন হয়।

ক্র্যাঙ্ক কেস (Crank case)

সিলিণ্ডারের যেদিকে পিস্টন থাকে, তার বিপরীত দিকে থাকে ক্র্যাঙ্ক কেস। এই ক্র্যাঙ্ক কেসে থাকে লুব্রিকেটিং তেল। পাম্পের সাহায্যে ঐ তেল ইঞ্জিনের

বিভিন্ন গতিশীল অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক গাড়িতে ক্র্যাঙ্ক কেসের ওপরের অংশ সিলিণ্ডার ব্লকের সঙ্গে একত্রে ঢালাই করা হয়ে থাকে। তার নিচের অংশ ঢালাই লোহা বা স্টীলের পাত দিয়ে তৈরি। এই দু'টি অংশ নাট-বল্টু দ্বারা যুক্ত করা হয়।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ইঞ্জিনে ক্র্যাঙ্ক কেস পৃথক এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়ে তৈরি করা হয়।

ক্র্যাঙ্ক কেসকে সাধারণতঃ খুব বেশী ঘর্ষণ সহ্য করতে হয় না বলে, এটি অনেকদিন চালু থাকে, ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যদি সিলিণ্ডার ব্লকের সঙ্গে ক্র্যাঙ্ক কেস ঢালাই করা থাকে, তা হলে সব সময়ই সিলিণ্ডারের ভেতর লাইনার ব্যবহার করতে হয়। ফলে মূল সিলিণ্ডারটি ক্ষয় হয় না এবং ক্র্যাঙ্ক কেস সহ সিলিণ্ডারটি ভাল থাকে।

কানেক্‌টিং রড্‌ (Connecting rod)

কানেকটিং রডটি পিস্টনের সংলগ্ন গাজন পিনের সঙ্গে কব্জার গতিতে ক্রাঙ্ক পিনকে যুক্ত করে। এর ফলে পিস্টনের সরল পথে যাতায়াতের গতি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টে ঘূর্ণনগতি রূপে সঞ্চারিত করে থাকে।

কানেকটিং রডের ক্র্যাঙ্ক পিনের প্রান্তে একটি বিয়ারিং থাকে। তাকে বলে Big End Bearing। এটি, দু'টি নাট-বল্টু দিয়ে যোগ করা হয়।

কানেকটিং রড্‌ সাধারণতঃ নিকেল ও স্টীল মিশ্রিত ধাতু অথবা এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত স্টীল দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে।

এই রড্‌টিকে যথেষ্ট চাপ সহ্য করতে হয়। ফলে যাতে তা সহজে বেঁকে না যায়, তাই বেশ মজবুত ধাতু দ্বারা এটি তৈরি করা প্রয়োজন হয়; আজকাল অনেক ইঞ্জিনে, কানেকটিং রড্‌ এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রতিটি সিলিণ্ডার আর পিস্টনের জন্যে একটি করে রডের প্রয়োজন হয়ে থাকে। পিস্টন পিনের দিকে স্মল এণ্ডের ভেতরে একটি ব্রোঞ্জ বুশ্‌ ফিট্‌ করা হয়। এতে লুব্রিকেটিং তেল দেবার জন্যে কানেকটিং রডের মাথায় ও নিচের দিকে গর্ত করা হয়।

ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্‌ (Crank shaft)

ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট ও কানেকটিং রডের কাজ হলো, সিলিণ্ডারের ভেতর পিস্টনের

যাতায়াতের সরল গতিকে ঘূর্ণন গতিতে (Cyclic motion) পরিবর্তিত করা। তাই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্‌ ও কানেকটিং রডের মতো খুব মজবুত ধাতুর দ্বারা তৈরি করার প্রয়োজন হয়। তার কারণ হলো, একে বিস্ফোরিত গ্যাসের চাপ ও উত্তাপ সহ্য করতে হয়।

সিলিণ্ডার ব্লকের সিলিণ্ডারের সংখ্যা অনুযায়ী, এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের আকৃতি বিভিন্ন হয় ও তার আকারও বড় হয়। এটি দেখতে আঁকাবাঁকা লোহার ডাণ্ডার মতো।

সিলিণ্ডারের সংখ্যা যত বেশী হবে, ততই অতি সহজে বেশী পরিমাণ চাপ-পড়বে, অতি সহজে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের ঘূর্ণন গতি বেশী পরিমাণে হবে। সিলিণ্ডার বেশী সংখ্যায় থাকলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের কাজ সহজেই বেড়ে যায় ও তাতে চাপও কম পড়ে এবং শ্যাফ্‌টও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

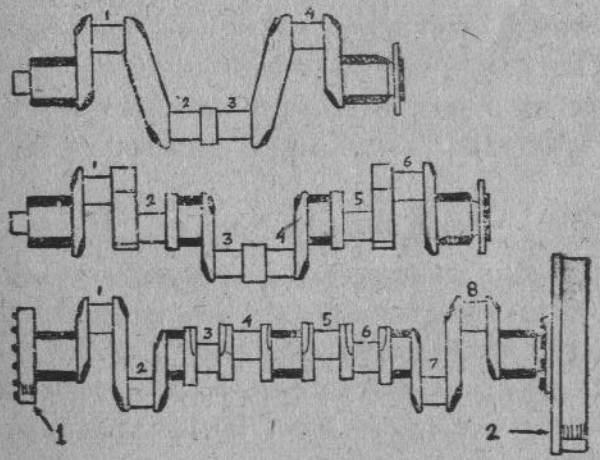

তিন প্রকার ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্‌

1, 4, 6, 8—ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের মাথা ওপরে উঠছে।

2, 3, 4, 5—ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের মাথা নিচে নামছে।

যেমন সিলিণ্ডার ও পিস্টন হলো ইঞ্জিনের মূল কাজের গোড়ার দু'টি যন্ত্র—তেমনি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টও হলো ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘূর্ণন গতি সঞ্চারের মূল যন্ত্র।

ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট তৈরির সময়, লোহাকে প্রচণ্ড তাপের দ্বারা সাদা করে, ইস্পাতের মতো করে তৈরি করা হয়। ভারী হাতুড়ির সাহায্যে তাকে পিটিয়ে প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় নিরেট স্টীলকে মেসিনের সাহায্যে প্লেন করে এবং মিলিং ও টার্ণিং করে, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট তৈরি করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট কতটা শক্ত ও মজবুতভাবে তৈরি ও একে কতটা চাপ সহ্য করতে হয়।

কানেকটিং রড্‌, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের সঙ্গে বিয়ারিং দ্বারা যুক্ত থাকে। আবার ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট দু'টি মেন বিয়ারিং দ্বারা দুদিকে যুক্ত থাকে। যতগুলি কানেকটিং রড্‌ থাকে ততগুলি কানেকটিং রড্‌-বিয়ারিং ও থাকে—কিন্তু মেন বিয়ারিং থাকে দু'দিকে দু'টি।

ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের যে অংশ বিয়ারিং-এর মধ্যে ঘুরতে থাকে তাকে বলে জার্ণাল। অনেক সময় দু'দিক মেন বিয়ারিং, একটি-একটি না করে, দু'টি করে দু'দিকে মোট চারটি করা হয়। বেশী সিলিণ্ডার হলে, এরূপ করার প্রয়োজন হয়।

আগের দিনে শক্ত স্টীল দ্বারাই এটি বেশীর ভাগ তৈরি হতো। তবে আজকাল স্টীলের সঙ্গে শতকরা তিনভাগ নিকেল মিশিয়ে এটি অনেক সময় তৈরি করা হয়। আবার ক্রোমিয়াম ও নিকেল একত্রে স্টীলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ফ্লাই হুইল (Fly wheel)

ফ্লাই হুইল হলো কাস্ট-আয়রণের তৈরি একটি ভারী চাকা—এটি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের পেছনের ফ্ল্যাঞ্জের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর ওপরে রিং গীয়ার চড়ানো থাকে এবং এই রিং গীয়ারের মধ্যে দাঁত কাটা থাকে।

এই দাঁতের থেকে সেলফ্‌ স্টার্টারে ব্যাণ্ডেক্স (Bendex) লাগানো থাকে—এর মধ্যে একটি ছিদ্র থাকে যাকে বলে Blind Hole। এর মধ্যে ক্লাচ, শ্যাফ্‌টের একটি Spandle বল্‌ বিয়ারিং দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

এটি মোটামুটি ৪টি কাজ করে।

(১) ডেড স্ট্রোক্‌ চালায়। (২) ইঞ্জিনের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করে। (৩) সেল্‌ফ স্টার্টার ব্যবহৃত না হলে হ্যাণ্ডেল ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে। (৪) এর দ্বারা ক্লাচ পরিচালিত হয়।

বিয়ারিং (Bearing)

আগেই বলা হয়েছে যে, কানেকটিং রড্‌ ও ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট, বিয়ারিং দিয়ে যুক্ত থাকে। আবার দুই প্রান্তে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টও দু'টি বা চারটি বিয়ারিং দ্বারা যুক্ত থাকে। কারণ বিয়ারিং না থাকলে এগুলিতে গতি সঞ্চারিত হতে পারে না।

কানেকটিং রডের গাজন পিনের প্রান্তে বিয়ারিং-এর জন্য 'গান মেটাল বুশ,' ব্যবহৃত হয়। ঐ পিন কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিস্টনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করে। সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ঐ পিন সরে এসে যেন সিলিণ্ডারের গায়ে আঁচড় বা দাগ কাটতে না পারে।

সব সময় ভাল বিয়ারিং-এর কাজের জন্যে, কানেকটিং রডের স্মল এণ্ডের ছিদ্রের মধ্যে, বুশের প্রয়োজন হয়—তাতে কাজ ভাল হয়। কানেকটিং রডের বিগ্‌ এণ্ড বিয়ারিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি দুই ভাগে তৈরি হয়। নাট বল্টু দিয়ে এই দু'টি ভাগ যুক্ত করা হয়।

মানব দেহে হাঁটু, কাঁধ প্রভৃতি সন্ধি যেমন হাত-পা নাড়ার জন্যে প্রয়োজন তেমনি এই সব বিয়ারিং হলো গতির জন্যে অত্যাবশ্যক।

'বিগ এণ্ড বিয়ারিং'-এর মধ্যে এণ্টি ফ্রিকশান বা হোয়াইট মেটাল লাইনার থাকে। এই ধরনের লাইনার কানেকটিং রডের স্টীলের ওপরে সরাসরি বা পৃথক ব্রোঞ্জ মেটালে ঢালাই করে ও সীসায় কুঁদে, ক্র্যাঙ্ক পিনের সাইজ করা হয়। দুটি অংশের সংযোগস্থলে অনেকগুলি করে পাতলা ধাতুর পাত দেওয়া হয়—সেগুলি অনেকটা স্প্রীংয়ের কাজ করে। এর দ্বারা বিয়ারিং ভালভাবে টাইট করার কাজেও খুব সুবিধা হয়।

হোয়াইট মেটাল বিয়ারিং বেশ ভালভাবেই কাজ করে থাকে। কিন্তু যেখানে বিয়ারিং-এর ওপরে বেশী চাপ পড়ে, সেখানে তেলের ফিল্টার যুক্ত করা হয়। তাতে বিয়ারিং সহজে কাজ করতে পারে।

যে-সব ক্ষেত্রে কম্প্রেশান বেশী হয়, সে সব জায়গায় এই ধাতুর বিয়ারিং বেশী কার্যকারী হয় না।

উচ্চ কম্প্রেশান যে-সব ইঞ্জিনে হয়, তাতে চাপের ফলে বিয়ারিং ফেটে বা ভেঙে যায়। তাই আধুনিক ইঞ্জিনের মেন বিয়ারিং লেড্‌ ও ব্রোঞ্জ মিশ্রিত করে বিশেষ এ্যালয় দিয়ে তৈরি করা হয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট অনুপাতে তামা, সীসা

ও রাংতা মিশ্রিত করেও এটি তৈরি করা হয়। এটি বেশ মজবুত হয় এবং যে-কোনও উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে। এটি খুব দামী ধাতু—তাই এতে সব সময় লাইনার ব্যবহার করা হয়। ক্যাড্‌মিয়াম, নিকেল, তামা ম্যাগনেসিয়াম ও রূপা মিশিয়েও এক ধরনের খুব শক্ত ও মজবুত ধাতু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ইঞ্জিন ভাল্‌ব্‌ (Engine Valve)

আগেই বলা হয়েছে যে, ভাল্‌বের কাজ হলো গ্যাসের চাপকে একদিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইঞ্জিন ভাল্‌ব সব সময়ই যথেষ্ট শক্ত হতে হবে। শক্ত না হলে এই ভাল্‌ব চাপ সহ্য করতে পারে না। ভাল্‌বগুলিকে প্রচুর চাপ ও তাপ সহ্য করতে হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইন্‌লেট্‌ ভাল্‌ব সব সময় নিকেল-ক্রোম স্টীল দিয়ে তৈরি করা হয়। আজ-কাল ক্রোমিয়ামযুক্ত স্টীল বা স্টেনলেস স্টীল দিয়েও এই ভাল্‌ব তৈরি করা হয়। তার সঙ্গে কার্বন, হিলিকন ও ম্যাঙ্গানিজও ব্যবহার করা হয়। এগ্‌জস্‌ট ভাল্‌ব, নিকেল স্টীল দ্বারা তৈরি করা হয়।

ভাল্‌ব সিটিং (Valve seating)

সাধারণ কাস্ট-আয়রণ সিলিণ্ডারের ভালব্‌ সিটিং কাজ মন্দ দেয় না। কিন্তু বিশেষ এ্যালয় স্টীল সিটিং বেশীদিন টেকসই নয়। এদের সিলিণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রু দ্বারা বা চেপে বসানো হয়ে থাকে। অনেক ইঞ্জিনের ভাল্‌ব সিটিং—Stelite নামে এক ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি। ঐ সিটগুলি বেশ কড়া হয়—এগুলি কাটার জন্যে বিশেষ শক্ত কর্তক (Cutter) ব্যবহৃত হয়।

ভাল্‌বের সমষ্টি

সাধারণতঃ ভাল্‌ব সিট্‌টি ৪৫ ডিগ্রি কোণে (Angle) স্থাপিত হয়ে ভাল্‌বটি তৈরি হয়। এই ভাল্‌ব অনেক সময় একটি না থেকে, একাধিক থাকে। ভাল্‌ব একাধিক হলে তার কোণ ঠিক থাকে ও তার কাজ এতে আরও ভাল হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল্‌ব সিট্‌ বা একাধিক সিট্‌ বিশেষ ধরনের স্ক্রু দ্বারা আটকিয়ে, ইঞ্জিন ভাল্‌ব তৈরি হয়।

ওভারহেড ভাল্‌ব (Overhead value)

আগেই সিলিণ্ডারের বর্ণনা দেবার সময় বলা হয়েছে যে, অনেক সময় বিভিন্ন সিলিণ্ডারের একাধিক ভাল্‌ব একটি নালীর দ্বারা যুক্ত হয়ে তার ওপরে একটি

ওভারহেড ভাল্‌ব লাগানো হয়। ওভারহেড ভাল্‌বের ওপরে তাই চাপ বেশী পড়ে। চাপ বেশী পড়ার জন্যে, এটি বিশেষ শক্ত ধাতু দ্বারা তৈরি করার প্রয়োজন হয়।

ব্লকে সিলিণ্ডার যত বেশী সংখ্যায় থাকবে, তার ভাল্‌ব তত বেশী সংখ্যায় হবে। তার ফলে ওভারহেড ভাল্‌ব আরও মজবুত করা প্রয়োজন।

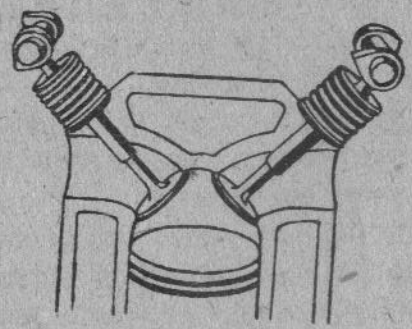

ওভারহেড ভাল্‌ব

ওভারহেড ভাল্‌বের আকার সাধারণ ভাল্‌বের চেয়ে বড় হয়। তার সিটিংও বড় হয়—এর শক্তিও বেশী হবার প্রয়োজন ঘটে থাকে। ওভারহেড ভাল্‌ব সাধারণতঃ, নিকেল-ক্রোমিয়াম মিশ্রিত বিশেষ ধরনের স্টীল দিয়ে তৈরি করা হয়। এটিও ফুটোর মুখে কোণ করে বসানো থাকে ও তা নাট এবং স্ক্রু দ্বারা সংলগ্ন হয়ে ভাল্‌ব সৃষ্টি করে। ফোর্ড ইঞ্জিনে এই ভাল্‌ব বেশী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ওভারহেড ভাল্‌ব সাধারণতঃ কোণ করে বসানো হয়। নানা ধরনের ইঞ্জিনে এটি নানা ধরনের থাকে। এখানে ওভারহেড ভাল্‌বের একটি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

ক্যাম শ্যাফ্‌ট্‌ (Cam shaft)

এর প্রধান কাজ হলো, এতে অবস্থিত ক্যাম দ্বারা ভাল্‌বগুলিতে তাদের স্থিতির স্থান থেকে তুলে ধরা, যাতে সিলিণ্ডারের গ্যাস সহজে ঢুকতে বা বের হতে পারে।

ভাল্‌বগুলিকে তুলতে ক্যামের প্রয়োজন হয়। এদের আবার নিচে নামাবার জন্যে ভাল্‌ব স্টেমে অবস্থিত কম্প্রেসান স্প্রীং-এর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্প্রীংগুলির জোর, এমন হওয়া উচিত—যাতে ভাল্‌বগুলি সহজে নির্দিষ্ট স্থানে চেপে বসতে পারে। স্প্রীং ভেঙ্গে গেল, ভাল্‌ব নামাবার কাজ ঠিকমতো হয় না। ফলে সিলিণ্ডারের কাজ বন্ধ হয়।

ক্যাম্‌ শ্যাফ্‌ট্‌ আজকাল ক্রোমো-নিকেল দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়াও নানা প্রকার মিশ্র ধাতু দ্বারা এটা তৈরি হয়। এগুলি বেশ কড়া ধাতু। ক্যামগুলিকে শ্যাফটের সঙ্গে একত্রে ফোর্জ করা হয়ে থাকে।

ইঞ্জিনে যতগুলি সিলিণ্ডার থাকে তার ঠিক দ্বিগুণ ক্যাম শ্যাফ্‌ট্‌ থাকে।

প্রতিটি সিলিণ্ডারের জন্যে দুটি করে ক্যামের প্রয়োজন হয়; একটি ইন্‌লেট ভাল্‌ব ও অন্যটি একজস্ট্‌ ভাল্‌বের জন্যে।

এছাড়াও লুব্রিকেটিং তেলের পাম্পকে চালাবার জন্যে, ইঞ্জিনের তেলের পাম্প চালাবার জন্যে ও ইগ্নিশন ডিস্ট্রিবিউটারকে ঘোরাবার জন্যে। আরও ৩।৪টি হ্যালিক্যাল দাঁতযুক্ত পিনিয়ানও ঐ সঙ্গে একত্রে ফোর্জ করে শ্যাফ্‌টকে তৈরি করা হয়।

পিনিয়ানগুলির দাঁতের সংখ্যা ও ক্যাম্‌ শ্যাফ্‌টের সামনের দিকের শেষ প্রান্তে, টাইমিং চেম্বারের একটি পিনিয়ান থাকে।

এইসব পার্টস্‌গুলি মোটামুটি না চিনতে পারলে ইঞ্জিন ও তার কার্য-প্রণালী বোঝা যাবে না বলে, সংক্ষেপে সব বলা হলো।

গ্যাস ইন্‌লেট ও একজস্ট্‌ পাইপ
(Gas inlet & Exhaust pipe)

যে পাইপের মাধ্যমে সিলিণ্ডারে গ্যাস প্রবেশ করে, তাকে বলে ইন্‌লেট্‌ পাইপ। যে পথ দিয়ে সিলিণ্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে যায়, তাকে বলে এক্‌জস্ট্‌ পাইপ। এই দুটি পাইপে সাধারণতঃ ভাল্‌ব আটকানো থাকে, তা আগেই বলা হয়েছে। তাদেরই বলা হয় ইন্‌লেট ভাল্‌ব ও এক্‌জস্ট্‌ ভাল্‌ব। সাধারণতঃ এই দুটিও তৈরি হয় স্টীল দিয়ে—কারণ এতেও গ্যাসের চাপ যথেষ্ট পড়ে। এই দুটি পাইপের ব্যাস সাধারণতঃ এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি হয়ে থাকে।

ইঞ্জিনের কর্মপদ্ধতি

ইণ্টারন্যাল কম্বাসশন ইঞ্জিনের প্রথম কথাই হলো, এটি নানা আকৃতির হয় এবং নানা দাহ্য পদার্থের সাহায্যে এটি কাজ করে বটে, (যেমন পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি) কিন্তু এর মূল থিয়োরী হলো এক ও অভিন্ন।

এই থিয়োরীর ওপরে নির্ভর করেই সর্বপ্রথম এই ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই ইঞ্জিনের মূল থিয়োরী হলো, তাপ ও চাপের সাহায্যে পেট্রোল বা অন্য তরল দাহ্য বস্তুকে গ্যাসে রূপান্তরিত করা ও একবার কম্‌প্রেশান এবং একবার এক্‌জস্‌শনের দ্বারা পিস্টনের সামনে-পেছনে গতির সঞ্চার করা। নিয়মিত এই গতি চলে Alternate বা বিপরীতভাবে ও এই গতিকে ঘূর্ণায়মান গতি বা Cyclic motion-এ পরিবর্তিত করা হয়।

বিভিন্ন স্টেজে এই কাজ হয়। এই কাজকে চারটি স্টেজে ভাগ করলে বোঝবার সুবিধা হবে। তা এবারে বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইণ্টারন্যাল কম্বাসশন ইঞ্জিনের ক্রিয়াচক্র

ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান অংশগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এবারে এগুলি কি করে কাজ করে তা বোঝান হচ্ছে। এই ধরনের ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ ক্রিয়াচক্রকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। সাক্‌শন্‌ বা চার্জিং স্ট্রোক (Suction Stroke)।
২। কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke)।
৩। ফায়ারিং বা এক্সপ্যানসন স্ট্রোক (Expansion Stroke)।
৪। এক্‌জস্ট্‌ স্ট্রোক (Exhaust Stroke) বা গ্যাস নির্গমন স্ট্রোক।

সাক্‌শন স্ট্রোক কেবলমাত্র বায়ু শোষিত হয়, কম্প্রেশন স্ট্রোকে ঐ বায়ুকে চেপে ৪৫০।৫৫০ পাউণ্ড প্রতি বর্গইঞ্চি করলে তা ১০০০ ফারেনহাইটের কাছাকাছি উত্তপ্ত হয়।

তৃতীয় স্ট্রোকে গাঢ় তেল ইন্‌জেক্ট করা হয়। তার ফলে তা জ্বলে ওঠে এবং চাপ প্রস্তুত করে পিস্টনকে ঠেলে দেয়। চতুর্থ স্ট্রোকে ব্যয়িত গ্যাস বেরিয়ে যায়।

সিলিণ্ডার ব্লকে সিলিণ্ডারগুলি এমনভাবে থাকে ও তাদের মধ্যে পিস্টন এমনভাবে লাগানো থাকে, যে, অর্ধেক সংখ্যার পিস্টনে যখন কম্প্রেশন স্ট্রোক চলে, তখন বাকী অর্ধেকে চলবে একজস্ট্ স্ট্রোক। তার ফলে সব সময়ই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্ ঘুরতে থাকে। পিস্টনের উপর-নিচ গতিটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের মাধ্যমে ঘূর্ণন গতি (Ciacular motion) পেয়ে যায়।

এর আগে T-টাইপ, L-টাইপ, I-টাইপ, V-টাইপ প্রতিটি নানা ধরনের ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌শন ইঞ্জিনের কথা হয়েছে। কিন্তু কাজ করার পদ্ধতি বা মূল থিয়োরী সব ধরনের ইঞ্জিনেই একভাবেই হয়।

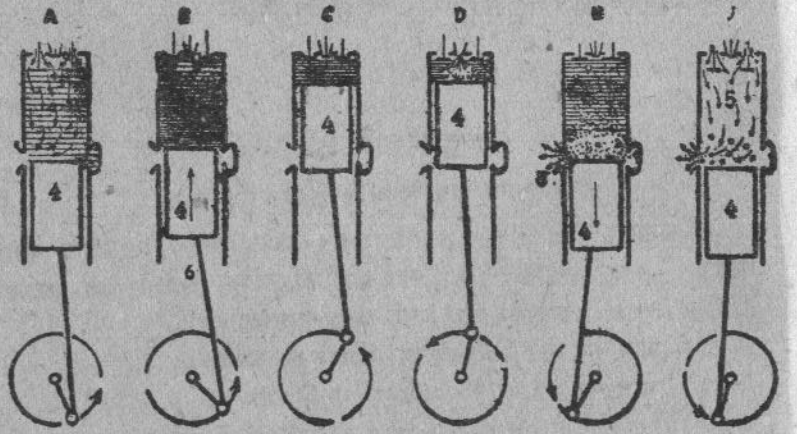

পিস্টনের বিভিন্ন স্ট্রোক

A, B—সাক্‌শন স্ট্রোক। C, D—কম্প্রেশন স্ট্রোক। E-এক্সপ্যানসন স্ট্রোক। F—এক্‌জস্ট্। 4-পিস্টন। 6—কানেকটিং রড্।

এবার প্রতিটি অংশের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। এটাই লো পেট্রোল ও ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মূল থিয়োরী।

সাক্‌শন স্ট্রোক (Suction Stroke)

সিলিণ্ডারে ওপরের সীমা থেকে যখন পিস্টনটি নীচে নামতে থাকে, তখন তা ইন্ধনগ্যাস প্রবেশপথ দিয়ে গ্যাসকে সিলিণ্ডারের মধ্যে শোষণ করে। এই সময়ে গ্যাস প্রবেশের ভাল্‌বটি খুলতে শুরু করে। এই সময়ে আবার Outlet Valve বা গ্যাস বের হবার ভাল্‌ব বন্ধ হয়ে যায়। পিস্টন সম্পূর্ণ নিচে এলে গ্যাস প্রবেশের দ্বারও বন্ধ হয়ে যায় এবং ইন্ধনগ্যাস সিলিণ্ডারের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়। এটিই হলো প্রথম স্ট্রোক বা সাক্‌শন্ স্ট্রোক। এই সময় ক্রাঙ্ক শ্যাফ্‌ট মাত্র আধ-পাক ঘুরে যায়।

কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke)

এই সময় পিস্টনটি ওপরের দিকে অর্থাৎ কম্প্রেশন্ চেম্বারের দিকে যেতে থাকে এবং inlet ও outlet দুটি ভাল্‌বই বন্ধ থাকে। ফলে তাপ ও চাপের জন্য সিলিণ্ডারের মধ্যেকার গ্যাসটি বিস্ফোরণের উপযোগী হয়। কম্প্রেশনের কাজ যখন শেষ হয়, তখন স্পার্ক প্লাগের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ যোগে বিস্ফোরণের কাজও ঘটতে সাহায্য করে। তখনও ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্ আধ-পাক ঘোরে। অর্থাৎ সাক্‌শন ও কম্প্রেশন মিলিয়ে ক্রাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্ মোট একপাক ঘোরে।

ইগ্নিশন বা এক্সপ্যানসন স্ট্রোক
(Ignition or Expansion Stroke)

এই সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা ইন্ধনগ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে থাকে। তার ফলে পিস্টনটি ইন্ধনগ্যাসের চাপে কম্বাস্‌শন চেম্বার থেকে নীচের দিকে—অর্থাৎ সিলিণ্ডারের নিম্ন সীমানার দিকে ঠেলে দিয়ে গ্যাস আর তাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর ফলেই কার্যকরী শক্তি তৈরি হয়। তাই এই স্ট্রোককে শক্তি উৎপাদনকারী স্ট্রোকও বলা হয়।

বিস্ফোরণের ফলে পিস্টনের ঐ গতিবেগ কানেকটিং রডের সাহায্যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্‌কে ঘূর্ণনের গতি প্রদান করে থাকে। এই সময় ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্ দ্বিতীয় পাকের প্রথম অর্ধভাগ ঘুরে থাকে। এই সময় পিস্টনটি সিলিণ্ডারের সবচেয়ে নীচের সীমায় নেমে আসে। গরম গ্যাসের স্পার্ক দ্বারা যে অগ্নিসংযোগ হয়, তাতেই গ্যাস বিস্ফোরিত হয়ে পিস্টনটিকে ধাক্কা দেয়। এই সময়ও ইন্‌লেট ও আউটলেট দুটি ভাল্‌বই বন্ধ থাকে।

একজষ্ট স্ট্রোক (Exhaust Stroke)

এই স্ট্রোকে পিস্টন সিলিণ্ডারের ভিতরের সীমায় যেতে থাকে। ভাল্‌ব খুলে যাওয়ার জন্যে, শক্তি ব্যয়িত অতিরিক্ত গ্যাস বের হয়ে যেতে থাকে। এই সময় ইন্ধন প্রবেশের ভাল্‌ব্ বন্ধ থাকে—কিন্তু বের হয়ে যাবার ভাল্‌ব খুলে যায়। তৃতীয় স্ট্রোকে শক্তি সৃষ্টি হয় ;—অতিরিক্ত যে গ্যাস থাকে তা বের করে দেবার জন্যেই এই স্ট্রোকের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

চারটি স্ট্রোক মিশিয়ে ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ কাজ এইভাবে সমাধা হয়।

ফ্লাই হুইলের কাজ

তৃতীয় স্টেজ অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন স্টেজে যে শক্তি প্রস্তুত হয়, তা ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করা হলো ফ্লাই হুইলের কাজ। যখন কোনও গতিবেগ থাকে না, তখন ফ্লাই হুইলে সঞ্চিত শক্তির দ্বারা অন্য তিনটি স্ট্রোক সম্পাদন করার জন্যে গতি প্রদান করা—এটাই ফ্লাই হুইলের উদ্দেশ্য।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন অংশকে ইঞ্জিনের কাজের সময় পিচ্ছিল করা, শীতল করা, ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ করে কাজ চালাবার ব্যবস্থা, মূল সঞ্চালক শক্তিকে আয়ত্তে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ফ্লাই হুইল এই আয়ত্তে আনার কাজ করে। আর শীতল করার জন্যে ব্যবস্থাও রাখা হয়।

দুই স্ট্রোকযুক্ত ইঞ্জিন

চারটি স্ট্রোক ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কম্প্রেশন্ আর এক্‌জস্‌শন এ দুটি স্ট্রোকযুক্ত ইঞ্জিনও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশ

মোটরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়—তাছাড়া সাধারণতঃ গভীর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের প্রয়োজন না হলে, কাজে লাগে না। আমাদের বর্তমান বইটির প্রধান বিষয়বস্তু হলো মোটর ড্রাইভিং ও সাধারণ মেরামতী শিক্ষা।

তাই কোনও বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে, আমরা প্রতিটি পার্টস্-এর বিষয়ে মোটর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞান দিচ্ছি।

ড্যাস্ বোর্ডের বিভিন্ন সুইচ

ড্রাইভার তার সীটে বসে প্রথমে যে সব জিনিস সামনে দেখতে পায়, তা একটি বোর্ডের মধ্যে লাগান থাকে। তাকেই বলা হয় ড্যাস্ বোর্ড।

ড্যাস্ বোর্ডের জ্ঞান হলো, মোটর ড্রাইভারের সবচেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা। এতেই যুক্ত থাকে নানা সুইচ—যা চালিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করা হয়।

ড্যাস্ বোর্ডের সুইচ

ড্যাস্ বোর্ডে সাধারণ গাড়িতে (বিশেষ করে ভারতীয় গাড়ীতে) ছয়টি সুইচ থাকে।

এই ছয়টি সুইচ হলো—

১। ইগ্নিশন সুইচ (Ignition Switch)।
২। চোক্ সুইচ (Choke Switch)।
৩। স্ট্যার্টিং সুইচ (Starting Switch)।
৪। ওয়াইপার সুইচ (Wiper Switch)।
৫। হেড লাইট ও সাইড লাইট সুইচ (Head light and Side light Switch)।
৬। ইলেকট্রিক হর্ন সুইচ (Electric Horn Switch)।

এখন সবার আগে এই ছয়টি সুইচ কি এবং কোথায় থাকে তা বলা হচ্ছে।

ইগ্নিশন সুইচ (Ignition Switch)

এই সুইচ হলো ব্যাটারীকে চালু করার সুইচ। প্রতিটি মোটরের মধ্যে থাকে স্টোরেজ ব্যাটারী। এই সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ ব্যাটারী কাজ করতে শুরু করে। এই সুইচ টিপলে ব্যাটারী থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রতিটি কয়েল পর্যন্ত চলে যায়।

চোক্ সুইচ (Choke Switch)

সাধারণতঃ বর্ষাকাল বা শীতকাল কিংবা খুব ভোরে বা ঠাণ্ডার সময় এই সুইচ টিপে দিলে কারবোরেটরের চোকগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া অন্যসময় এগুলি প্রয়োগ করার কোনও প্রয়োজন হয় না।

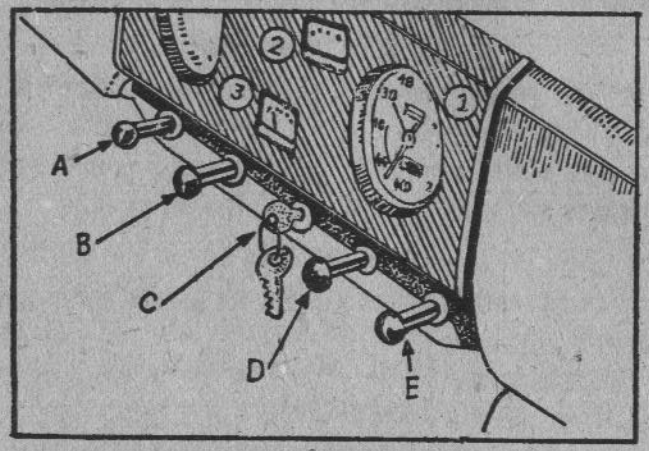

ড্যাস্ বোর্ডের বিভিন্ন সুইচ

1—স্পীডোমিটার ও মাইলোমিটার। 2—পেট্রোল গেজ। 3—টেম্পারেচার গেজ। A—চোক্ সুইচ। B—স্টার্টিং সুইচ। C—ইগ্নিশন সুইচ। D—মিক্শ্চার কণ্ট্রোল। E—লাইট সুইচ।

স্টার্টিং সুইচ (Starting Switch)

এই সুইচ অন্ করলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্টার্টার চালু হয়। এই সুইচ সাধারণতঃ মোটরগাড়ির চাবির সঙ্গে যুক্ত থাকে। চাবি ঘুরিয়েই তাই অধিকাংশ গাড়ি স্টার্ট করা হয়ে থাকে।

অবশ্য এছাড়াও ফ্লাই হুইলকে ঘুরিয়ে মোটরগাড়ি স্টার্ট করা যায়।

হেড লাইট ও সাইড লাইট সুইচ
(Head Light & Side Light Switch)

এই সুইচের দ্বারা ইচ্ছামতো মোটরগাড়ির সামনের আলো বা পাশের আলো চালু করা যায়।

সামনের আলো চালু করার জন্যে সাধারণতঃ একটি সুইচ থাকে। সাইড

লাইট চালু করার জন্যে পৃথক আর একটি সুইচ থাকে। অনেক সময় দুই প্রকার আলো চালু করার জন্যে একই সুইচ থাকে।

ওয়াইপার সুইচ (Wiper Switch)

সাধারণতঃ বর্ষার সময় বা কুয়াশার সময় মোটরগাড়ির সামনের কাঁচে জল বা কুয়াশা জমে যায়। তা দূর করার জন্যে ওয়াইপার ব্যবহৃত হয়। ড্যাস্ বোর্ডের ওপরে ওয়াইপার সুইচ, এটিকে চালু করার জন্যেই থাকে।

ইলেকট্রিক হর্ন সুইচ (Electric Horn Switch)

আজকাল মোটরগাড়িতে সাধারণ হাতে টেপা হর্ন ব্যবহার করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক হর্ন অথবা প্রেসার হর্ন।

এই দুই প্রকার হর্নই সুইচের সাহায্যে চালনা করা হয়। ইলেকট্রিক হর্নের সুইচটিও থাকে ড্যাস্ বোর্ডের ওপরেই বা স্টীয়ারিং-এর মাঝে।

মিটারসমূহ (Meters)

ড্যাস্ বোর্ডের ওপরে সুইচগুলি ছাড়াও থাকে নানা ধরনের মিটার। মিটারগুলি হলো :—

১। স্পীডোমিটার (Speedometer) ২। মাইলোমিটার (Milometer) ৩। এম্পায়ার মিটার (Ampire-meter) ৪। হীট্ মিটার (Heat meter) ৫। ফুয়েল মিটার (Fuel meter) ৬। অয়েল মিটার (Oil meter)।

স্পীডোমিটার (Speedometer)

স্পীডোমিটার সম্পর্কে ড্রাইভিং পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। গাড়ি কত গতিতে চলছে তা জানার জন্যে এটি প্রয়োজন হয়ে থাকে। ড্যাস্ বোর্ডের ওপরে এটির কাঁটা ঘুরতে থাকে ও তা থেকে গাড়ির গতি জানা যায়।

মাইলোমিটার (Milometer)

এই মিটারের অবস্থান স্পীডোমিটারের সঙ্গেই। এর দ্বারা গাড়ি কত মাইল পথ অতিক্রম করল তা বুঝতে পারা যায়।

এম্পায়ার মিটার (Ampire Meter)

এই মিটারের কাজ হলো ডায়নামো কাজ করছে কিনা, কিংবা ব্যাটারীর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারা।

যদি মিটারের কাঁটাটা ডানদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, ডায়-

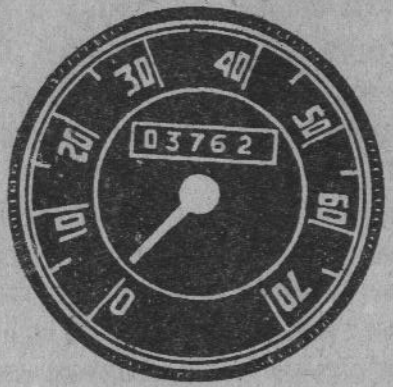

মাইলোমিটার ও স্পীডোমিটার

নামোর কাজ ঠিকততো হচ্ছে। যদি তা না ঘোরে, তাহলে বোঝা যাবে যে, কানেকশনে কোথাও গোলমাল ঘটেছে।

হীট মিটার (Heat Meter)

এই মিটারের দ্বারা বুঝতে পারা যায় ইঞ্জিনটা কতটা গরম হয়েছে। ইঞ্জিন ঠিকমতো গরম বা শীতল না হলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফুয়েল মিটার (Fuel Meter)

পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ইন্ধনকে বলে ফুয়েল। ফুয়েল ঠিকমতো আসছে কিনা, অথবা ঠিকমতো কাজ চলছে কিনা, তা বুঝতে পারা যায় এই ফুয়েল মিটারের সাহায্যে। তাছাড়া গাড়িতে কতটা জ্বালানী আছে তাও বুঝতে পারা যায় এই ফুয়েল মিটার দিয়ে।

অয়েল মিটার (Oil Meter)

প্রতিটি গাড়িতে অয়েল পাম্প থাকে। এটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, অথবা গাড়িতে কতটা তেল আছে তা বুঝতে পারা যায় এই অয়েল মিটারের

ইগ্নিশন সুইচ (Ignition Switch)

এটি দেখতে অনেকটা তালার মতো। এর সঙ্গে যে চাবি লাগানো থাকে তাকে বলে 'ইগ্নিশন কি' (Ignition key)—তার সঙ্গে ইঞ্জিনের সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সম্পর্ক থাকে।

যখন এর মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি অন্ করা হয়, অর্থাৎ চাবি দিয়ে এটি চালু করা হয়, তখন সারা ইঞ্জিনের বৈদ্যুতিক শক্তি চালু হয়।

আবার এটি অফ্ করলে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত থাকে এম্‌পায়ার মিটার, চোক্ লিভার, অয়েল চেম্বার প্রভৃতি। এগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা হচ্ছে।

মোট কথা, গাড়ি চালাবার প্রধান কেন্দ্র হলো এর ইগ্নিশন সুইচ। এই ইগ্নিশন সুইচ অন্ করেই গাড়ি চালনা শুরু করা হয়। তাই ড্রাইভিং শিক্ষার্থীদের এটি ভাল করে জানা উচিত।

অয়েল চেম্বার (Oil Chamber)

ইঞ্জিনের ভেতরে যেখানে তেল (পেট্রোল বা মবিল) থাকে তাকে বলে অয়েল চেম্বার। সব গাড়িতে এটা এক জায়গায় থাকে না। পুরোনো দিনের সব গাড়িতে এটা সামনের দিকে থাকতো। কিন্তু আধুনিক নানা গাড়িতে এটি ভেতরে বা পেছনে নানা জায়গায় থাকে। এর অন্য নাম পেট্রোল ট্যাংক।

ওয়াটার চেম্বার (Water Chamber)

ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের পাশে জল ব্যবহারের স্থানকে বলে ওয়াটার চেম্বার। ইঞ্জিন যাতে গরম না হয়, তাই জল ব্যবহার করে তা ঠাণ্ডা করা হয়। ইঞ্জিন গরম হলে তার কাজে নানা অসুবিধা হতে পরে—তাই ওয়াটার চেম্বার একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। অনেক সময় ওয়াটার চেম্বার ছাড়াও ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্যে বাতাস ব্যবহৃত হয়।

যে ধরনের ইঞ্জিনই হোক না কেন, তার কুলিং (Cooling) ব্যবস্থা ঠিকমতো করা অবশ্য কর্তব্য।

গ্যাসকেট (Gasket)

ইঞ্জিন হেড ও ব্লকের মধ্যে থাকে এই গ্যাসকেট। ইঞ্জিনের গ্যাস যাতে ইঞ্জিন

থেকে বাইরে চলে না যায় এবং ইঞ্জিনের ক্ষমতা তার ফলে কমে না যায়, তাই এই গ্যাসকেট ব্যবহৃত হয়।

হ্যাণ্ড থ্রটল কণ্ট্রোল (Hand Throttle Control)

এই যন্ত্রটির প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। ড্যাস্ বোর্ডের ওপরে এই হ্যাণ্ড থ্রটল্ দেখতে চোক্ লিভারের মতো হয়। এর ওপরের লেখা থাকে H. T. কথাটা। কারবোরেটারের মধ্যে এক্সিলারেটারের সঙ্গে এর সম্বন্ধ থাকে। গাড়ি যখন স্টার্ট হয়, তখন একে বাইরের দিকে টেনে নিতে হয়।

এইভাবে বাইরের দিকে H. T. টেনে আনলে থ্রটল্ ভাল্ব্ খুলে যায়—তার ফলে ইঞ্জিন তাড়াতাড়ি চালু হয়। হ্যাণ্ডথ্রটল্ সিসটেম্ থাকলে, থ্রটল্ প্যাডেলকে চাপ দেবার প্রয়োজন হয় না।

গাড়ি চালু হয়ে গেলে এটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পেট্রোল গেজ টেপ (Petrol Gauge Tape)

এটাও এক ধরনের সুইচ। তবে সব সময় এটির দরকার হয় না। যখন পেট্রোলের কাজ স্বাভাবিক ভাবে হয় না, তখন ২।৪ বার এটি বাইরের দিকে

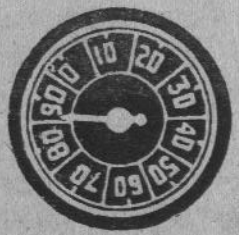

পেট্রোল গেজ টেপ

টেনে ছেড়ে দিলে পেট্রোলের কাজ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে।

রেডিয়েটার টেম্পারেচার গেজ (Radiator Temperature Gauge)

এটিও একধরনের গোলাকার মিটারের মতো দেখতে। এতে সুন্দরভাবে পর পর নম্বর সাজানো থাকে। একে হীট্ মিটারও বলা হয়। এর দ্বারা বুঝতে

পারা যায় রেডিয়েটারে কতটা জল আছে। যদি রেডিয়েটার গরম হয়ে যায়, তাহলে তাতে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাজল দিতে হয়।

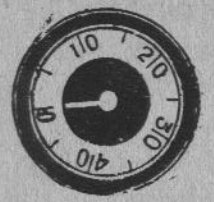

রেডিয়েটার টেম্পারেচার গেজ

অনেক সময় রেডিয়েটারে প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়। তা হচ্ছে বুঝতে পারলে গাড়িকে দাঁড় করিয়ে গরম জল ফেলে রেডিয়েটারে ঠাণ্ডা জল দিতে হবে। রেডিয়েটার ঠাণ্ডা রাখা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। লুব্রিকেটিং ও কুলিং সিস্টেম আলোচনা করার সময়, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ডিফার (Defar)

ডিফারও হলো এক ধরনের সুইচ। এই ডিফারের সঙ্গে গাড়ির হেড লাইটের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। লাইটের কাজে এই সুইচটি প্রয়োজন হয়। ডিফারও থাকে ড্যাস্ বোর্ডের সঙ্গেই। এর নাম ডিফার হলো এইজন্যে যে, এর দ্বারা কম আলো বা বেশী আলো জ্বালানো যায়।

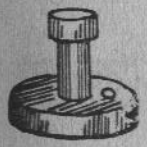

ডিফার

এই ডিফারটি একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে আলোটা কম পরিমাণে হয়—আবার দুবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে আলো বেশী হয়। আলো জ্বলার পর যদি তা বন্ধ করতে হয়, তাহলে সুইচ অফ করে দিতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, মোটরের অন্য সব লাইটগুলি জ্বলে স্টোরেজ ব্যাটারীতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে।

ফায়ারিং চেম্বার (Firing Chamber)

যেখানে স্পার্ক প্লাগ্ থাকে ও যেখান থেকে পেট্রোল মিকশ্চারের স্ফুলিঙ্গগুলি বের হয়ে আসে—সেই জায়গাকে বলে ফায়ারিং চেম্বার।

স্পার্ক প্লাগ (Spark Plug)

এই অংশটি সাধারতঃ সিলিণ্ডারের মাথার ওপরে স্থাপিত হয়। কোনও ইঞ্জিনে এটি সিলিণ্ডারে গায়ে (ভাল্বের দিকে) স্থাপিত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্নেটো ব্যাটারী বা উইকো ইগ্নাইটার থেকে হাই ভোল্টেজ কারেণ্ট, হাই টেনশান তার দিয়ে এনে প্লাগের উপরিভাগে সিলিণ্ডারের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে আগুনের ফুলিঙ্গ করে।

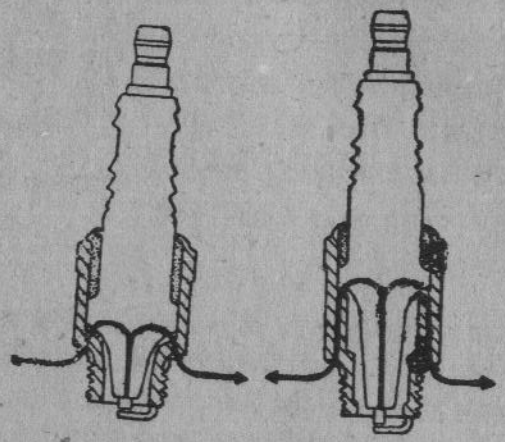

স্পার্ক প্লাগ্

অনেক সময়ই দেখা যায় ইঞ্জিন না চলার একটি প্রধান কারণ, স্পার্ক প্লাগের গোলমাল। ইঞ্জিনে লুব্রিকেটিং তেলের মাত্রা বেশী হলে, তা প্রথমেই স্পার্ক প্লাগে-লেগে কারেণ্টের পথ রোধ করে।

আব্যার অনেক সময় প্লাগে বেশী উত্তাপের জন্য ইন্সুলেটার কেটে যায়। ফলে কারেণ্ট লিক করে—স্পার্ক দেয় না।

কারবোরেটার (Carborater)

পেট্রোল বা তরল যে-কোনও ইন্ধনকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পরিণত করে জ্বলবার উপযোগী করে তোলে যে যন্ত্র, তাকেই বলে কারবোরেটার।

কারবোরেটার, ইন্লেট ম্যানিফোল্ডের ওপরে থাকে। পেট্রোলের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশ ও বায়ু মিশে ঠিক বারুদ জ্বলার মতো অ্যাকশন্ হয়ে থাকে এবং ফ্লোট চেম্বারে ট্যাংক থেকে পেট্রোল এসে জমে। তারপর অন্য অংশে বা মিক্শিং চেম্বারে পেট্রোলের অংশ ও বাতাস মিশে কাজ করে।

এক কথায় বলা যায় কারবোরেটারে প্রধান দুটি অংশ।

(ক) ফ্লোট্ চেম্বার (খ) মিক্শিং চেম্বার।

ফ্লোট চেম্বার থেকে মিক্শিং চেম্বারের যে অতি সামান্য জ্বালানি আসতে দেওয়া হয়, তা কণ্ট্রোল করা হয়ে থাকে ভাল্বের সাহায্যে।

কারবোরেটার প্রধাণতঃ তিনটি ভাল্ব থাকে। তা হলো—

১। চোক্ ভাল্ব। ২। থ্রটল্ ভাল্ব। ৩। নিড্ল্ ভাল্ব।

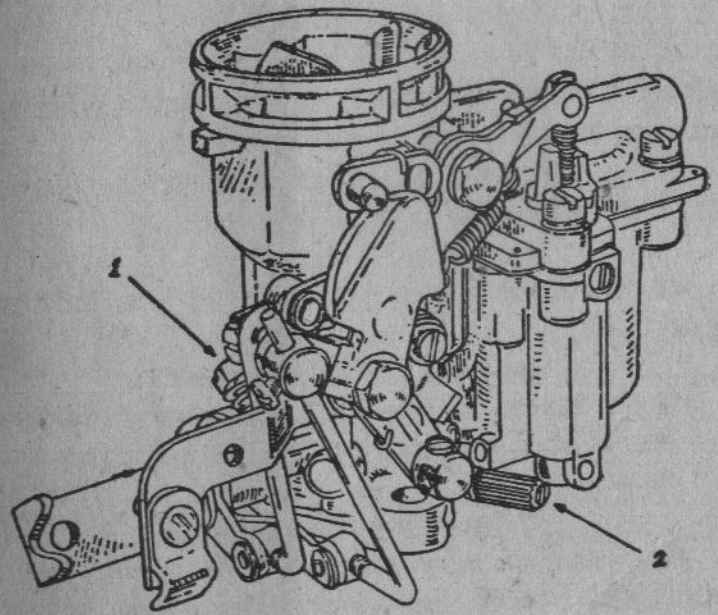

কারবোরেটার

1—ফ্লোট্ চেম্বার। 2—মিক্শিং চেম্বার

নিড্ল্ ভাল্ব (Needle Valve)

মিক্শিং চেম্বারে কতটুকু পেট্রোল আসা প্রয়োজন তা নির্ধারিত করে নিড্ল্ ভাল্ব। ফ্লোট চেম্বারের পেট্রোলের ওপরে ফ্লোটটি ভাসতে থাকে। যতটুকু

পেট্রোল প্রয়োজন ততটুকু এলেই, নিডল্ ভাল্‌ব বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি লিভারের সাহায্যে কাজ করে থাকে।

থ্রটল্ ভাল্‌ব (Throttle Valve)

এর কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাল্‌ব এ্যাক্সিলারেটার দিয়ে খোলা বা বন্ধ করা যায়। এই খোলা বা বন্ধ করার ওপর সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রোল, মিক্‌শার আসা বা যাওয়া কম-বেশী হয়ে থাকে। এ্যাক্সিলারেটার এই ভাল্‌বের সাহায্যেই কাজ করে।

চোক্ ভাল্‌ব (Choke Valve)

এই ভাল্‌বটি থাকে কারবোরেটারের ভেতরে। ঠাণ্ডার দিনে, শীতকালে ব বর্ষাকালে এটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। ড্যাস্-বোর্ডে সুইচ অফ্ করে দিয়ে, চোক্ ভাল্‌ব ঠাণ্ডার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে।

চোক্ ভাল্‌ব বন্ধ করলে, কারবোরেটারে হাওয়া কম হয়ে থাকে। তার ফলে মিক্‌শিং চেম্বারে পেট্রোল কম আসে।

জেট (Jet)

দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্যে যে নল থাকে, তাকেই বল হয় জেট্।

ফ্লোট চেম্বার (Float Chamber)

এটি থাকে কারবোরেটারের পাশে। ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল এসে কিছু কিছু করে এখানে জমা হয় ও কাজ চলতে থাকে। এটিকেও কারবোরেটারের একটা অংশ বলা যায়।

বিভিন্ন ধরনের কারবোরেটার

নানা কোম্পানী নানা ধরনের কারবোরেটার নির্মাণ করে থাকে। তাতে কাজেও কিছুটা পার্থক্য হয়। এখানে কয়েকটির বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) **জেনিথ কারবোরেটার**—এই ধরনের কারবোরেটারে তিনটে জেট্ বা পেট্রোল নির্গমন ছিদ্র থাকে। এইধরনের কারবোরেটারে সবগুলি ভাল্‌ব খুব ভাল কাজ করে বলে জানা যায়।

(২) **এস ইউ কারবোরেটার**—এই কারবোরেটারে হরেক রকম ভাবে, গ্যাস মিশ্রণের ভাগ বেশী করা যায়। এতে একটি রড ও পিস্টন সহযোগে চোক্

ভাল্‌বের কাজ নানাভাবে কম-বেশী করা হয়। তবে এর দাম আরও বেশী।

(৩) **সোলেক্স সেল্‌ফ স্টার্টিং কারবোরেটার**—এতে একটির সঙ্গে অন্য আর একটি ছোট কারবোরেটার যোগ করা থাকে। দুটি থাকার জন্যে এর অ্যাকশন নানাভাবে কম-বেশী করা যায়।

(৪) **পাম্প সংযুক্ত কারবোরেটার**—এতে একটি ছোট পাম্প যুক্ত থাকে। তার ফলে পেট্রোল ও বাতাসকে কণ্ট্রোল করা হয়।

(৫) **হব্‌সন কারবোরেটার**—এতে অনেকগুলি জেট্ থাকে। এতে ক্ষুদ্র স্প্রীং দ্বারা চালিত একটি ভাল্‌বও থাকে।

তাছাড়া আরও নানা ধরনের কারবোরেটার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাড়ি পিচ্ছিল ও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা

Lubrication and cooling system

গতিশীল যে কোনও যন্ত্রই গরম হয়। তার ক্ষয়ও হয়ে থাকে। ঐ তাপ ও ক্ষয়কে সীমাবদ্ধ করার জন্যে তাকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। তাকে পিচ্ছিল রাখাও প্রয়োজন হয়।

গাড়ির অংশগুলি মসৃণ করার জন্যে পিচ্ছিলকারী পদার্থ ব্যবহার করা হয়—Oil বা grease। তেল বা চর্বি থেকে এগুলি তৈরি হয়ে থাকে। গ্রিজ বা চর্বি দু'রকম হয়ে থাকে—

(১) খনিজ (Mineral origin)

(২) জন্তু থেকে উৎপন্ন (Animal origin)

আজকাল খনিজ চর্বিই বেশী ব্যবহার করা হয়। গ্রাফাইট্ মিশ্রিত চর্বি বেশী কার্যকরী হয়।

এতে চাকার বল্‌বিয়ারিং-এর মধ্যে, শ্যাকল্, বোল্ট প্রভৃতি অংশ ঘর্ষণ ও ক্ষয় কমে যায় এবং ভালভাবে কাজ করে, পিস্টন, সিলিণ্ডার প্রভৃতি নানা অংশে

এটি ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ স্প্রে-গান নামে এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে তেল ব্যবহার করা হয়।

ইঞ্জিন, গীয়ার বক্স, ডিভারেন্সিয়াল গীয়ার বক্স প্রভৃতি তেল দিয়েই মসৃণ ও পিচ্ছিল করা হয়; এজন্যে অপেক্ষাকৃত তরল তেল দেওয়া হয়।

যদি তৈলাধার ময়লা হয়, তাহলে তা কেরোসিন তেল দিয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। পিচ্ছিলকারী তেলের গুণাগুণ নির্ণয় করতে হলে, যে সব দিকে নজর রাখতে হয়, তা হলো—

(১) তেলের ঘনত্ব বা Density.

(২) তেলের চট্‌চটে ভাব বা Viscosity.

(৩) জ্বলার জন্যে তাপ বা Flash point.

(৪) জ্বলন্ত অবস্থায় তাপ বা Burning point.

সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ তেল বা চর্বির সঙ্গে যেন কোনও অন্য বা Acid না থাকে। তাহলে তেল ব্যবহারের অংশগুলিতে মরিচা দাগ পড়ে যায় ও যন্ত্র নষ্ট হয়।

আগেকার দিনে উদ্ভিজ্জ তেল—যেমন রেড়ির তেল, সরিষার তেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো—কিন্তু এতো অম্ল বেশী থাকে বলে আজকাল ব্যবহৃত হয় না। গ্লিসারিন আপাতদৃষ্টিতে পিচ্ছিলকারী দ্রব্য বলে মনে হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে লুব্রিকেটিং পদার্থ কিছুই থাকে না। তাই আজকাল খনিজ তেল জন্তুর চর্বি বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণতঃ ইঞ্জিনের গতিশীল অংশগুলিকে পিচ্ছিল রাখার জন্য দুইভাবে তেল দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তা হলো—

১। পাম্পের দ্বারা—Forced feed।

২। স্প্ল্যাস্ড্ প্রণালীতে—Splashed feed।

তেলের বিষয়ে মোটামুটি বলা হলো। এবার ইঞ্জিনকে শীতল রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

ইঞ্জিন শীতল রাখার ব্যবস্থা (Cooling system)

ইঞ্জিনকে সাধারণতঃ দুইভাবে শীতল রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১। বায়ুর দ্বারা—Air cooling.

২। জলের দ্বারা—Weter cooling.

সাধারণতঃ ছোট ছোট ইঞ্জিন বাতাসের দ্বারা ঠাণ্ডা রাখা হয়। কিন্তু বড় বড় ইঞ্জিনে তা হয় না। এগুলি জল দ্বারা ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

রেডিয়েটার বা কুলিং ট্যাঙ্ক

মোটরের ইঞ্জিনের উপরের ঢাকনা বা বনেট খুলে ফেললে মোটর গাড়ির সামনে যে জালের মতো অংশ দেখা যায়, সেটাই হলো রেডিয়েটার। ইঞ্জিন চলতে থাকলে সিলিণ্ডারের মধ্যেকার গরম গ্যাসের দ্বারা তা উত্তপ্ত হয়ে যায়। এটি যত গরম হয়, ততই এর কাজের ক্ষমতা কমে যেতে থাকে।

সিলিণ্ডার বেশী গরম হলে তার লুব্রিকেটিং তেল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে চালু অংশগুলিকে মসৃণ করবার ক্ষমতা আর তার থাকে না। জোর করে ইঞ্জিন চালাবার চেষ্টা করলে বিয়ারিং-এর উপরে বেশী চাপ পড়ে তা ক্ষয় হয়ে যায়।

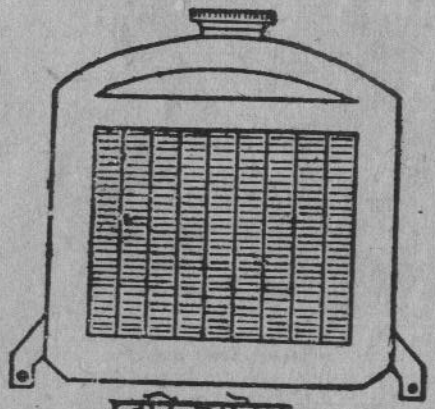

রেডিয়েটার

(বাইরের দৃশ্য)

এই অসুবিধা দূর করার জন্যে সিলিণ্ডারের বডিকে ফাঁপা করা হয়। এর মধ্যে পাইপ দ্বারা জল চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।

ঐ ঠাণ্ডা জল শীতল পাত্রে থাকে। ঐ পাত্রে বিশেষভাবে তৈরি এবং তাকে বলা হয় রেডিয়েটার।

ঐ জলাধারটি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্যে, তা একটি চাদরের দ্বারা তৈরি করা হয় না, সরু সরু তামার পাইপের দ্বারা এটি তৈরি হয়। ঐ পাইপ গুলিকে বায়ু সংযোগ করে ঠাণ্ডা করার জন্যে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হয়। তাড়াতাড়ি তা ঠাণ্ডা কারার জন্যে পাতলা লোহা, পিতল বা তামার চাদর, চৌকো ছোট ছোট পাতার মতো করে কেটে, তার মধ্যভাগগুলি পাইপ কেটে বসিয়ে ঝেলে দেওয়া হয়। এই পাতাগুলো দেড় বা দুই সুতো ব্যবধানে বসানো হয়। ঐগুলিকে বলে রেডিয়েটিং ফিন্‌স।

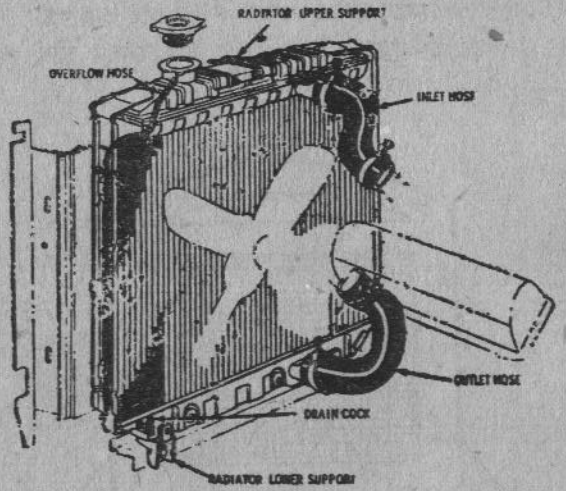

রেডিয়েটারের ভিতরের দৃশ্য (ফ্যানসহ)

রেডিয়েটারে জলস্রোত বিশেষভাবে ব্যবহারের জন্যে পাইপগুলিকে মৌচাকের মতোও করা হয় তাকে বলে হানিকম্ব রেডিয়েটার (Honeycomb radiator)। এখানে একটি রেডিয়েটারের ক্রশ-সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদ ছবিতে দেখান হলো।

রেডিয়েটারের সঙ্গে আজকাল একটা পাখা বা ফ্যান যোগ করা থাকে। এর ফলে বাতাস দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এখানে একটি ছবি দ্বারা কিভাবে রেডিয়েটারের ভিতরের দিকে যে ফ্যান্ ফিট্ করা হয় একে বলা হয় Suction Fan।

সাক্‌শন্ ফ্যান্ (Suction Fan)

সাক্‌শন ফ্যানের কাজ হলো রেডিয়েটারের বাতাস শীতল করা ও গরম বাতাস বের করে দেওয়া। ভিতরের বাতাস বের করে দেওয়া হয় এই ফ্যান দ্বারা। তার বদলে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে ও রেডিয়েটার ঠাণ্ডা হয়। রেডিয়েটার দ্বারা ইঞ্জিনের বাইরের অংশ ঠাণ্ডা রাখার জন্য দু'ভাবে তা করা হয়।

(১)। **থার্মো-সাইফন্ সিস্‌টেম**—এতে গরম জল উপরে উঠে যায় আর ঠাণ্ডা জল সাইফন্ প্রসেসে আপনা থেকেই ইঞ্জিনের চার পাশ ছোট-খাট টিউব দ্বারা বাহিত হয়।

(২) **পাম্পিং সিস্‌টেম**—এতে পাম্পের মাধ্যমে শীতল জল ইঞ্জিনের জল সরবরাহ প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাতায়াত করে থাকে।

অবশ্য দুই ধরনের কাজের সাক্‌শন্ ফ্যান্ থাকলে তা ভাল কাজ দেয়—তাই আজকাল সব গাড়িতেই এই ফ্যান থাকে।

রেডিয়েটারের পরিচ্ছতা

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, রেডিয়েটারের মধ্যে নানা ধরনের ময়লা জমে। তার ফলে তার কাজ ঠিকমতো হয় না। এর কারণ হলো ময়লা, কার্বন প্রভৃতি রেডিয়েটারে জমে যায়। ফলে জল শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় না।

রেডিয়েটারে জল তাড়াতাড়ি গরম হয়ে গেলে, ইঞ্জিন গরম হয় ও তাতে অনেক ক্ষতি হয়। রেডিয়েটার অপরিষ্কার হলে তা সোডা ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। তা না হলে, এতে কাজ হয় তা ও ইঞ্জিনের ক্ষয়ক্ষতি হতে বাধ্য।

যদি গাড়ি চালাতে চালাতে রেডিয়েটারের জল হঠাৎ গরম হয়ে যায় তবে তা পাল্টে ফেলা উচিত। এতে পরিষ্কার জল ব্যবহার করা কর্তব্য।

কুলিং ট্যাঙ্ক (Cooling Tank)

বড় বড় গাড়ি, লরি, বাস প্রভৃতিতে দুটি রেডিয়েটার ব্যবহৃত হয়। একটি

রেডিয়েটারের সঙ্গে থাকে আর একটি বড় ট্যাঙ্ক—যাতে সঞ্চয় করা হয়। এই দ্বিতীয়টিকে বলে কুলিং ট্যাঙ্ক।

লিংকু ট্যাঙ্ক থেকে জল রেডিয়েটারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই জলে প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। রবারযুক্ত ক্যানভাস্ পাইপ দিয়ে কুলিং ট্যাঙ্ক ও রেডিয়েটার যুক্ত হয়ে থাকে।

কম শব্দ করার ব্যবস্থা (Silencing System)

ইঞ্জিনের ভিতরে গ্যাস বিস্ফোরণ হলে তার জন্য একটা শব্দ হয়—ভট্ ভট্ করে। এই শব্দ বন্ধ করার জন্যে যে ব্যবস্থা হয় তাকে বলা হয় সাইলেন্সিং সিস্টেম্।

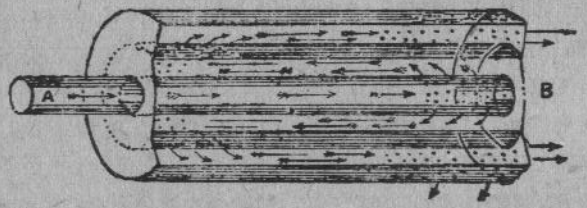

সাইলেন্সার

যদি কোনও শব্দ একটি সরু নলের মধ্যে দিয়ে পর পর আঁকাবাঁকা গতিতে ভ্রমণ করে—তবে তার শব্দ ক্ষমতা কমে যায়। এই নিয়মের উপরে নির্ভর করেই মোটর গাড়ির একজস্টের শব্দ কমাবার জন্যে সাইলেন্সার সৃষ্টি হয়েছে।

একজস্ট গ্যাস নির্গমনের পথের চারিদিকে পর পর ক্রমশঃ মোটা নালী থাকে—একটি নালীর সঙ্গে থাকে অন্য নালীর যোগ। শব্দকে এই সব পথ ভ্রমণ করে আসতে হয়—আর ফলে তার শব্দ বের হয় না।

যদি এই সাইলেন্সার খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ইঞ্জিন থেকে ভট্ ভট্ শব্দ বের হতে থাকে। অনেক সময় সাইলেন্সারে জল কাদা প্রভৃতি লাগে। তার ফলেও এর কাজ নষ্ট হয়ে যায়। আবার মরিচা পড়ে গেলে এতে ছিদ্র হয়ে যায় এবং ক্ষমতা কমে যায়।

সাইলেন্সারকে মাঝে মাঝে খুলে তা পরিষ্কার করা অবশ্য কর্তব্য।

আজকাল সাইলেন্সার নাট, বোল্টু দ্বারা লাগানো হয়। তার কারণ হলো, সাইলেন্সার রিপিট্ দিয়ে আঁটা থাকলে তা খুলে পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয়ে থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গাড়ির আলোক ব্যবস্থা বা লাইটিং সিস্টেম্

মোটর গাড়িতে অনেকগুলি আলো থাকে। তা ছাড়া থাকে রেডিয়েটার ফ্যান বা প্রয়োজন হলে ভিতরের ফ্যান। সব কিছু বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মোটর গাড়িতেই থাকে।

মোটর গাড়ির প্রধান লাইট হলো, দুটি হেড্লাইট। হেডলাইট দুটি রিফ্লেক্টারের সাহায্যে আলোকে বর্ধিত করতে পারে ও অনেক দূর অবধি তা নিক্ষেপ করতে পারে। এখানে গাড়ির হেড্লাইটের রিফ্লেক্টারের একটি ছবি দেওয়া হলো। রিফ্লেক্টারের মধ্যে যে উজ্জ্বল তলভাগ (Surface) থাকে, তা ঠিক রূপোর মতো চক্চক্ করে।

হেড্লাইটের চারপাশে থাকে রিম্। তার মধ্যেই থাকে রিফ্লেক্টার। তার পেছনে থাকে বাল্ব বসবার জায়গা।

বাল্ব বসাবার জায়গাতে বাল্ব থাকে। এর পেছনে থাকে তার। ওই তার দিয়ে বাল্বে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করা হয়, স্টোরেজ ব্যাটারীর দ্বারা।

এ ছাড়া গাড়িতে আরও অনেক আলো থাকে। হেড্লাইটের দু-পাশে আরও দুটি ছোট ছোট আলো থাকে—তাকে বলে সাইড্লাইট। ওর মধ্যে একটি হলুদ—অন্যটি লাল। রাতে যদি পেছনের গাড়ি সংকেত দ্বারা আগে যেতে চায়, তাহলে হলুদ বাতি জ্বালিয়ে সংকেত দেখায়। আর যদি যাবার জায়গা না থাকে তাহলে লাল বাতি দ্বারা "রাস্তা নেই" সংকেত দেখায়।

সামনে হেড্লাইটের সঙ্গে থাকে পেছনের ব্যাক লাইটের সম্পর্ক। সামনের হেড্লাইট জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লাইট জ্বলে ওঠে।

পেছনের লাইট বা ব্যাক লাইট, নাম্বার প্লেট দেখা ও পেছনের গাড়ির সংকেতের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরোহীর মাথার উপরে অধিকাংশ গাড়িতেই বাতি

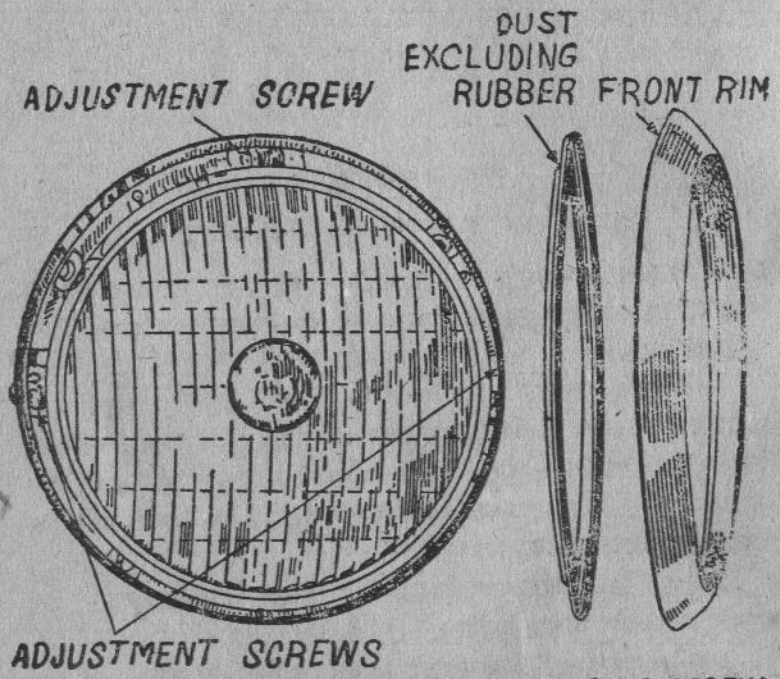

লাইটিং হেড্‌লাইট

থাকে। অনেক সময় আটোমেটিকভাবে এটি জ্বলে। গাড়ির দরজা খুলে দিলেই জ্বলে ওঠে—বন্ধ করলে নিভে যায়।

সিগ্‌ন্যাল লাইট (Signal Light)

গাড়িকে রাতের বেলা ঘোরাতে হলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পাশে স্থিত সিগ্‌ন্যাল লাইট জ্বলে ওঠে। অনেক সময় ওটা লম্বা আকারের হয়। গাড়ি ঘুরলেই ওটা নিভিয়ে দেওয়া হয়।

অনেক সময় গাড়ি যে দিকে ঘুরবে সেই দিকের হেড্‌লাইট নিভিয়ে দিয়েও সিগ্‌ন্যাল দেওয়া হয়। গাড়ি ডানদিকে ঘুরলে ডানদিকের হেড্‌লাইট বা বাঁদিকে ঘুরলে বাঁদিকের হেড্‌লাইট নেভানো হয়।

স্টোরেজ ব্যাটারী (Storage Battery)

গাড়ির সবগুলো আলোই জ্বলে থাকে যে, বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সাহায্যে তাকে বলে স্টোরেজ ব্যাটারী।

এটি আকারে একটা ছোট কাঠের বাক্সের মতো হয়। এখানে একটি ছবি দিয়ে স্টোরেজ ব্যাটারী কি এবং তা কিভাবে কাজ করে, তা বুঝিয়ে দেওয়া হলো ;

স্টোরেজ ব্যাটারীতে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়ে থাকে।

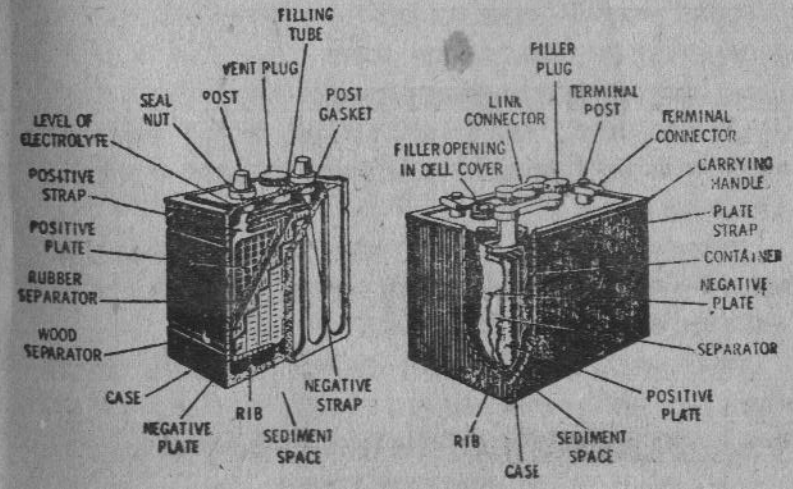

স্টোরেজ ব্যাটারী

যখনই স্টোরেজ ব্যাটারীর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাটারীর দোকান থেকে নতুন করে চার্জ করে নিতে হয়। তাহলে তা আগের মতোই কাজ করে থাকে।

এই ব্যাটারীতে থাকে একটি নেগেটিভ ও একটি পজিটিভ অংশ। তাকে বলে—

১। নেগেটিভ প্লেট ও নেগেটিভ স্ট্র্যাপ।

২। সেপারেটার প্লেট—কাঠের তৈরি।

৩। পজিটিভ প্লেট ও পজিটিভ স্ট্র্যাপ।

তা ছাড়া এর মধ্যে থাকে রবার সেপারেটার ও উড্ সেপারেটার। একটি বাক্সে এটি থাকে—তাকে বলা হয় কেস।

ব্যাটারী রিফিল্ করতে হলে তার জন্যে থাকে ফিলিং টিউব। এর সঙ্গে থাকে প্লাগ্, মিল্ নাট প্রভৃতি। মোট কথা, এটি একটি পূর্ণ ইলেকট্রিক জেনারেটারের কাজ করে। তবে এটির ক্ষমতা নির্দিষ্ট—তাই রিফিল্ করার প্রয়োজন হয়।

ব্যাটারীর প্রকারভেদ

ব্যাটারী প্রধানতঃ দু' ধরনের হয়ে থাকে। তা হলো—

১। স্ন্যাপ সেল ব্যাটারী :—গোল সেলযুক্ত।

২। ড্রাই সেল ব্যাটারী :—শুকনো সেলযুক্ত।

ড্রাই সেল ব্যাটারী দ্বিতীয়বার চার্জ করা সম্ভব হয় না। যেমন টর্চের ব্যাটারী বা ট্রানজিস্টারের ব্যাটারী। এটি খরচ হয়ে গেলেই নতুন ব্যাটারী আবার লাগাতে হবে।

স্টোরেজ ব্যাটারীজ কাজ হলো বিদ্যুৎশক্তিকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত বা জমা করে রাখা—কিন্তু তারা বিদ্যুৎ তৈরি করে না। এই ডায়নামোকে চার্জ করে—তার ফলে ডায়নামোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

মোটর গাড়ির নেগেটিভ টার্মিনালের একটি তার চেসিসের সঙ্গে লাগানো থাকে। এটি আর্থ হয়—তার ফলে সারা চেসিসটাই নেগেটিভের কাজ করে থাকে। একটি পজিটিভ তার দ্বারাই তখন বিদ্যুতের কাজ সম্পন্ন হয়।

কানেকশনের প্রকারভেদ

ব্যাটারী জোড়ার জন্যে দু'ধরনের কানেকশন করা হয় :

১। সিরিজ কানেকশন—এই কানেকশনে একটির পজিটিভের সঙ্গে অন্যটির নেগেটিভ আটকানো হয়। এইভাবে সবগুলির মিলিত বিদ্যুৎশক্তির ভোল্টেজ এতে পাওয়া যায়—কিন্তু এম্পিয়ার এক ব্যাটারীর সমান হয়ে থাকে।

২। প্যারালাল কানেকশন—এতে একটি ব্যাটারীর নেগেটিভের সঙ্গে অন্যটির নেগেটিভ যুক্ত হয়। এতে যতগুলি ব্যাটারী যুক্ত করা হয় সবগুলির এম্পিয়ার

মিলিত হয়ে যায়। কিন্তু এতে ভোল্টেজ এক ব্যাটারীর সমানই পাওয়া যায়।

ব্যাটারীর দোষ দূর করা

যদি ব্যাটারীর ঠিকমতো দেখাশোনা করা হয় এবং এটি চার্জ হবার পর তাড়াতাড়ি ডিস্চার্জ করা হয়, তাহলে এটি তাড়াতাড়ি খারাপ হয় না। কিন্তু যদি তা করা না হয়, তাহলে এটি তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।

এই জন্যে ব্যাটারীর দোষ বা গোলমাল কত প্রকার হয় ও কিভাবে তা দূর করা যায় তা বলা হচ্ছে।

ধীরে ধীরে ব্যাটারীর চার্জ বন্ধ হয় কেন

ব্যাটারীর চার্জ কমিয়ে দিলে ওয়্যারিংয়ের সাধারণ শর্ট সার্কিটেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে, তা খারাপ করে দিতে পারে। তাছাড়া এর গ্রাউন্ড তার তেলে ভিজে গেলেও এটি খারাপ হয়ে যায়। সেপারেটোর ইন্সুলেটারগুলি খারাপ হলে বা প্লেটের নিচে মরচে জমলে তার ফলেও এটির চার্জ দেবার শক্তি কমে যায়। নিয়মিতভাবে ব্যাটারী পরিষ্কার রাখা উচিত এবং প্লেটে ময়লা জমলে তা ভাল পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে ধীরে ধীরে ব্যাটারী চার্জ বন্ধ হয়, এমন কি অকস্মাৎ তা চার্জ দেওয়া বন্ধ করতে পারে।

ব্যাটারী তাড়াতাড়ি খারাপ হয় কেন

অনেক ব্যাটারীর মধ্যে প্লেটের উপরে সাদা জল দেন—তাহলে প্লেটের মশলা পৃথক হয়ে তা খারাপ হয়ে যায়। এইজন্য এতে ডিসটিল্ড্ ওয়াটার দেওয়া উচিত। মোটর গাড়ির স্টিয়ারিং-এর যে হর্ণ বোতামে চাপ দিয়ে বাজানো হয়, এটি বেশীক্ষণ চেপে রাখা উচিত নয়—তাতে ব্যাটারী তাড়াতাড়ি খারাপ হতে পারে। সেল্ফ্ স্টার্টারও বেশীক্ষণ চেপে রাখা উচিত নয়।

রাতে গাড়ি গ্যারেজ বন্ধ করার আগে দেখা উচিত, ব্যাটারীতে কোন শর্ট সার্কিট হচ্ছে কিনা, তাহলে ব্যাটারী তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সব চেয়ে ভাল উপায় হলো ব্যাটারীর একটি টার্মিনাল খুলে ব্যাটারীর থেকে পৃথক করে রাখা।

ব্যাটারীকে মরচে ধরা থেকে বাঁচাবার উপায়

১। ব্যাটারীকে জং ধরা থেকে বাঁচাবার জন্যে নেগেটিভ ও পজিটিভ

টার্মিন্যাল ভালভাবে সাফ করা উচিত। নেগেটিভ টার্মিন্যাল N লেখা থাকে ও পজিটিভে P লেখা থাকে। এই টার্মিন্যালে পেট্রোলিয়াম জেলী বা গ্রিজ লাগালে তা ভাল থাকে ও জং ধরে না। কিন্তু কেবল এই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও এগুলি কদ্বাচ লাগানো উচিত নয়।

ডিফার সিস্টেম্

ডিফার গাড়ির হেড্লাইটের জন্যে ব্যবহৃত একটি সুইচ্ বিশেষ। এটি একবার টিপলে অল্প আলো জ্বলে—দুবার টিপলে বেশী আলো জ্বলে। যখন গাড়ি সামনে যেতে চায় বা আগের গাড়ির কাছে রাস্তা চায়, তখন ডিফার প্রয়োগ করা হয়। গাড়ির বেগ হঠাৎ কমিয়ে দিলে আগের গাড়ি বুঝবে যে, পেছনের গাড়ি রাস্তা চায় না। সে অল্প আলো জ্বালছে, যাতে আগের গাড়ির ড্রাইভারের চোখ ধাঁধিয়ে না যায়।

আর যদি পেছনের গাড়ি আগে যেতে চায়, তাহলে সে জোর আলো জ্বালবে—আগের গাড়ি বুঝবে যে, পেছনের গাড়িটা এগিয়ে যেতে চায়। সে তখন তাকে পাশ দিয়ে যেতে দেবার পথ করে দেবে।

হেড্লাইটের কাজ সাধারণতঃ রাতের বেলা দরকার হয়। অন্যান্য লাইটেরও তাই। রাতের বেলা হাত দিয়ে সিগ্ন্যাল দেখানো যায় না—তাই এই সিগ্ন্যাল লাইট ও হেড্লাইট দরকার হয়ে থাকে।

জেনারেটার

অনেক সময় মোটরে ব্যাটারী ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটারের সাহায্যেও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। অবশ্য আমাদের দেশে এ প্রথাই খুব বেশী চালু। ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে যে-সব মোটর স্টার্টারের কাজ করে, তাদের জন্য জেনারেটারের অবশ্য প্রয়োজন হয়।

জেনারেটার ও ডায়নামো (Generator & Dynamo)

জেনারেটার বা ডায়নামা হলো সেই যন্ত্র যা মেকানিক্যাল শক্তির সৃষ্টি করে ও তা পরিচালিত করে এবং এর দ্বারা ইলেকট্রিক শক্তি অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ দুই ধরনের হয়—তা হলো এ. সি. ও ডি সি.। এ. সি. বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রকে বলা হয় জেনারেটার ও ডি. সি. বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী যন্ত্রকে বলা হয় ডায়নামো।

মোটর গাড়িতে আপনা থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তবে নিজস্ব যে ডায়নামো থাকে তাতেই এটি উৎপন্ন হয় এবং ইগ্নিশন সিস্টেম্ ও আলো প্রভৃতি তার সাহায্যেই জ্বলে। এমন কি প্রয়োজনে ফ্যানও চালান যায়। এই বিদ্যুতের সাহায্যেই সেল্ফ্ স্টার্টার কাজ করে ও গাড়ি চালু হয়।

ডায়নামোর কর্মপদ্ধতি

ডায়নামোতে মোট তিনটি সার্কিট হয়ে থাকে। তা হলো—

১। ফীল্ড সার্কিট (Field circuit)।
২। শর্ট সার্কিট (Short circuit)।
৩। মেন চার্জিং সার্কিট (Main charging circuit)।

ফীল্ড সার্কিট—ইঞ্জিন স্টার্ট হবার পর ক্র্যাঙ্কপুলি বা ফ্যানবেল্ট দ্বারা ডায়নামোর আর্মেচার কেসিং-এর মধ্যে ঘুরতে শুরু করে। এই আর্মেচার ঘুরতে থাকার জন্যে ম্যাগ্নেটিক ফীল্ড তৈরি হতে থাকে—যার জন্যে আর্মেচারে বৈদ্যুতিক কারেণ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। তার কারণ পোলবেস সাধারণ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এই কারেণ্ট কমিউটেটারের মধ্যে গিয়ে কণ্ট্রোল কার্বন ব্রাশের পথে ফীল্ড কয়েলে একত্রিত হয়ে থাকে।

এই কারেণ্ট প্রবিষ্ট হলেই পোলবেসগুলি ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে যায় এবং আগের থেকে বেশী ম্যাগনেটিক ফীল্ড সৃষ্টি করে থাকেন। তার ফলে আর্মেচার থেকে বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে শুরু করে। এই কাজকে বলা হয় ফীল্ড সার্কিট। এই সার্কিট ভিতরেই বদলাতে থাকে বলে এই নাম।

পর পৃষ্ঠায় ছবিতে ডায়নামোর বিভিন্ন পার্টস দেখানো হলো—

১। ডায়নামো ড্রাইভ পুলি (Dynamo Drive Pully)
২। ডায়নামো ফ্যান (Dynamo Fan)
৩। সাইড প্লেট (Side Plate)
৪। বেল্ট এড্জাস্টিং হোল (Belt Adjusting Hole)
৫। আর্মেচার শ্যাফ্ট্ (Armeture Shaft)
৬। আর্মেচার (Armeture)
৭। কমিউটেটার সামিট (Commutator Summit)

৮। কমিউটেটার (Commutator)
৯। আর্মেচার বাইণ্ডিং (Armeture Binding)
১০। ফীল্ড কয়েল (Field Coil)

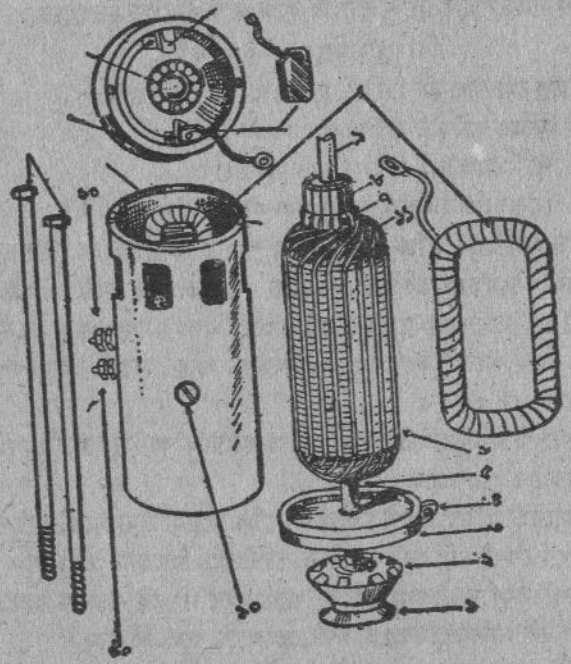

১১।—ডায়নামো বডি (Dynamo Body)
১২। ডায়নামো কভার ও হোল্ডার প্লেট (Dynamo Cover & Holder Plate)
১৩। হোল্ডিং বোটের হোল (Hole of holding Boat)
১৪। ফীল্ড ম্যাগনেট খোলার স্ক্রু (Field Magnet Screw)
১৫। ফীল্ড টার্মিন্যাল (Field Terminal)
১৬। বডি হোল্ডিং বোট (Body Holding Boat)

১৭। বল্ বিয়ারিং (Ball Bearing)
১৮। পজিটিভ টার্মিন্যাল (Positive Terminal)
১৯। বুশ হোল্ডার (Bush Holder)
২০। কার্বন ব্রাশ (Carbon Brush)

শর্ট সার্কিট—যখন ফীল্ড সার্কিট পূর্ণ হয়ে যায় এবং ইঞ্জিনের গতি আগের থেকে জোরে হয়ে দ্রুত ম্যাগনেটিক ফীল্ড সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আর্মেচারে বেশী বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হতে থাকে।

ফীল্ড সার্কিট পূর্ণ হবার জন্যে বেশী ইলেকট্রো ম্যাগনেট সৃষ্টি হয় এবং আগের থেকে বেশী চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়—তার ফলে বেশী চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হতে থাকে।

এই আর্মেচারে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কমিউটেটার একত্রিত হয়ে পজিটিভ ব্রাশ বা মেন ব্রাশের পথে বেরিয়ে আসে ও তারগুলির দ্বারা কাট-আউটের ভিতরে চলে আসে।

সেখানে শর্ট ওয়াইণ্ডিং-এর মধ্যে এসে, কাট-আউটের আয়রণকোরকে ইলেকট্রো ম্যাগনেট বানিয়ে দেয়। এই আয়রণকোর ইলেকট্রো ম্যাগনেট হয়ে ব্যাটারী পয়েণ্টকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে—কিন্তু তা পারে না। কারণ এর আবশ্যকতার চেয়ে কম বিদ্যুৎ মেলে, তার ফলে এই আয়রণ-কোর থেকে ব্যাটারী পয়েণ্টকে টানার মতো উপযুক্ত শক্তির চৌম্বক প্রভাব হয় না। ব্যাটারী পয়েণ্ট আয়রণকোরের সঙ্গে না মেলার জন্যে আর্মেচার দ্বারা উৎপন্ন কারেণ্ট কাট-আউট থেকে বাপিন আর্মেচারে চলে আসে। এই কাজকে বলে শর্ট সার্কিট।

কাট-আউট এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে এই কারেণ্টকে কাজে লাগানো যায়।

মেন চার্জিং সার্কিট—যখন ইঞ্জিনের গতি কম করে ঘণ্টায় ১৫ মাইল হয়, তখন আর্মেচার প্রচুর জোরে ঘুরতে থাকে—বার ফলে আর্মেচারে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে থাকে। এই বিদ্যুৎ ও কমিউটেটারে একত্রিত হয়ে মেন কার্বন ব্রাশের পথে কাউ-আউটে আসে ও আয়রণকোরের সঙ্গে মিশে বেশী শক্তির ম্যাগনেট উৎপন্ন করে। এই চৌম্বক প্রভাবের ফলে আয়রণকোর কাট-আউটের আয়রণকোরের সঙ্গে মিলে যায়। তখন ব্যাটারী ও ডায়নামোর উৎপন্ন কারেণ্ট

মিলে যে তেজী কারেণ্ট উৎপন্ন করে তাকে বলে মেন চার্জিং সার্কিট। সেল্‌ফ স্টার্টার ইঞ্জিনে আবার এইভাবেই চার্জ করে ইঞ্জিন স্টার্ট করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপন্নের প্রকার-ভেদ

বিভিন্ন গাড়িতে বিভিন্নভাবে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়—এদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। এদের যে-কোনও একভাগে প্রতিটি গাড়িতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১। থার্ড ব্রুশ কণ্ট্রোল সিস্‌টেম।
২। সি. এ. বি. কম্‌পেন্‌সেটারিং ভোল্টেজ কণ্ট্রোল সিস্‌টেম।
৩। এম. সি. এল. কনস্ট্যাণ্ট কারেণ্ট কণ্ট্রোল সিস্‌টেম।

ডায়নামোর দেখাশুনা ও রক্ষণ (Maintenance)

১। ডায়নামোর ব্যাটারী যেন শুষ্ক হয়ে না যায়—তা হলে তা দ্রুত খারাপ হয়ে যায়।

২। পথে চালাবার সময় পিনকে পৌনে এক ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি মতো ঢিলা রাখা উচিত। তাতে ম্যাগ্‌নেটিক ভোল্ট উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়।

৩। ডায়নামোর টার্মিন্যালে বিদ্যুতের তরঙ্গ চালু থাকা অবধি এটি খারাপ হয় না। কিন্তু টার্মিন্যাল আর্থ হলে তাতে এর ক্ষতি হয়। সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৪। ডায়নামোর তার যখন তখন খোলা উচিত নয়। তারটি ঠিক সেই সময় খোলা উচিত যখন স্টেট করার প্রয়োজন হয়। স্টেট করার পর তারগুলিকে আবার ঠিক জায়গামতো ফিট্‌ করে দিতে হবে অবশ্যই।

তারগুলি উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে আর্মেচার জ্বলে যেতে পারে, মনে রাখবেন।

৫। যখন ডায়নামো থেকে কারেণ্ট সৃষ্টি হয় না, তখন কমিউটেটারকে রেগমারের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়া উচিত। তাতে এটি খারাপ হলে ঠিক হয়ে যায়।

৬। স্প্রীং দুর্বল হলে তা পাল্টে দিতে হবে।

৭। এর হোল্ডার জাম হয়ে গেলে তা অবশ্য ঢিলা করিয়ে নেওয়া কর্তব্য।

৮। কার্বন ব্রাশের যে তার বাইরে বেড়ে থাকে এটি যেন কদাচ বাঁড়র সঙ্গে

আর্থ না হয়। এটি ঢিলা হওয়াও উচিত নয়। এটি আর্থ হলে তা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দিতে হবে। ঢিলা হবার মতো হলে তা জোরে কষে আট্‌কে দিতে হবে। কমিউটেটারের সঙ্গে এই কার্বন ব্রাশের যেন ঘর্ষণ না হয়।

স্টার্টার (Starter)

মোটরের স্টার্টার চার রকমভাবে কাজ করে থাকে। তা হলো—

১। **মেকানিক্যাল স্টার্টার**—এই স্টার্টারের সাহায্যে আগে হ্যাণ্ডেল মেরে স্টার্ট দেওয়া হতো। আজকাল এর ব্যবহার নেই।

২। **স্টার্টিং ম্যাগ্নেটো**—সাধারণ ম্যাগ্নেটো ছাড়া আর একটি ম্যাগ্নেটো ড্যাস-বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রয়োজন হলে, ইঞ্জিনে গ্যাস বন্ধ করে এটি হাত দিয়ে ঘোরালো গাড়ি স্টার্ট নেয়।

৩। **কম্‌প্রেস্‌ড এয়ার স্টার্টার**—একটি বোতলের মতো যন্ত্রে কম্‌প্রেস্‌ড এয়ার বায়ু থাকে। প্রয়োজন হলে, এই বায়ুর সাহায্যে ভাল্‌ব খুলে গাড়ি স্টার্ট নেয়।

৪। **ইলেকট্রিক মোটর স্টার্টার**—এটিই আজকাল সবচেয়ে বেশী চালু ব্যবস্থা। এতে মোটরের চাবির সঙ্গে একটি সুইচ যুক্ত থাকে। এই সুইচটির চাবি ঘুরিয়ে অন করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজ শুরু হয়ে যায়। এ বিষয়ে আগেই কিছুটা বলা হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্টিয়ারিং ও গীয়ার ব্যবস্থা

মোটর গাড়ির অটোমেটিক স্টার্টিং ব্যবস্থা, চাবির দ্বারা বৈদ্যুতিক সুইচ চালিয়ে করা হয়, তা আগে বলা হয়েছে।

কিন্তু তাছাড়া যে প্রধান অংশগুলি গাড়ি ঠিকমতো চালাতে প্রয়োজন হয়, তা হলো স্টিয়ারিং, গীয়ার ও বিভিন্ন প্যাডেল,—অর্থাৎ ক্লাচ প্যাডেল, ফুটব্রেক

প্যাডেল, এ্যাক্সিলারেটার প্যাডেল প্রভৃতি। তাছাড়া বিভিন্ন সুইচের যে ব্যবস্থা আছে, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

স্টিয়ারিং ব্যবস্থা

মোটর গাড়িতে ড্রাইভারের আসনে বসলেই, প্রথমে দেখা যাবে, সামনের লোহার রোডের উপরে একটি চাকা বসানো আছে। একেই বলে স্টিয়ারিং—এর পুরো নাম হলো স্টিয়ারিং হুইল। এর সঙ্গে একটি রড লাগানো থাকে। এই রডের সঙ্গে সামনের চাকার যোগাযোগ থাকে। এই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সামনের দুটি চাকাকে ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোরানো যায়—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোরে।

খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়—কারণ স্টিয়ারিং কতটুকু ঘোরালে গাড়ি কতটা এপাশে বা ওপাশে যাবে, তা জানতে হলে, অভ্যাসের প্রয়োজন। মাঝি যেমন হাল ধরে নৌকার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে—ঠিক তেমনি এই স্টিয়ারিং মাঝামাঝি থাকলে গাড়ি সোজা চলে—এটি যেটুকু বাঁদিকে ঘোরানো হবে, গাড়ি ততটুকু বাঁদিকে বেঁকবে। ঠিক তেমনি ডানদিকে যতটা ঘোরানো যাবে, ততটা ডানদিকে ঘুরবে। স্টিয়ারিং প্র্যাকটিস করা, গাড়ি চালানোর একটা প্রধান শিক্ষা।

স্টিয়ারিং-এর ঠিক মাঝখানে থাকে একটি সুইচ। এটা হলো ইলেকট্রিক হর্ণের সুইচ। এটি টিপলে ইলেকট্রিক হর্ণ বেজে ওঠে।

স্টিয়ারিং-এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

১। **স্টিয়ারিং হুইল**—ড্রাইভারের সিটের সামনে যে গোল চাকার মতো বস্তুটি থাকে—যা ঘুরিয়ে ড্রাইভার গাড়িকে ডাইনে-বাঁয়ে ইচ্ছামতো নিয়ে যেতে পারে—সেটাই স্টিয়ারিং হুইল। গোল চাকাটির মাঝে থাকে তিনটি লম্বা ডাঁটার মতো অংশ—তার মাঝে থাকে একটি ছোট গোল চাকতির মতো। এই চাকতিটির মাঝে আটোমেটিক হর্ণের বোতাম লাগানো থাকে। যখন গাড়ি ঘোরানো দরকার, তখনই এটি ঘুরিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ঘোরায়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে স্টিয়ারিং শ্যাফট্।

২। **স্টিয়ারিং শ্যাফ্ট**—এটি শ্যাফ্ট্ বা মোটা রডের মতো। এর এক মাথায় থাকে স্টিয়ারিং হুইল যুক্ত—অন্য মাথায় থাকে আর্ম বা শ্যাফট্ আর্ম—

শ্যাফ্ট্ কলাম দ্বারা ঢাকা থাকে।

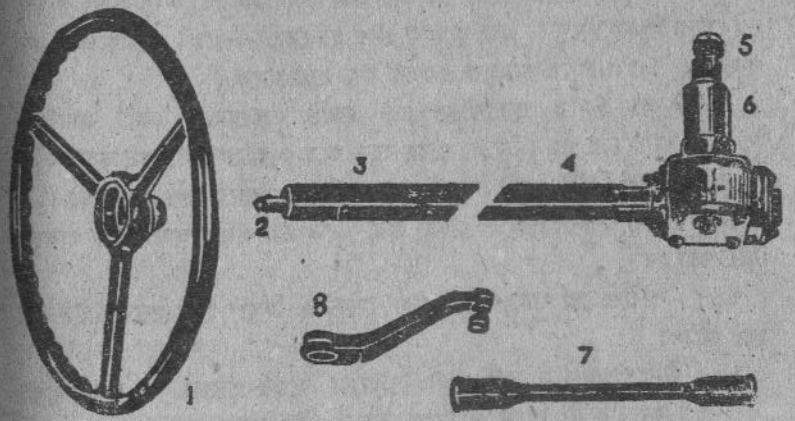

(1) স্টিয়ারিং হুইল। (2) স্টিয়ারিং শ্যাফ্ট্। (3) স্টিয়ারিং কলাম। (4) স্টিয়ারিং গীয়ার। (5) নাট্ সাক্শন্ শ্যাফ্ট্। (6) সাক্শন্ শ্যাফ্ট্। (7) শ্যাফ্ট্ আর্ম। (8) ইনার ওয়াশার।

৩। **শ্যাফ্ট্ আর্ম**—এটি একটি আর্মের মতো আকৃতির। মাঝখান অপেক্ষাকৃত সরু—দুদিকে মোটা। এটি স্টিয়ারিং শ্যাফ্টের সঙ্গে চাবি বা এস্প্লেন দিয়ে যুক্ত থাকে এবং শ্যাফ্টের সঙ্গে কাজ করে। এটির দুদিকের মোটা টেপার রোলার, বিয়ারিং-ব্যবস্থা দ্বারা কাজ করে থাকে।

৪। **সেকটার**—এর উপরে দাঁত বসানো থাকে। এই দাঁত আর্মের সঙ্গে মিলে যায় এবং উপরে কোরউইং করে সেকটার শ্যাফ্ট্ জোড়া হয়। সেকটার শ্যাফ্টের অন্য মাথায় এস্প্লেন লাগানো হয়—তার সঙ্গে ড্রাফ্ট্ আর্ম ফিট্ করা হয়।

৫। **স্টিয়ারিং কলাম**—এটি একটি খোলা পাইপের মতো অংশ—যার মধ্যে স্টিয়ারিং শ্যাফ্ট্ কাজ করে। এর কাজ হলো স্টিয়ারিং শ্যাফ্ট্কে রক্ষা করা।

৬। **স্টিয়ারিং গীয়ার বক্স্**—এটি দেখতে অনেকটা বাক্সের মতো। এর মধ্যে আর্ম ও সেকটার এবং আরও কিছু যন্ত্রাংশ কাজ করে থাকে। এই বক্সের

মধ্যে তেল বা গ্রীজ ভরা হয়—যার ফলে এই সব যন্ত্রাংশ ঠিকমতো কাজ করে।

৭। **এক্সেন্ট্রিসক স্লিপ**—এটি আর্ম এবং সেকটারকে স্টিয়ারিং গীয়ার বক্স থেকে পৃথক রাখে। এবং অর্ধেক অংশ হয় মোটা—বাকী অর্ধেক অংশ হয় পাতলা। এর দ্বারা স্টিয়ারিংকে একজস্ট করা হয়ে থাকে।

থাস্ট বা ইনার ওয়াশার—এটি একটি ওয়াশার। একটি আর্ম ও স্টিয়ারিং শ্যাফ্টের ওজন নিজের দেহে বহন করে ও কাজের সুবিধা করায়।

৯। **বেস প্লেট**—এটি স্টিয়ারিং বক্সের নিচের ছিদ্রকে বন্ধ রেখে দেয়।

১০। **এড্জাস্টিং স্ক্রু**—এটির দ্বারা এন্ড প্লে অর্থাৎ আর্ম ঢিলা থাকলে টাইট করা হয়।

১১। **সাইড প্লে স্ক্রু**—এর দ্বারা সেকটার ঢিলা হলে তাকে টাইট করা হয়ে থাকে।

১২। **ইন্স্প্রেকশান প্লেট**—এটি স্টিয়ারিং বক্সের পাশের ফাঁক বন্ধ রাখে।

কানেকটিং আর্ম ও ট্র্যাক রড—এটির বিষয়ে আগে বলা হয়েছে—স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে সামকের চাকার যোগাযোগ এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটিকে অবশ্য স্টিয়ারিং-এর অংশ বলা যায় না।

স্টিয়ারিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ

স্টিয়ারিংকে সব সময় সুরক্ষিত রাখা উচিত—তার কারণ, এর উপরেই গাড়ি ও ড্রাইভার দুজনারই জীবন নির্ভর করে—এমন কি যাত্রীদের জীবনও।

এর গীয়ার বক্সে সব সময় Cঅয়েল ভর্তি করে রাখা উচিত। সেকটার শ্যাফ্টের নাট সব সময় টাইট করে রাখা উচিত—কারণ চলতি গাড়িতে এটি ঢিলা হয়ে যদি খুলে যায় তবে ড্রাইভার ও গাড়িকে বাঁচাবার কোনও উপায় থাকে না। দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ির স্টিয়ারিং কখনো ঘোরানো উচিত নয়—কারণ এরূপ করলে, এর সারা যন্ত্রাংশ ঢিলে হয়ে যায়। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার খুলে তাতে গ্রীজ অবশ্য দেওয়া উচিত। এরূপ করলে সহসা এর অংশগুলো খারাপ হতে পারে না। উঁচু-নিচু পথে চলার পর প্রত্যেকবার দেখে নিতে হয়—এগুলি ঠিক কাজ করছে কিনা।

স্টিয়ারিং চালনা শিক্ষা

স্টিয়ারিং খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়, এ কথা আগেই বলেছি। এটি

রীতিমতো অভ্যাস সাপেক্ষ। এখন স্টিয়ারিং ও ড্রাইভিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা বলা হচ্ছে—যা শিক্ষার্থীদের অবশ্য জানা উচিত।

১। স্টিয়ারিং খুব হালকা হাতে ব্যবহার করতে হয়—কখনো জোরের সাথে এটি ঘোরাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

২। অবশ্য যদি কখনও পাশ থেকে বা পিছন থেকে কোনও গাড়ি ওভারটেক করতে চায়—অথবা কোন গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে পড়ে তাহলে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরতে হবে। এরূপ না করলে গাড়িকে এ সময় কণ্ট্রোল করা যায় না।

৩। গাড়ি চালাবার সময় হালকা হাতে স্টিয়ারিং ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, সব সময় সামনের দিকে তাকিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে হবে—গাড়ি কোন্‌দিকে কতটুকু ঘোরানো প্রয়োজন, তা দ্রুত স্থির করে সেইভাবে ঘোরাতে বা চালাতে হবে। গাড়ি থামাবার বা চালাবার সময় কখনো স্টিয়ারিং-এর উপরে জোর-জবরদস্তি করতে নেই।

৪। স্টিয়ারিং ধরে চালনা করার সময়, গাড়ি চালাবার সমস্ত নিয়মকানুন মনে রাখতে হবে। সব সময় গাড়িকে রাস্তার বাঁদিকে দিয়ে চালাতে হবে। যদি কোন গাড়িকে ওভারটেক করতে হয়, তখন গীয়ার বদল করে গতি বৃদ্ধি করে, দ্রুত অথচ হালকা হাতে স্টিয়ারিং চালিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

৫। প্রথম শিক্ষার্থীরা যখন স্টিয়ারিং চালাতে শেখে, তখন সব সময় গাড়ির গতি খুব ধীর রাখতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বেশী স্পীডে চালানো অভ্যাস করতে হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে—আঁকাবাঁকা রাস্তায় বা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় জোরে গাড়ি চালালে স্টিয়ারিং যে কোন সময় একটু এদিক-ওদিক বেঁকে অথবা হাত কেঁপে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু রাস্তায় ধীরে গাড়ি চালানো উচিত।

৬। কখনো অযথা স্টিয়ারিংকে এদিক-ওদিক ঘোরানো উচিত নয়। তাহলে এর বুশ বিয়ারিং খারাপ হয়ে যেতে পারে, তা মনে রাখতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে—**স্টিয়ারিং এক ইঞ্চি ঘুরলে সামনের চাকা প্রায় এক ফুট ঘুরে যায়।**

৭। পাহাড়ের রাস্তায় বা ঢালু রাস্তায় যখন উঁচু থেকে গাড়ি নিচে নামবে তখন স্টিয়ারিং বেশ শক্ত হাতে ধরতে হবে ও তার সঙ্গে সঙ্গে স্পীড কম দিয়ে ও

ব্রেককে ঠিক রেখে গাড়ি চালাতে হবে।

৮। রাস্তা সব সময় প্রশস্ত থাকে না। অনেক সময় আর একখানা মাত্র গাড়ি চলতে পারে, এমন রাস্তায় গাড়ি চালাতে হয়। সেই সময় স্টিয়ারিং-এর উপরে ও ব্রেকের উপরে বেশী মনোযোগ দিতে হবে। সামনে অন্য গাড়ি আসতে পারে—অথবা সামনে মানুষ, জন্তু পড়তে পারে। এ সময় সতর্কভাবে স্টিয়ারিং কণ্ট্রোলে রেখে, ঘন ঘন হর্ণ দিতে হবে। স্পীডও খুব কম দিতে হবে।

৯। গাড়ি মোড় ঘোরাবার সময় স্টিয়ারিং-এর উপরে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

গীয়ার বক্স (Gear Box)

চাকায় শক্তি প্রেরণ করার জন্যেই, গীয়ার বক্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গাড়ি যখন প্রথমে ধীরে চলতে অথবা উঁচুতে উঠতে থাকবে, তখন প্রথম গীয়ারটি দেওয়া হয়। আর একটু বেশী বেগে গাড়ি চালাতে গেলে, দ্বিতীয় গীয়ার দেবার প্রয়োজন হয়। খুব বেশী জোরে চালাতে হলে, তৃতীয় গীয়ার প্রয়োজন হয়।

গাড়ি পিছনে সরিয়ে নেবার জন্য বা ব্যাক করার জন্য গীয়ার হুইলের ব্যবস্থা আছে। গীয়ার বক্সের সঙ্গে সব সময় পিছনের চাকার যোগ থাকে। এটি পিছনের চাকায় গতি প্রদান করে। আবার এটি পিছনের চাকাকেই উল্টো-দিকে ঘুরিয়ে গাড়ি ব্যাক করায়।

গীয়ার বক্সের পিছনের প্রান্ত থেকে একটি দণ্ড (shaft) উঠে গেছে যার দ্বারা ড্রাইভার বক্সকে পরিচালনা করে। ওই দণ্ড ও গীয়ার বক্সের মধ্যে বল এ্যাণ্ড সকেট জয়েণ্ট থাকে। তার ফলে গীয়ার দণ্ডটি নানাদিকে ঘুরিয়ে গীয়ার বক্সের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে।

ঐ দণ্ড এবং জয়েণ্ট মিলিয়ে হয় গীয়ার লিভার।

গীয়ার লিভার

আগেই বলা হয়েছে যে, গীয়ারের দণ্ডটি দ্বারা গীয়ার বক্সের সঙ্গে যোগা-যোগ থাকে ও তা বিভিন্নভাবে কাজ করে।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের সিটে বসলেই দেখা যাবে, স্টিয়ারিং-এর ডাইনে বা

বাঁয়ে একটি লোহার রডের সঙ্গে একটি মুঠি বা হাতল লাগানো আছে। এটাকে বলা হয় গীয়ার লিভার।

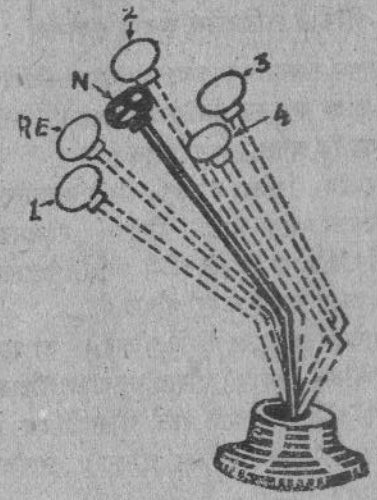

গীয়ার লিভার

N—নিউট্রাল গীয়ার। 1—ফার্স্ট গীয়ার। 2—সেকেণ্ড গীয়ার। 3—থার্ড গীয়ার। 4—ফোর্থ গীয়ার। RE—রিভার্স গীয়ার।

এর দ্বারা চলন্ত গাড়ির গতি কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে ড্রাইভার গাড়িকে থামাতে ও পিছনে চালাতে পারে ওই গীয়ার দ্বারাই। গীয়ার বক্সের পিনিয়ানের সঙ্গে থাকে এর যোগ। গীয়ারের বিভিন্ন অবস্থান দ্বারা গীয়ার কিভাবে বিভিন্ন কাজ করে, তা বোঝানো হলো। যে-সব গাড়ি লেফট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভ অর্থাৎ ড্রাইভার গাড়ি বাঁদিকে বসে চালনা করেন (বিশেষ করে জীপ গাড়ি) ; সে সব গাড়িতে গীয়ার লিভার থাকে স্টিয়ারিং-এর ডানদিকে। আর যে-সব গাড়ি রাইট হ্যাণ্ড ড্রাইভ—তাতে এটি থাকে বাঁদিকে।

যখন যে গীয়ার ব্যবহার করতে বা চেঞ্জ করতে হবে, তখন তা ক্লাচের সাহায্যে করা হয়। আবার কোনও কোনও গাড়িতে স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে গীয়ার

যুক্ত থাকে। এগুলিকে বলা হয়, স্টিয়ারিং গীয়ার সিস্টেম। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

গীয়ার পরিবর্তন করার কৌশল

গাড়ীর গীয়ার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ কোনও গীয়ার দেওয়া হয় না, তখন তাকে বলা হয় নিউট্রাল গীয়ার। নিউট্রাল গীয়ার হলো সেটা—যেটা ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায় রাখা থাকে।

নিউট্রাল অবস্থায় থেকে, বিভিন্ন কারণে গীয়ার নানাদিকে পরিবর্তন করা হয়। গাড়িতে সাধারণতঃ থাকে চারটি গীয়ার। সামনের দিকে চলার সময় তিনটি আর পিছনের দিকে চলার সময় একটি। গাড়ি পিছনের দিকে চলার সময় যে গীয়ার দেওয়া হয়, তাকে বলে রিভার্স গীয়ার।

ডিজেল ইঞ্জিনে সাধারণতঃ থাকে পাঁচটি গীয়ার। তা হলো ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার, ফোর্থ গীয়ার ও ব্যাক গীয়ার। একথা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে, চারটি গীয়ার থাকলে থার্ড গীয়ারটি হয় টপ্ গীয়ার—আর পাঁচটি গীয়ার থাকলে ফোর্থ গীয়ার হয় টপ্ গীয়ার। শেষ গীয়ার হলো ব্যাক গীয়ার বা রিভার্স গীয়ার।

আবার কিছু কিছু গাড়িতে থাকে ছয়টি গীয়ার। তা হলো ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার, ফোর্থ গীয়ার, ব্যাক্ গীয়ার—তা ছাড়া থাকে আর একটি বিশেষ বা স্পেশ্যাল গীয়ার। বেশী ভারবাহী গাড়িকে কন্ট্রোল করতে এতে সুবিধা হয়।

এখানে একটা কথা। গাড়ি চালানো শুরু করার সময়, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে নিউট্রাল গীয়ারটি ঠিক নিউট্রাল অবস্থায় আছে কিনা। তা না হলে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয়। বিভিন্ন গীয়ার চেঞ্জিংও ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা দেখে নিতে হবে।

যখন রিভার্স গীয়ার ব্যবহার করতে হয়, তখন গীয়ারকে প্রথমে ড্যাস বোর্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে, তারপর নিউট্রাল থেকে বাঁদিকে রিভার্স গীয়ার ঠেলতে হবে।

গীয়ার প্রণালী অনুযায়ী এটা হলো রিভার্স গীয়ারের জায়গা। দ্বিতীয়

গীয়ার নিউট্রালের ডানদিকে। টপ্ গীয়ার ড্রাইভারের সিটের দিকে নিউট্রালের আরও ডানদিকে।

ফার্স্ট গীয়ার হলো নিউট্রালের সবচেয়ে বাঁদিকে।

এখানে একটা কথা। যে গীয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হলো, এটা অধিকাংশ গাড়িতে ব্যবহৃত হলেও সব গাড়ির ক্ষেত্রে গীয়ার ব্যবস্থা ঠিক একই রকম নয়, তা মনে রাখতে হবে। অনেক সময় কিছু কিছু গাড়িতে গীয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন থাকে—একই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। যে সব গাড়িতে চারটি গীয়ার, তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখা যায়।

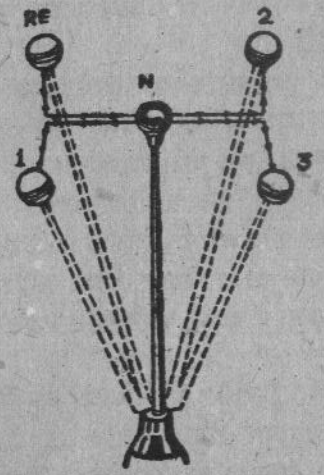

গীয়ার পরিবর্তনের কৌশল

N—নিউট্রাল। 1—ফার্স্ট গীয়ার 2—সেকেণ্ড গীয়ার।
3—থার্ড গীয়ার। RE—রিভার্স গীয়ার।

এই যে সব বিভিন্ন ব্যবস্থা, এগুলো সম্পর্কে আগে না জেনে নিয়ে, গাড়ি চালাতে যাওয়া উচিত নয়। তবে প্রথমে যে-কোনও একটা গাড়ি নিয়ে প্র্যাকটিস করলে, পরে অন্য গাড়ির গীয়ার চেঞ্জও সহজেই বুঝতে পারা যায়। উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ডজ গাড়িতে রিভার্স গীয়ারের স্থান, টপ্ গীয়ারের বা থার্ড গীয়ারের জায়গায়। শেভ্রলেট গাড়িতে রিভার্স গীয়ারের স্থান থাকে সেকেণ্ড গীয়ারের স্থানে। টপ্ গীয়ারের স্থানে।

এইভাবে মার্সিডিস্, শেভ্রলেট, পন্টিয়াক, রোলস্, অস্টিন, ফোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন গাড়ি চালাতে গেলে, তাদের গীয়ার সম্বন্ধে আগে জেনে নিতে হবে। পাঁচটি ও ছ'টি গীয়ারযুক্ত দুই ব্যবস্থাতেই ফোর্থ গীয়ার হলো টপ্ গীয়ার—ছটির বেলায় একটি স্পেশ্যাল গীয়ার থাকে তা বলা হয়েছে।

পাঁচটি ও ছটি গীয়ারের যে অবস্থান বলা হলো, সব গাড়িতে যে ঠিক এই ব্যবস্থা থাকবে তারও কোনও মানে নেই। এদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন থাকতে পারে, তা মনে রাখতে হবে।

যে-সব গাড়িতে গীয়ার পাল্টাতে গেলে একটু ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে—তাদের স্পেশাল গীয়ার রাখা হয়। স্পেশাল গীয়ার ব্যবহার করে গীয়ার চেঞ্জ করলে ইঞ্জিনকে তা ঠেলে দের বলে ধাক্কা লাগে না।

কেন গীয়ার পাল্টাতে হয় ?

এখন দেখা যাক্ এত রকম গীয়ার পাল্টানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন ? গাড়ির চারটি গীয়ারের মধ্যে প্রথম গীয়ারে গাড়ি খুব আস্তে চলে—এত ধীরে চালাবার কোনও মানে হয় না। প্রথম গীয়ার শুধু গাড়ির স্টার্টিং-এর জন্যেই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় গীয়ারে যদিও গাড়ি ধীরে চলে—তবে তার গতি বেড়ে যায়। গাড়ি কাদায় আটকে গেলে বা বেশী বোঝাই করলে এর প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় গীয়ারে গাড়ি বেশীক্ষণ রাখা হয় না। তৃতীয় বা টপ্ গীয়ার দিলে গাড়ি পূর্ণগতিতে চলতে থাকে। যদি আরও গতি বাড়াতে হয়, তা হলে ফোর্থগীয়ার দিতে হয়। যে গাড়িতে তা নেই তাতে থার্ডগীয়ার দিলেই তা টপ্ স্পীড প্রাপ্ত হয়।

মাঠ বা ফাঁকা রাস্তায় চলার সময় ফোর্থ গীয়ার ব্যবহার করা যায়। ভিড়ের রাস্তায় থার্ড গীয়ারের বেশী ব্যবহার করার দরকার নেই।

ইঞ্জিনের ঘোরার বেগ বাড়িয়ে দেয় এই গীয়ার—এই বেগ পিছনের চাকায় সঞ্চালিত হয়ে গাড়ির স্পীড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রথম গীয়ারে ইঞ্জিন যতটা

ঘোরে, ফোর্থ গীয়ারে তা ৫ থেকে ৭ গুণ বেশী ঘোরে তা মনে রাখতে হবে।

যদি চতুর্থ গীয়ারের গতিতে থাকাকালে এ্যাক্সিলারেটার ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে গাড়ির গতি কমে যায়। একে 'গীয়ার ডাউন' বলে। তখন তৃতীয় গীয়ারে গাড়ি চলতে থাকে। তারপর আবার প্রয়োজনমতো চতুর্থ গীয়ারে গাড়ি চালানো হয়।

স্টিয়ারিং গীয়ার সিস্টেম

যেখানে গীয়ার স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে লাগানো থাকে—তাকে বলে স্টিয়ারিং গীয়ার সিস্টেম।

সাধারণতঃ সব গাড়িতে এরূপ থাকে না—খুব কম গাড়িতেই থাকে। গীয়ারের সংখ্যা চার বা পাঁচ। এটি লাগাবার স্থান হলো, যেখানে গীয়ার বক্সের পিনিয়ান কাজ করে, ঠিক সেই জায়গাতে।

স্টিয়ারিং গীয়ারযুক্ত গাড়িকে সামনের দিকে চালাবার জন্যে থাকে তিনটি বা চারটি গীয়ার। এদের বলা হয় ফরোয়ার্ড গীয়ার। গাড়িকে পিছনে চালাবার জন্যে ব্যবহার করা হয় রিভার্স গীয়ার। এসব ব্যবস্থাই স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—সেটা সব গাড়ি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তা হলো, চলন্ত গাড়িতে কখনোই রিভার্স গীয়ার ব্যবহার করতে নেই। যদি ভুলে কখনো তা করা হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য গীয়ারের সঙ্গে যে পিনিয়ান রিভার্স গীয়ারে লাগানো আছে, তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সব সময়ই গাড়িকে আগে দাঁড় করিয়ে, পিছনের অবস্থা দেখে, তারপর রিভার্স গীয়ার দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি ব্যাক করতে হবে।

গীয়ার পাল্টাবার নিয়ম

এবারে গীয়ার কিভাবে পাল্টাতে হয় এবং কোন্ সময়ে কিভাবে তা করতে হয়, বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা ড্রাইভিং শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। গাড়ি স্টার্ট করে প্রথম গীয়ার ব্যবহার করতে হবে। কম করে প্রায় ১০½ মিটার (বা ২৫।৩০ ফুট) চলার পরে দ্বিতীয় গীয়ার ব্যবহার করতে হবে।

তারপর প্রায় ১৬৫ মিটার (বা একশো গজ চলার) পর, এ্যাক্সিলারেটার থেকে পাটি ঢিলা করে, বাঁ পা দিয়ে ক্লাচ্কে চেপে বাঁ হাতে গীয়ার লিভারকে

পিছনে টেনে নিউট্রালে আনতে হবে। তারপর ক্লাচ্ প্যাডেল্ ঢিলা করে, আবার সম্পূর্ণভাবে চেপে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গীয়ার লিভারকে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ দিকে ঠেলে দিয়ে ধীরে ধীরে পিছনে নিয়ে আসতে হবে। এরপর দ্বিতীয় গীয়ার লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় গীয়ার লেগে যাবার পর, ধীরে ধীরে প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে এ্যাক্-সিলারেটারে চাপ দিতে হবে। তারপর জানতে হবে তৃতীয় ও চতুর্থ গীয়ার লাগাবার নিয়ম-কানুন।

তৃতীয় গীয়ার

গাড়ি যখন ২০ কিলোমিটার (বা ১২ মাইল) স্পীডে চলতে থাকে তখন ক্লাচ্ প্যাডেলে চাপ দিয়ে গীয়ার নিউট্রাল করতে হবে। এক সেকেণ্ডের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে ক্লাচ্ প্যাডেল—তারপর তাতে চাপ দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে গীয়ারকে নিজের দিকে টেনে আনতে হবে। তারপর সেটি তৃতীয় গীয়ারের দিকে ঠেলে দিয়ে ঐ গীয়ার লাগাতে হবে।

গীয়ার যখন লেগে যাবে, তখন ক্লাচ্ প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিতে হবে এ্যাক্সিলারেটারে। তখন গাড়ি জোরে চলতে থাকবে।

চতুর্থ গীয়ার

সব গাড়িতে চতুর্থ গীয়ার থাকে না। ওসব গাড়িতে তৃতীয় গীয়ারেই টপ্ স্পীড্ হয়। তবে ডিজেল ব্যবহারকারী প্রায় সব গাড়িতেই থাকে চতুর্থ গীয়ার। অনেক সময় অন্য গাড়িতেও এটি থাকে।

গাড়ি যখন ২৪ কিলোমিটার (বা ১৫ মাইল) স্পীডে চলতে থাকে তখন আগের নিয়ম অনুযায়ী গীয়ারকে নিউট্রাল করে, ঠিক আগের মতো ক্লাচ্ প্যাডেলকে ছেড়ে দিয়ে আবার চাপ দিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে চতুর্থ গীয়ারকে লাগিয়ে দিতে হবে। গীয়ারটি ঠিকমতো লেগে গেলে ক্লাচ্ প্যাডেল ছেড়ে চাপ দিতে হবে এ্যাক্সিলারেটারে। এইভাবে গাড়ি চতুর্থ গীয়ারে পূর্ণ গতিতে চলতে থাকবে। চতুর্থ গীয়ার ব্যবহার করে এ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিলে গাড়িটা খুব জোরে চলতে থাকবে।

এখানে একথা কথা। যাঁরা নতুন গাড়ি চালানো শিখবেন, তাঁদের কখনো

২৪।৩২ কিলোমিটারের (১৫।২০ মাইলের) বেশী স্পীডে চালানো উচিত হয়।

গীয়ার ডাউন করার নিয়ম

অনেক সময় গাড়ি পূর্ণগতিতে চালাতে চালাতে হঠাৎ গতি কিছু কমাতে হয়। গাড়ি বন্ধ না করে স্পীড কমানোই এখানে প্রধান লক্ষ্য। কিভাবে তা করতে হয়, তা জানতে হবে।

চলন্ত গাড়ির গীয়ার ডাউন করে স্পীড্ কমাতে হলে এ্যাক্সিলারেটার ছেড়ে দিতে হবে এবং চাপ দিতে হবে ক্লাচ্ প্যাডেলে—তা হলে গাড়ির গতি আপনা থেকেই কমে যাবে।

এ্যাক্সিলারেটার ছেড়ে দিলে ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমে যায়। তাই আপনা থেকেই গীয়ারের যে গতিক্ষমতা, তাও কমে যায়।

তাই এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, গীয়ার ছাড়া গাড়ির ক্ষমতা নির্ধারিত একটি প্রধান বস্তু হলো এ্যাক্সিলারেটার।

গাড়ি চালনা শিখতে হলে, এগুলি নিয়মিত প্রাক্টিস করতে হবে—তা না হলে দ্রুত এগুলি করা যায় না।

গাড়ির প্যাডেল

ড্রাইভার সিটে বসলে দেখা যায় যে সামনে স্টিয়ারিং রডের নিচে পায়ের কাছে তিনটি খুঁটির মতো চাপ দেবার জন্য পাদানি বা পা দেবার জায়গা থাকে। এদের বলা হয় প্যাডেল।

এই সব প্যাডেলগুলির কাজ বিভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকের বিভিন্ন নাম আছে। এগুলি জানা একান্ত কর্তব্য—কারণ এদের সম্বন্ধে না জানতে পারলে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়।

প্যাডেল তিন রকম হয়। তা হলো :

১। ক্লাচ প্যাডেল (Clutch Padel)

২। এ্যাক্সিলেটার প্যাডেল (Accelerator Padel)

৩। ফুট্ব্রেক প্যাডেল সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে

ক্লাচ্ প্যাডেল

ড্রাইভারের পায়ের নিচে যে তিনটি প্যাডেল থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে বাঁ—

দিকের প্যাডেলটিকে বলা হয় ক্লাচ্ প্যাডল। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার সময় এটির দরকার হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে গীয়ার বদলানো বা গীয়ার ডাউন করার কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়।

ইঞ্জিন স্টার্ট করার সময় বাঁ পা দিয়ে এতে চাপ দিতে হয়। তারপর গীয়ারটি লাগিয়ে দিতে হয়।

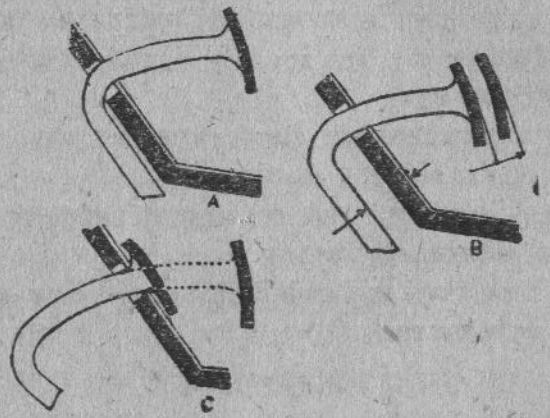

ক্লাচ্ প্যাডেল

A—সম্পূর্ণ চাপ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। B—চাপ দেওয়া হচ্ছে।
C—সম্পূর্ণ চাপ দেওয়া হয়েছে।

ক্লাচ্ প্যাডেলে চাপ দিলে, ইঞ্জিন আর গীয়ার বক্সের কানেকশনটি খুলে যায়—আবার ছেড়ে দিলে তা জুড়ে যায়। এইজন্য ইঞ্জিন যখন চালু থাকবে তখন ক্লাচ্ প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে গীয়ার লাগিয়ে দিতে হয়।

গীয়ার পরিবর্তনের সময়ও ক্লাচ্ প্যাডেলে চাপ দিয়ে গীয়ার চেঞ্জ করে নিতে হয়। ক্লাচ্ প্যাডেল স্বাভাবিক অবস্থায় কেমন থাকে এবং চাপ দিলে কি কি অবস্থা হয়, তা ছবিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ইঞ্জিন ও গীয়ার বক্সের সম্পর্ক থাকে। চাপ দিলে রডটি ভেতরে ঢুকে যায় ও তার ফলে কানেকশনটি খুলে যায়।

এ্যাক্সিলারেটার প্যাডেল

এই প্যাডেলটি হলো সবচেয়ে ছোট প্যাডেল। এটি থাকে ডানদিকে। এটিই হলো মূল এ্যাক্সিলারেটারের কাজ করার ক্ষমতাযুক্ত অর্থাৎ গাড়ির গতি বৃদ্ধি করার ক্ষমতাযুক্ত অংশ।

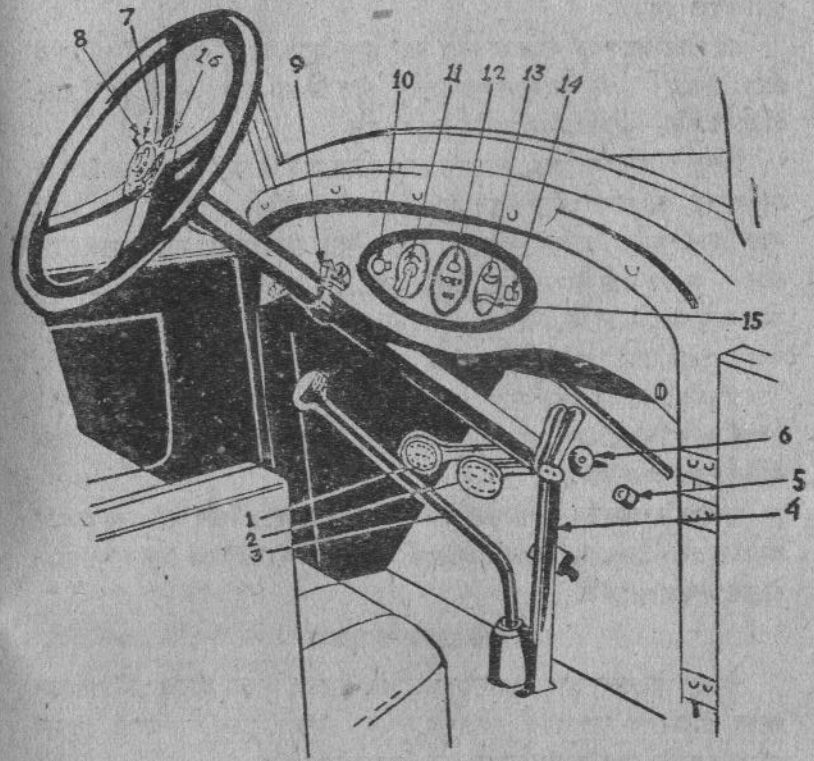

ড্যাস বোর্ড, বিভিন্ন সুইচ ও প্যাডেল

1—ক্লাচ্ প্যাডেল। 2—ফুট ব্রেক লিভার। 3—হ্যান্ড গীয়ার লিভার। 4—হ্যান্ড ব্রেক লিভার। 5—স্টার্টার সুইচ। 6—এ্যাক্সিলারেটার। 7—হর্ণ। —থ্রটল। 4—ইগ্নিশন সুইচ। 10—ওয়াইপার কন্ট্রোল। 11—লাইট

সুইচ্। 12—মাইলো মিটার। 13—এম্পয়ার মিটার। 14—চোক্ লিভার। 15—অয়েল প্রেসার গেজ। 16—স্পার্ক প্লাগ।

এর সম্পর্ক থাকে গাড়ির কার্বোরেটারের সঙ্গে। যখন ইঞ্জিনকে চালু করা হয় বা যখন গাড়িকে বেশী স্পীডে চালানো প্রয়োজন হয়, তখন এই প্যাডেলে চাপ দিতে হয়।

এই প্যাডেলকে সব সময় ডান পা দিয়ে চাপ দিতে হয়। কারণ বাঁ পা থাকে ক্লাচের উপরে। এই প্যাডেলে যত জোরে চাপ দেওয়া হবে, ততই বেড়ে যাবে ইঞ্জিনের শক্তি—ফলে গাড়ির স্পীড যাবে বেড়ে।

কিন্তু গীয়ার লাগিয়ে, ক্লাচ্ প্যাডেল ছেড়ে যদি এ্যাক্সিলারেটারে চাপ না দেওয়া হয়, তা হলে গাড়ি চলবে না—ঝাঁকি খেয়ে ইঞ্জিন বন্ধ যাবে বন্ধ হয়ে। ক্লাচ্ ছাড়া মানে, গাড়ির কাজ শুরু করা—আর চাপ দেওয়া মানে, কাজ বন্ধ করা। আবার তার উল্টো হলো এ্যাক্সিলারেটার। এটি ছাড়া মানে, ইঞ্জিনের কাজ বন্ধ করা বা কমিয়ে দেওয়া, আর চাপ দেওয়া মানে, ইঞ্জিনের গতি বৃদ্ধি করা। তাই ক্লাচ্ ও এ্যাক্সিলারেটার উল্টোমুখী কাজ করে থাকে।

গীয়ার লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সমস্ত ভার পড়ে যায় ইঞ্জিনের উপর। কিন্তু এ্যাক্সিলারেটার ছেড়ে দিলে ইঞ্জিনের কাজ বন্ধ হয়। তবে চাপ দিলে ইঞ্জিন পূর্ণ কাজ করে।

তাই গীয়ার ডাউন করার সময় এ্যাকসিলারেটার ছেড়ে দিয়ে ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমানো হয়। কার্বোরেটারের ভেতরের থ্রটল্ ভাল্বের সঙ্গে এ্যাক্সিলারেটারের সম্বন্ধ থাকে।

ফুট ব্রেক প্যাডেল

ক্লাচ্ প্যাডেল আর এ্যাক্সিলারেটার প্যাডেল ছাড়া, আরও ১টি প্যাডেল আছে প্যাডেলের জায়গায়। তাকে বলে ফুট ব্রেক প্যাডেল। অবশ্য যে সব গাড়িতে হ্যান্ড ব্রেক থাকে, তাতে এটা দরকার হয় না।

ফুট্ ব্রেক প্যাডেল, ক্লাচ্ প্যাডেলের চেয়ে আরও একটু উঁচুতে থাকে। এটি হঠাৎ গাড়ি থামাবার জন্য প্রয়োজন হয়। এই প্যাডেলেও ডান পা দিয়ে চাপ দিতে হয়।

গাড়ি যখনই দ্রুত থামানো দরকার তখন পা তুলে নিতে হবে এ্যাক্সিলারেটার

থেকে। তাতে ইঞ্জিনের ক্ষমতা যাবে কমে। সঙ্গে সঙ্গে ফুট ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিলেই গাড়ি যাবে বন্ধ হয়ে।

ফুট্ ব্রেকে যত তাড়াতাড়ি চাপ দেওয়া যাবে, তত সত্বর গাড়ির স্পীড্ বন্ধ হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে চাপ দিলে, গাড়ি ধীরে ধীরে বন্ধ হবে। মাস্টার সিলিণ্ডারের দ্বারা গাড়ির চাকার সঙ্গে থাকে ফুট্ ব্রেকের যোগাযোগ।

ব্রেক কষলেই যে গাড়ি সব সময় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে, তার মানে নেই। স্পীডে চলার সময় গতির একটা Momentum বা চলমানতা থাকে। তাই ব্রেক কষলেও গাড়ি কয়েক হাত গিয়ে, তারপর বন্ধ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রেক ও তার কাজ

ব্রেককে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো ধীরে ধীরে থামানো—আর একটি হলো স্পেশাল ব্রেক বা আচম্কা থামানো।

ব্রেক সম্বন্ধে ভাল না জানলে, যে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক—তার কারণ, ব্রেক হলো দুর্ঘটনা এড়াবার বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র।

ব্রেকের প্রকারভেদ

যে-কোন ধরনের গাড়ি হোক না কেন, ব্রেক সাধারণতঃ দু'ধরনের হয়ে থাকে। তা হলো—

১। সার্ভিস ব্রেক বা ফুট ব্রেক।

২। হ্যান্ড ব্রেক লিভার।

এই দুই ধরনের ব্রেকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই দুটির বিষয়েই বর্ণনা করা হচ্ছে। এ ব্রেক আবার নানা কৌশলে তৈরি হয়—তা পরে বলা হচ্ছে।

সার্ভিস ব্রেক বা ফুট ব্রেক

সার্ভিস ব্রেক, প্যাডেলের সঙ্গে মাস্টার সিলিণ্ডার দ্বারা কাজ করে। দুই পায়ের মধ্যে, ডান পা রাখতে হবে ক্লাচ্ প্যাডেলে—ছেড়ে দিতে হবে এ্যাক্-

সিলেটার প্যাডেল। বাঁ পা দিয়ে চাপ দিতে হবে ব্রেক প্যাডেলে। এ্যাক-সিলারেটার ছেড়ে দেওয়া আর ক্লাচে চাপ দেওয়ার মানেই গাড়ির গতি বন্ধের প্রচেষ্টা। এতে ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফুট ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিলে গাড়ি বন্ধ হবে। অবশ্য গীয়ার নিউট্রাল করাও উচিত।

যদি কখনও গাড়িতে গীয়ার নিউট্রাল না করে, ক্লাচ না চেপে শুধু ব্রেক চেপে দেওয়া হয়, তা হলে গাড়ি থেমে যাবে বটে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গতিও বন্ধ হয়ে যাবে। ইঞ্জিনের সম্বন্ধ থাকে ড্রাইভিং শাফ্‌টের সঙ্গে। তাই শ্যাফ্‌ট্‌ বন্ধ হয়ে গেলে ইঞ্জিনও বন্ধ হয়।

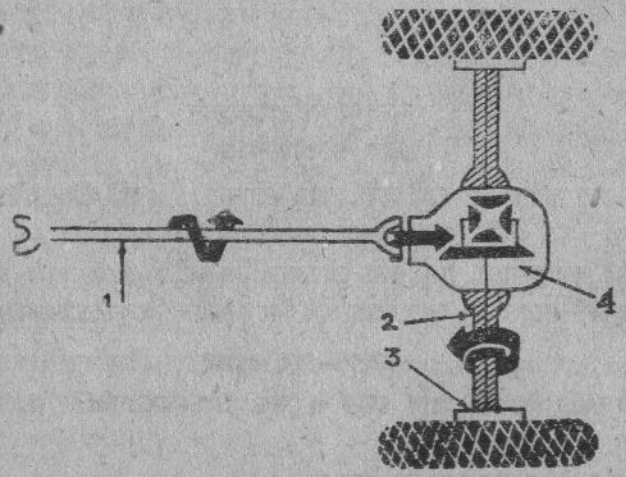

ব্রেক সিসটেম্‌

1—ড্রাইভিং শ্যাফ্‌ট্‌। 2—রিয়ার এক্সিল।
3—ব্রেক ড্রাম। 4—ডিফারেন্সিয়্যাল।

এই কারণে অযথা ফুট ব্রেক ব্যবহার করতে নেই। গীয়ার নিউট্রাল করে, ক্লাচ চেপে, এ্যাক্‌সিলারেটার ছেড়ে দিলেই গাড়ি ধীরে-ধীরে থেমে যাবে।

হঠাৎ গাড়ি বন্ধ করতে হলে, সব সময় এ্যাক্‌সিলারেটার ছেড়ে ক্লাচ্‌ ও

ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিতে হবে। তা হলেই ইঞ্জিন বন্ধ হবে না—কিন্তু গাড়ি থেমে যাবে। তাই ফুট ব্রেক কিভাবে ব্যবহার করা ভাল, তা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

সাধারণতঃ ব্রেক কখন ব্যবহার করতে হবে, তা এবার দেখা যাক। রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি চলছে। এমন সময় যদি সামনে কোনও মানুষ বা জন্তু বা গাড়ি এসে পড়ে তাহলেই ফুট ব্রেক ব্যবহার করতে হবে।

তবে একটা কথা। হঠাৎ খুব জোরে ব্রেক কষলে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যাবে একথা ঠিক—কিন্তু এই জোরে ঝাঁকুনির জন্য গাড়ির যারা আরোহী, তাদের আঘাত লাগতে পারে। সেই কারণে সব সময় চেষ্টা করতে হবে, যাতে ব্রেক ধীরে ধীরে ব্যবহার করা হয়।

এই জন্যে এ্যাক্‌সিলারেটার থেকে পা তুলে নিয়ে, ক্লাচ্‌ চেপে ব্রেকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে হয়। আচম্‌কা খুব জোরে ব্রেক কষলে, গাড়ি উল্টে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফুট ব্রেকের কাজ হলো, পিছনের চাকাকে চেপে ধরা, যাতে তা না ঘোরে এবং গতি বন্ধ হয়। ক্লাচের কাজ হলো, ইঞ্জিনকে ঠিক চালু রেখেও তার ক্ষমতা বন্ধ করা। তাই ইঞ্জিনকে ক্ষমতা প্রদান বন্ধ করে, আস্তে আস্তে ব্রেক কষে পিছনের চাকা বন্ধ করাই উচিত।

অবশ্য একটা কথা। যদি কাউকে আকস্মিক বাঁচানো দরকার হয় বা আকস্মিক দুর্ঘটনা এড়াতে হয়, তা হলে আচম্‌কা জোরে ফুট ব্রেকে চাপ না দিয়ে উপায় থাকে না—যদিও এটা বে-আইনি। ব্রেক করার সময় শক্ত করে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে থাকতে হবে—যেন গাড়ি ঘুরে না যায়।

সব সময় ব্রেক ব্যবহার করার জন্যে একটু আগে থেকেই সতর্ক থাকা ভাল। রাস্তার দিকে ভাল করে নজর রাখা কর্তব্য। তাই অন্ততঃ ২৫০ মিটার বা এক ফার্লং দূর থেকে ব্রেক কষার জন্যে তৈরি হওয়া উচিত—তাহলে আস্তে আস্তে গাড়ি থামানো সম্ভব হয়।

ব্রেক আস্তে আস্তে কষতে গেলে কি করতে হয়, তা জানা উচিত। ক্লাচে চাপ দিয়ে ফুট ব্রেকে একবার চাপ দিয়েই পা তুলে নিতে হবে। তারপর আবার চাপ দিয়ে তুলে নিতে হবে। তৃতীয়বারে পুরোপুরি চাপ দিতে হবে। তাহলে গাড়ি একেবারে থেমে যাবে—অথচ তার ইঞ্জিন চালু থাকবে। এটাই হলো

ব্রেক দেবার সবচেয়ে আদর্শ পদ্ধতি।

ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা অনুযায়ী গাড়ির চলার গতিও ঠিক রাখতে হবে। পথ পরিস্কার না থাকলে, বেশী গতিতে কখনো গাড়ি চালোনো উচিত নয়। যারা তা করে না, তারা দুর্ঘটনা ডেকে আনে।

ব্রেকের আরও প্রকারভেদ

ব্রেক সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে। তা হলো ঃ

১। মেকানিক্যাল ব্রেক (Mechanical Brake)
২। ভ্যাকুয়াম ব্রেক (Vaccum Brake)
৩। হাইড্রলিক ব্রেক (Hydraulic Brake)

মেকানিক্যাল ব্রেক

এই ধরনের ব্রেক প্রধানতঃ যান্ত্রিক উপায়ে কাজ করে থাকে। গাড়ির হ্যান্ড ব্রেকগুলি সাধারণতঃ এই ধরনের হয়। আগেকার দিনে ফুট ব্রেকও এই ধরনের হতো।

ভ্যাকুয়াম ব্রেক

সাধারণতঃ বড় গাড়িতে এই ভ্যাকুয়াম্ ব্রেক ব্যবহৃত হয়। ভ্যাকুয়াম ব্রেক প্রধানতঃ ফুট ব্রেক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভ্যাকুয়াম বা বাতাসহীন অবস্থা সৃষ্টি করে এই ভ্যাকুয়াম ব্রেক কাজ করে থাকে।

এই ব্রেকের পৃথক যে প্যাডেল থাকে, তাকে চাপ দিলে ভ্যাকুয়াম রিজার্ভার কাজ করে—সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের পাইপের মধ্যে ভ্যাকুয়াম অবস্থা সৃষ্টি হবার জন্যে, তার কাজ যায় বন্ধ হয়ে।

ইঞ্জিন বন্ধ হলেই সঙ্গে সঙ্গে সিলিন্ডার ও পিস্টনগুলির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ক্রাঙ্ক শ্যাফ্ট্ আর ঘোরে না। গাড়ি যায় বন্ধ হয়ে। ভ্যাকুয়াম ব্রেক ইচ্ছামতো দ্রুত বা ধীরে ধীরে কাজ করানো যায়।

হাইড্রলিক ব্রেক

আজকাল অধিকাংশ গাড়িতেই এই ধরনের ফুট ব্রেক ব্যবহৃত হয়। এতে থাকে একটি ব্রেক ড্রাম। এই ড্রাম, ঠিক সময়মতো তার সঙ্গে যুক্ত রডের উপর কাজ করে। তার ফলে যে চাপ আপনা থেকেই পড়ে, তাতে ব্রেকের কাজ

ঠিকমতো সম্পন্ন হয়। ছোট দেশী সব মোটর গাড়িতেই আজকাল এই ধরনের ব্রেক ফিট করা থাকে।

হ্যাণ্ড ব্রেক লিভার (Hand Brake Lever)

গীয়ার লিভারের পর আরও একটি লিভার থাকে—তাকে বলা হয় হ্যান্ড ব্রেক লিভার। একে এমারজেন্সী ব্রেকও বলা হয়ে থাকে।

এই ব্রেক ঠিক কখন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়? যখন গাড়ি উঁচু-নীচু রাস্তা নিয়ে যায় বা পার্বত্য পথ দিয়ে চলে—অথবা যখন হঠাৎ কোনও বিশেষ কারণে তার গতি আচমকা কমাতে হয়।

হ্যান্ড ব্রেক ধরে টান দিলেই গাড়ির সমস্ত পিনিয়ানগুলো জুড়ে যায়। ফলে গাড়ি এমন ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যেন মনে হয় হঠাৎ গাড়ির গতিকে কেউ তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দিল। গাড়ি যখন চলতে থাকবে, তখন হ্যান্ড ব্রেক খুলে রাখতে হবে। আর সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কোনও রকমেই যেন ব্রেকের পিনিয়ানগুলির দাঁত বেশী জুড়ে না থাকে। যদি তা হয়, তাহলে গাড়ি ঠিকমতো স্পীডে চলবে না। তা ছাড়া এতে গাড়ির পেট্রল খরচও অনেক বেশী হয়ে থাকে।

যখন উঁচু-নীচু জায়গা দিয়ে গাড়ি চলে, তখন সব সময় ব্রেকের কথা মনে রাখতে হবে। উঁচু থেকে যখন নীচুতে গাড়ি নামে তখন সব গীয়ার ডাউন করে দিতে হয়। তাহলেই গাড়ি আপন গতি থেকেও একটু বেশী জোরে চলবে। যদি এতেও কাজ না হয়, তাহলে ব্রেক ব্যবহার করা কর্তব্য। যদি নীচে নামার রাস্তা অনেকটা দূর হয়, তাহলে ফুট ব্রেক ব্যবহার না করে, হ্যান্ড ব্রেক ব্যবহার করাই উচিত—তার কারণ হলো, দীর্ঘক্ষণ ফুট ব্রেক ব্যবহার করলে ব্রেক ড্রাম গরম হয়ে যায়।

সব সময় মনে রাখতে হবে যে ব্রেক ব্যবহার করার কৌশল গাড়িকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচবার একমাত্র প্রধান বিষয়—অথচ এর ব্যবহার যথাসম্ভব কম করাই উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ

মোটরগাড়ির টায়ার ও টিউব

মোটর গাড়ির চাকা এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে এটি অতিরিক্ত শক্ত না হয়ে এবং প্রয়োজনমতো সংকোচন ও প্রসারণশীল হয়। তাই গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বা রিক্সার চাকা থেকে এটি ভিন্নভাবে তৈরি। চাকার মধ্যে বাতাস ভরিয়ে তা ফোলান থাকে—প্রয়োজনমতো চাপ এটি সহ্য করতে পারে।

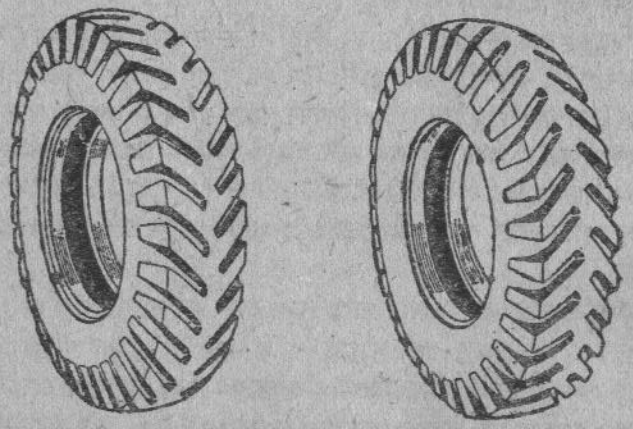

মোটর গাড়ির টায়ার

মোটর গাড়ির চাকাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো :—১। টায়ার, ২। টিউব, ৩। রিম্।

টায়ার

টায়ার হলো চাকার সবচেয়ে বাইরের আবরণ। এটি হলো একটি শক্ত রবারের খোল—যার ভিতরটা ফাঁপা। এই ফাঁপা অংশের মধ্যেই টিউব লাগানো থাকে। এর গায়ে দুটি দিকে খাঁজ কাটা থাকে।

ঐ খাঁজ কাটা থাকার কারণ হলো, গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ গতি কমালে বা ব্রেক কষলে চাকার দাঁতগুলি রাস্তার সঙ্গে যে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, তাতে চট্ করে গাড়ির গতি কমতে বা গাড়ি দাড়াতে পারে। তা ছাড়া যদি রাস্তা পিচ্ছিল হয়, তা হলেও ঐ দাঁতগুলির জন্যে চাকা টিকমতো ব্রেক কষতে পারে।

টিউব

টিউব পাতলা বা নরম রবার দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এই টিউবও থাকে ফাঁপা। এর সঙ্গে পিতলের তৈরি একটা নল লাগানো থাকে। ঐ

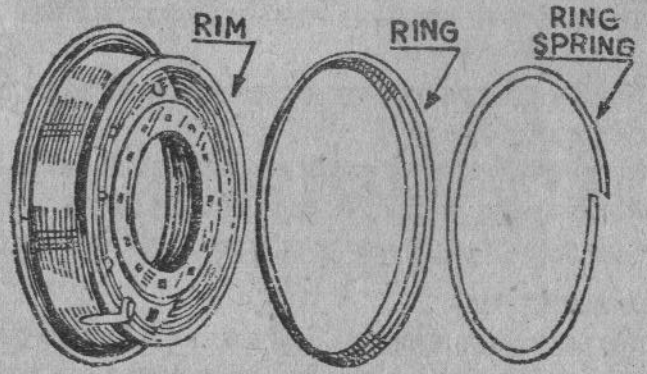

রিম্ রিং ও রিং স্প্রীং

নলকে বলে ভাল্ভ বডি। এর সঙ্গে ভিতরের দিকে একটি ভাল্ব লাগানো থাকে। এই ভাল্ভটি থাকার কারণ কি? এর কারণ হলো এর মধ্যে হাওয়াটা পাম্প করলে, শুধু ভিতরেই যাবে, কিন্তু কোনও হাওয়া বাইরে বের হতে পারবে না।

অবশ্য এর সঙ্গে একটি পৃথক স্ক্রুর মতো জিনিস লাগানো থাকে। এটি টাইট রাখা হয়। এটি খুলে দিলে হাওয়া বেরিয়ে যায়।

রিম্

লোহার গোল চাকার মতো করে এটি বানানো হয়। এটি ঠিক এমনভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে যে, এর সঙ্গে টায়ার সহজে ফিট্ করা যায়, রিমের ভিতরেও ভাল্ভ লাগানো থাকে। এর মাঝখানটা নীচু ও দু'পাশ থাকে উঁচু।

এই রিমের সঙ্গে থাকে রিং—যা টায়ারকে ধরে রাখতে সাহায্যে করে। তা ছাড়া রিং-স্প্রীং চাকাকে স্প্রীং করার কাজে সাহায্য করে।

টায়ার ও টিউব লাগাবার নিয়ম

রিমে নতুন টায়ার লাগাবার সময়ে প্রথমে ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে যে রিমের মধ্যে ভাল্‌বের ছিদ্র ঠিকমতো আছে কিনা। ঐ ছিদ্রের বরাবর টায়ার লাগাতে হয়। এর কারণ হলো, এভাবে লাগালে টায়ার বা রিম্‌ সরে যায় না। রিমের ভাল্‌বের বরাবর মোটা কাঠ বা পাইপের সাহায্যে টায়ার লাগানো হয়। তারপর টায়ারের একটা অংশ রিমের উপরে চড়িয়ে, তার মধ্যে টিউবটি ভরতে হয়।

টিউব, টায়ারের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেলে, টায়ারের উপর অংশের দুটি ধার রিমের উপরে চড়িয়ে দিতে হয়।

টায়ারের প্রথম অংশ চড়ানো অনেকটা সহজ। কিন্তু টিউব লাগিয়ে দ্বিতীয় অংশ ঠিকমতো চড়াতে একটু অসুবিধা হয়। এই কারণে অনেক সময় কাঠ দিয়ে ঠুকে চড়াতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, টায়ার মুড়ে যাওয়ার জন্য কোন অংশ যেন চেপে না যায়।

টিউব টায়ারের মধ্যে ভরবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ভাল্‌ভের মুখ ঠিকমতো ফিট্‌ হয়। টায়ার, টিউব ও রিম্‌ একসঙ্গে লাগানো হলে, তাকে বলে একঠা পরিপূর্ণ গাড়ির চাকা। চাকা তৈরি হয়ে গেলে হ্যাণ্ড পাম্প বা ফুট পাম্প দিয়ে চাকায় হাওয়া ভরতে হয়। এ পাম্পের নল ভাল্‌ব বডিতে লাগিয়ে হাওয়া ভরতে হয়। এই হাওয়া ভর্তি হয় টিউবে। টিউবের চাপে টায়ারটি ফুলে ওঠে ও তাতে চাপ পড়ে। টায়ায় যে মাপের হবে হাওয়াও ততটা ভরতে হবে।

আজকাল পেট্রল পাম্পিং স্টেশনে চাকায় হাওয়া ভরা হয়। এই সব পাম্পে কতটা হাওয়া ভরা হবে, তা জানার জন্যে মাপবার যন্ত্র থাকে। তাকে বলে 'প্রেসার গেজ'। যদি টায়ার খুব পুরানো থাকে তা হলে হাওয়া কম ভরতে হয়। বেশী হাওয়া ভরলে টায়ার ফেটে যেতে পারে।

চাকাতে হাওয়া ভরে নিয়ে, প্রথমে গাড়ি একটু এদিক-ওদিকে চালিয়ে দেখে নিতে হয়, ঠিক আছে কিনা। চাকার কোনরূপ দোষ থাকলে, তা এতে ধরা যায়। যদি চাকা গাড়ির সঙ্গে লাগানো থাকে এবং সেই অবস্থায় টায়ার বা টিউব

লাগানো প্রয়োজন হয়, তা হলে গাড়িকে একটু উঁচু করে টায়ার তুলে লাগানো হয়।

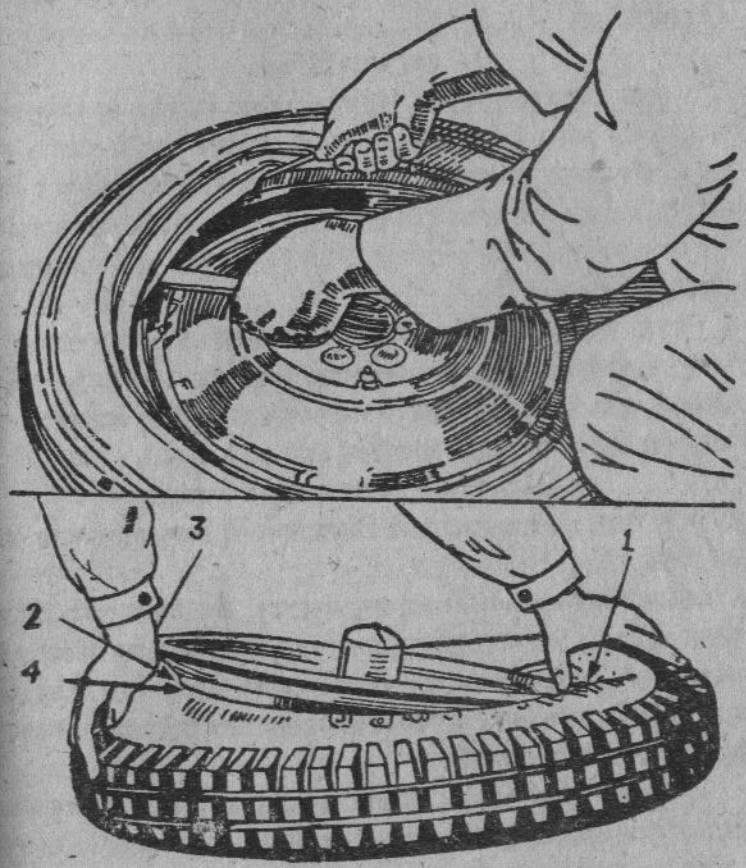

রিমে টায়ার পরানো

1—টায়ার। 2—রিম্‌। 3—রিং। 4—রিং স্প্রীং

ভাল্‌ভের সাহায্যে হাওয়া ভর্তি করার পর ভাল করে স্ক্রু এঁটে দিতে হয়—তা হলে চাকা থেকে হাওয়া লিক্‌ করতে পারে না।

আর একটা কথা। সব সময়, রবারের জিনিসের গ্রীজ বা তেল খুবই প্রয়োজন। তবে টায়ারের সঙ্গে রিমের জংশনে এটি দিলে টিউবে যেন না লাগে, তা দেখা উচিত।

ভল্‌ক্যানাইজিং

রবারের যে-কোনও জিনিস কিছুদিন ব্যবহার করলেই, তা খারাপ হতে বাধ্য। যদি রবারের জিনিস একেবারে নষ্ট না হয়, তবে সময় তা মেরামত করা যায়। যদি কোনও অংশ কেটে যায় বা ফেটে যায়, এ হলে তার উপরে কাঁচা রবার লাগিয়ে খুব গরম হাওয়া বা উত্তাপ দিলে ঐ কাঁচা রবারটি গলে যায় এবং তার ফলে ঐ অংশটি জোড়া লেগে যায়। এই জোড়া দেবার পদ্ধতিকে বলা হয় ভল্‌ক্যানাইজিং।

বাজারে এই কাজের জন্য যে কাঁচা রবার পাওয়া যায়, তা কি টেক্‌সই? সম্পূর্ণ টেক্‌সই না হলেও, এতে খুব ভাল কাজই হয়। তার কারণ হলো, যদিও এই রবার টানলে বেড়ে যায় ও তাপে গলে যায়—কিন্তু গলে যাবার পর আবার শক্ত হলে তা বেশ ভালই কাজ দিয়ে থাকে।

টিউবের লিক মেরামত করার নিয়ম

টিউব মেরামত করতে হলে, আগে টিউবের কোথায় কোথায় ছিদ্র আছে, তা বের করতে হবে।

এটি খুব সহজ কাজ নয়। এইজন্যে সবচেয়ে ভাল নিয়ম হলো, টিউবে বাতাস পুরে তা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া। যেখানে যেখানে ছিদ্র আছে, সেই সব স্থান দিয়ে বুদ্‌বুদের বের হতে থাকে। যে সব জায়গা দিয়ে বুদবুদের হচ্ছে, সেইগুলি হলো ছিদ্র। যেখানে যেখানে ছিদ্র আছে সেই সব জায়গায় চক্‌ দিয়ে দাগ কেটে দিতে হবে।

তারপর টিউবটি তুলে যে সব জায়গায় চক্‌ লাগানো আছে, সেখানে কাঁচা রবারের সঙ্গে একটু রবার সলিউশন দিয়ে তা লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর সামান্য একটু তাপ দিলে, এই কাঁচা রবার ভালভাবে ছিদ্র বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো, কখনো উত্তাপ যেন খুব বেশী না হয়। খুব বেশী তাপ দিলে টিউব গলে যাওয়ার সম্ভব। রবার সলিউশন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তা না পাওয়া গেলে রবার গলাবার

লিকুইড্‌ (এটিও কিনতে পাওয়া যায়), তাতে কিছু রবার ফেলে দিলে গলিয়ে সলিউশন করা হয়। এই সলিউশন হলো এক ধরনের চট্চটে পদার্থ। যদি কেনা হয়, তাহলে এটা টিউবের মধ্যে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ
পেট্রল বা ফুয়েল সিস্‌টেম

এর আগেই বলা হয়েছে যে, ইন্টারন্যাল কম্বাসশন ইঞ্জিনে যে ইন্ধন ব্যবহার করা হয়, তা হলো প্রধানতঃ পেট্রোল বা ডিজেল।

এই পেট্রল জমা থাকে পেট্রল ট্যাঙ্কে। এই ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল ধীরে ধীরে নেমে আসে ও তা প্রয়োজনমতো বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কিভাবে এটা আসে ও কিভাবে তা ফোঁটা ফোঁটা এসে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে উপস্থিত হয়, সেটিও জানা প্রয়োজন।

পেট্রল সোজাসুজি কার্বোরেটারে আসার আগে একটা ছাঁকনি পার হয়ে আসে। তারপর তা এ. সি. পাম্পের মধ্য দিয়ে যায় গ্যাস কার্বোরেটারে। সেখানে অয়েল চেম্বারে তা কিছু কিছু জমা হয় ও ফোঁটা ফোঁটা যায় মিকশিং চেম্বারে। এই মিক্‌শিং চেম্বারে হলো, পেট্রলের সঙ্গে বায়ুর মিশ্রণের স্থান। এখানে থেকেই ইন্ধন গ্যাস যায় ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে। সিলিণ্ডারের মধ্যে চারটি স্ট্রোকের মাধ্যমে পরপর কম্প্রেস্‌শন আর এক্‌জস্‌শন হয়। তার ফলে, পিস্টন একবার এগোয় একবার পিছোয়। তার এই সরল গতিটা, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌টের মাধ্যমে পরিণত হয় ঘূর্ণায়মান-গতিতে (Circular motion)।

এবারে আমরা পেট্রলের সাপ্লাই ব্যাবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি। পেট্রল প্রথমে জমা করা হয় পেট্রল ট্যাঙ্কে। প্রত্যেক গাড়িতে পেট্রল পাম্প থেকে পরিমিত পেট্রল এই ট্যাঙ্কে নেওয়া হয়।

এই ট্যাঙ্ক থেকে যে যে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এটি গমন করে, তা মোটামুটি সব বলা হচ্ছে। এখানে একটা ছবিতে কিভাবে ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল কার্বোরেটা

অবধি সঞ্চালিত হয়, তা দেখানো হলো।

১। ট্যাঙ্ক—এখানে পেট্রল জমা করা হয়। ওই ট্যাঙ্ক কোনও গাড়ির সামনের দিকে, কোনও গাড়ির পাশের দিকে বা পিছনের দিকে থাকে।

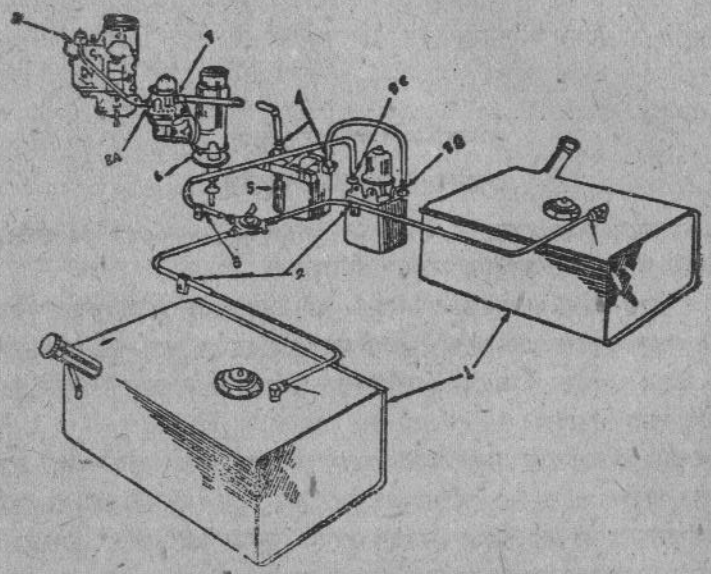

পেট্রল সিস্টেম

1—পেট্রল ট্যাঙ্ক (কোন কোন গাড়িতে দুটো পেট্রল ট্যাঙ্ক দেখা যায়। চিত্রে সেরূপ একটা দেখানো হলো)। 2—পেট্রল পাইপ। 3—জংশন কার্ক (পেট্রল লাইন)। 4—অটো পাম্প। 5—পেট্রল ফিল্টার। 6—এ. সি. পাম্প। 7—কার্বোরেটার। 8 a, b, c—পেট্রল লাইন ইউনিউন (জংশন)।

২। পেট্রল পাইপ—ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল এই পাইপের মধ্যে দিয়ে যায়।

৩। পেট্রল লাইন জংশন—এখানে লাইনগুলি একত্রিত হয়।

৪। অটো পাম্প বা ইলেকট্রিক পাম্প এর দ্বারা পাম্প করে পেট্রল কার্বোরেটারের দিকে পাঠানো হয়।

৫। পেট্রল ফিল্টার—এই অংশে পেট্রলকে ভাল করে ছাঁকা হয়ে থাকে। পেট্রলের ট্যাঙ্কে বা পেট্রলে অনেক সময় ময়লা থাকে। তা জমে গেলে, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি খারাপ হয়ে যায়। তাই এটিকে ছাঁকা প্রয়োজন।

৬। এ. সি. পাম্প—এই পাম্পটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এটি পরবর্তী অবস্থায় (Stage-এ) পেট্রল পাম্প করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

৭। কার্বোরেটার—এটিই হলো পেট্রলকে বাষ্পে পরিণত করার যন্ত্র। এর দুটি প্রধান অংশ—

(ক) ফ্লোটিং চেম্বার বা অয়েল চেম্বার।

(খ) মিক্‌শিং চেম্বার।

৮। পেট্রল পাইপ ইউনিয়ন—এখানে পেট্রল পাইপগুলি একত্রে মিলিত হয়। এই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যেই পেট্রল, ট্যাঙ্ক থেকে এসে শেষ পর্যন্ত তার কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

যতক্ষণ ট্যাঙ্কে পেট্রল থাকে, তা এইভাবে ফোঁটা ফোঁটা এসে কাজ করে। সবসময় ট্যাঙ্কে কিছু তেল অবশিষ্ট থাকতে থাকতেই, তাতে পেট্রল ভর্তি করা উচিত। কখনো ট্যাঙ্ককে নিঃশেষ করতে নেই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
ডিজেল ইঞ্জিন শিক্ষা

এতক্ষণ ধরে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরা পেট্রল ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি ও তার বিভিন্ন অংশের বর্ণনাও করা হয়েছে। তা ছাড়া পেট্রল ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশেরও বর্ণনা করা হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিন এবং পেট্রল ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ির প্রধান প্রধান পার্টসগুলি—যেমন চেসিস, লাইট সিস্টেম, বডি, বনেট ইত্যাদি প্রায় একই রকম সব। তবে পেট্রল ইঞ্জিনে চলে ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার—আর ডিজেল ইঞ্জিনে চলে লরী, ট্রাক, বাস প্রভৃতি ভারী গাড়ি।

কিন্তু পেট্রল চালিত গাড়ি ও ডিজেল চালিত গাড়ির মধ্যে যা পার্থক্য থাকে—তা প্রধানতঃ থাকে তাদের ইঞ্জিনের কিছু পার্থক্যে। অ ছাড়া জ্বালানী কন্তুর পার্থক্য থাকে। ইঞ্জিনের তাপের পার্থক্য একটি প্রধান বিষয়। এবং ডিজেল ইঞ্জিনের স্টার্ট নেবার পার্থক্যও আছে।

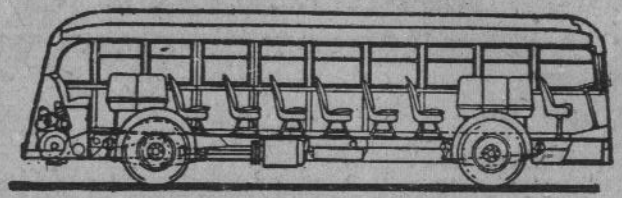

একটি ডিজেল চালিত গাড়ির নক্‌শা

আমরা সবার আগে এই পার্থক্য সম্পর্কে বলব, তারপরে বিভিন্ন পৃথক পার্টসগুলির বর্ণনা করে বোঝাবার চেষ্টা করব।

ডিজেল চালিত গাড়ির ইঞ্জিন হয় বেশী ভারী, তা অনেক বেশী ক্ষমতাযুক্ত হয়। বিশাল আকৃতির গাড়িগুলি এর দ্বারাই চালিত হয়। একটি আধুনিক ডিজেল চালিত গাড়ির ভিতরের নক্‌শা এঁকে দেখানো হচ্ছে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, পেট্রল ইঞ্জিনে সিলিণ্ডার ও পিস্টন কাজ করে পেট্রল ও বাতাসের চাপে। পেট্রলের সূক্ষ্ম কণাগুলি বিস্ফোরিত হয়ে গতির সৃষ্টি করে সিলিণ্ডারে। কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে এই কাজ হয় শুধুমাত্র বাতাসের চাপে। বাতাসের প্রচণ্ড চাপের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়, তা ডিজেল প্রভৃতি লো-গ্রেড জ্বালানীকে জ্বালিয়ে তার দ্বারা ইঞ্জিনে গতির সৃষ্টি করে থাকে।

ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ ডিজেল, ১৮৯৩ সালে এই ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন ও লো-গ্রেড জ্বালানীকে কার্যকরী করে তোলেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই তরল পদার্থের নাম হয় ডিজেল ও এই ইঞ্জিনের নাম হয় ডিজেল ইঞ্জিন। শুধু মোটর নয়, ট্রেন, লঞ্চ ইত্যাদি অন্য বহু যানবাহনও এই ইঞ্জিনে চলে।

ডিজেল ও পেট্রল ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান পার্থক্য

১। ডিজেল ইঞ্জিনে লো-গ্রেড জ্বালানী ডিজেল ব্যবহৃত হয় জ্বালানী

হিসাবে। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনে হাই-গ্রেড পেট্রল বা গ্যাসোলিন ব্যবহৃত হয় জ্বালানী হিসাবে।

২। পেট্রল ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে পেট্রল ও বাতাসের মিশ্রণকে কার্বোরেটারে জ্বালান হয়ে থাকে। সেটি সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিয়ে তাতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। ডিজেল ইঞ্জিনে লো-গ্রেড এই জ্বালানীকে সিলিণ্ডারে জ্বালান হয়, শুধুমাত্র বাতাসের চাপের দ্বারা সৃষ্ট তাপে।

গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার ও পিস্টনের পার্থক্য এখানে পাশাপাশি এঁকে দেখানো হলো।

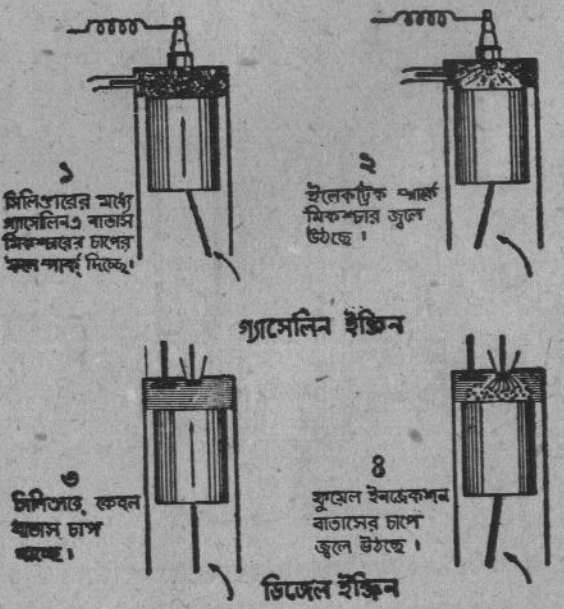

ডিজেল ও গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের তুলনা

৩। পেট্রল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার আপনা থেকেই পেট্রল টেনে নিয়ে থাকে—কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে পেট্রল ইন্‌জেক্ট করতে হয় বা জোর করে প্রবেশ করাতে হয়। এর জন্যে ইন্‌জেক্টার ব্যবহার করতে হয়।

৪। পেট্রল ইঞ্জিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রল বা গ্যাসোলিন মেশাবার জন্য কার্বোরেটারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কোনও কার্বোরেটারের প্রয়োজন হয় না।

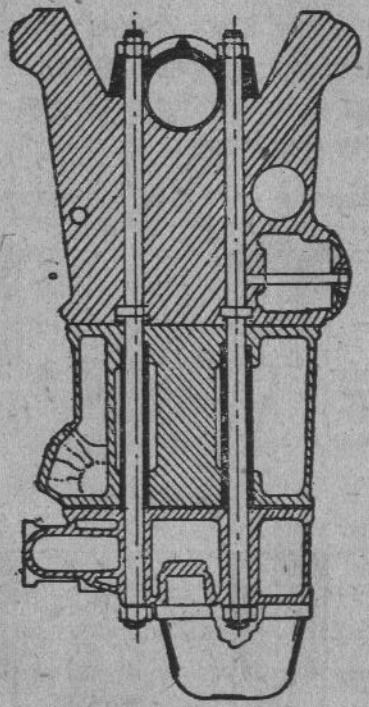

ক্র্যাঙ্ক কেস রিইন্‌ফোর্সমেণ্ট

৫। ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাসের চাপ পেট্রল ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক বেশী থাকে। কারণ বাতাসের চাপই এখানে প্রধান কাজ করে ডিজেল জ্বালাতে। তাই এর সিলিণ্ডার অনেক ভারী ও কর্মক্ষম করতে হয় ও এ সংখ্যায় পেট্রল ইঞ্জিনের থেকে সাধারণতঃ বেশী থাকে।

৬। পেট্রল ইঞ্জিনে পেট্রলকে বাষ্প বা ভেপারে পরিণত করার দরকার হয়—তাকে বলে ভেপারাইজেশান (Vapourization)। কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে তা দরকার হয় না।

৭। ডিজেল ইঞ্জিনে ভারী জ্বালানী ডিজেলকে ভেপারে পরিণত করা হয় না বলে, একে মেকানিক্যাল উপায়ে স্প্রে করা হয় সিলেণ্ডারের মধ্যে। কিন্তু পেট্রল ইঞ্জিনে তা আগেই ভেপারে পরিণত করা হয় কার্বোরেটারে।

৮। ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালাবার জন্যে Combustion Chamber থাকে—তা পেট্রল ইঞ্জিনে নেই। তার বদলে পেট্রল ইঞ্জিনে থাকে স্পার্ক প্লাগ—যা ডিজেল ইঞ্জিনে নেই।

৯। ডিজেল ইঞ্জিনের পার্টস্‌ সব খুব বেশী ভারী ও শক্ত হয়—পেট্রল ইঞ্জিনে এগুলি হয় হালকা।

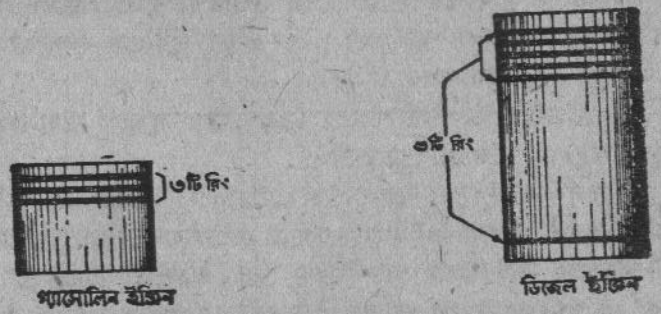

ডিজেল ও গ্যাসোলিনের পিস্টন

১০। পেট্রল ইঞ্জিনে জ্বালানী জ্বালাতে ইলেকট্রিক স্পার্ক দরকার হয়—ডিজেল ইঞ্জিনে তা দরকার হয় না।

১১। ক্র্যাঙ্ক কেস, ডিজেল ইঞ্জিনে বিশেষভাবে রিইন্‌ফোর্স করার প্রয়োজন হয়। এর ক্র্যাঙ্ক কেস হয় বিশেষ ভারী ও শক্ত। একটি ছবি দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া হলো। পেট্রল ইঞ্জিনে তার প্রয়োজন হয় না।

১২। ডিজেল ইঞ্জিনের চাপের সময় সিলিণ্ডারে বাতাসের তাপ ৮০০°—১০০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। পেট্রল ইঞ্জিনে তাপ এর চেয়ে অনেক কম সৃষ্টি হয়।

১৩। ডিজেল ছাঁকবার জন্যে ফিল্টার প্রয়োজন হয়—তা পেট্রল ইঞ্জিনে দরকার হয় না।

১৪। গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের পিস্টনে থাকে ৩টি রিং একই দিকে। ডিজেল ইঞ্জিনে থাকে ৬টি। তার ৫টি একদিকে, ১টি অন্যদিকে। চিত্রে পার্থক্যটি দেখানো হলো।

এ ছাড়াও ছোট ছোট কয়েকটি পার্থক্য আছে, যা পরবর্তী আলোচনার সময় বুঝতে পারা যাবে। সে সবগুলি হলো সাধারণতঃ কয়েকটি পার্টসের গঠন সম্পর্কিত।

জ্বালানী তেল (Fuel Oil)

জ্বালানী তেল হিসেবে লো-গ্রেড তেল ব্যবহৃত হয় বলেই ডিজেল ইঞ্জিনের চালাবার খরচা অনেক কম পড়ে থাকে। তা ছাড়া ডিজেলকে বাষ্পীকরণ করা হয় না বলে, এতে তেল খরচও কম হয়।

এই জ্বালানী তেলকে সিলিণ্ডারের চাপে উত্তপ্ত বাতাসে মধ্যে স্প্রে করে ছড়িয়ে দিয়ে, তা জ্বালানো হয়ে থাকে।

এই তেল সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ব্যবহৃত কেরোসিনের চেয়েও কম দামী তেল তবে এটি থেকে, ভেজাল বা Impurity-গুলি ছেঁকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ মাটি থেকে যে Crude তেল ওঠে—তা সামান্য ছেঁকে তা থেকেই এই তেল সহজে বের করা হয়। গ্যাসোলিন বা পেট্রল ও অবশ্য এই তেল থেকেই পাওয়া যায়—তবে তা ডিস্‌টিলেশন করে ও প্রচুর খরচ করে তৈরি করা হয়। তা ছাড়া Crude তেল থেকে, খুব সামান্য অংশ মাত্র এই High grade তেল পাওয়া যায়।

ডিজেল ফুয়েল অয়েলের জন্য সাধারণ ক্রুড তেল থেকে জল, মাটি, কাদা, আটা বা Gum ইত্যাদি মাত্র বাদ দিয়ে বাকী সবটাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই তেল পেট্রল বা গ্যাসোলিনের চেয়ে অনেক গাঢ় (Thick) হয় ও তা সহজে বাষ্পে পরিণত হয় না।

ডিজেল তেল ব্যবহারের বিপদ ও প্রতিকার

ডিজেল তেল ব্যবহারে অবশ্য কিছুটা বিপদও আছে। যদি এর মধ্যে বিস্ফোরক গ্যাস থাকে, তবে তার ফলে বিস্ফোরণ ঘটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া এই বাষ্প বাতাসের সঙ্গে মিশে যদি বিস্ফোরিত হয়, তা হলে এতে বিপদ হতে পারে। তাই ডিজেল তেল বাষ্পীকৃত হলে তা বিপজ্জনক হয়। তাতে সহজে আগুন ধরতে বা বিস্ফোরণ হতে পারে।

এইজন্যে ডিজেল তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্কে ভর্তি করার আগে, সব সময় তা থেকে গ্যাস দূর করে দিতে হবে। বাতাসের চাপ দিয়ে তা করা হয় এবং ঐ তেল টেস্ট

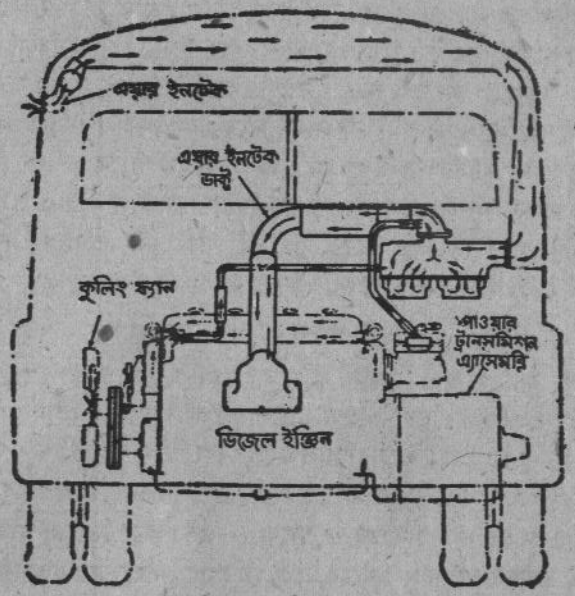

ডিজেল তেলের গতিপথ

করেও নেওয়া হয়। এই কাজ করার সময় বেন ধারে কাছে কোথাও আগুন না থাকে সেদিকে অবশ্য নজর রাখতে হবে।

সাধারণ সেণ্ট্রিফুগ্যাল পিউরিফায়ার (Centrifugal purifier) নিয়ে এই

তেল শোধন ও পরিষ্কার করা হয়ে থাকে।

ডিজেল তেলের গতিপথ

এর আগে পেট্রল ইঞ্জিন পর্যায়ে ট্যাঙ্ক থেকে কার্বোরেটার পর্যন্ত পেট্রলের সরবরাহ ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিনে এই গতিপথ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে, এটি পূর্ব পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখানো ও বোঝানো হলো।

প্রত্যেক ডিজেল ইঞ্জিনে চেসিসের সামনের দিকে, ইঞ্জিনের দু'পাশে দুটি ষ্টোরেজ ট্যাঙ্ক বসানো থাকে।

এই ট্যাঙ্কের নিচের অংশে থাকে রোটারী পাম্প—ছোট নালী দিয়ে ধীরে ধীরে তেল বেরিয়ে আসতে থাকে। ঐ তেল বেরিয়ে এলে তা Rotary পাম্প দিয়ে পাম্প করে উপরে উঠে যায় ও সেখানে থাকে মিটার। এই মিটার তেলের পরিমাণকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করে। তারপর আসে সারভিস্ ট্যাঙ্কে (Service Tank)। সেখানে থেকে তা পৃথক নালী দিয়ে আর একটি Rotary পাম্প হয়ে যায় ফিল্টরে। সাধারণতঃ একটি বা দুটি ফিল্টার থাকে। এই ফিল্টার অবশ্যই প্রয়োজন—কারণ তা না হলে তেলে সামান্য ভেজাল থাকাও বিপজ্জনক। প্রথম একটি বা দুটি ফিল্টারের পর তা যায় এজ্ টাইপ ফিল্টারে তারপর এই তেলকে পাঠানো হয় সিলিণ্ডারে ব্যবহারের জন্য।

ফুয়েল পাম্প (Fuel Pump)

আগেই বলা হয়েছে, পেট্রল ইঞ্জিনের কোনও ফুয়েল পাম্প প্রয়োজন হয় না। এখানে কার্বোরেটারে মিশ্রিত বাতাস ও পেট্রল বাষ্পকে টেনে নেয় সিলিণ্ডারে। কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে তেল পাম্প করতে হয়। সারভিস্ ট্যাঙ্ক (Service Tank) থেকে ইন্জেক্টারের স্প্রে নোজল্ ভাল্ব পর্যন্ত তেল দ্রুত চলতে পারে এই পাম্পের সাহায্যে। এই গাঢ় ডিজেল তেলকে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মত সময়ের মধ্যে প্রতিবার সিলিণ্ডারে ইনজেক্ট করা হয় বলেই, এই পাম্প একান্তভাবে দরকার। যতক্ষণ ইঞ্জিন চলবে ততক্ষণ পাম্পের কাজ চলে। ইন্জেক্টারের স্প্রে নোজ্ল-এ তা স্প্রে করা হয়ে থাকে। সিলিণ্ডারের মধ্যে এর পরিমাণও একেবারে নির্দিষ্ট থাকে। তাই স্প্রে পাম্প নিখুঁত হওয়া অবশ্যই উচিত।

নোজ্ল হোল্ডার ও স্প্রে নোজ্ল
(Nozzle holder and Srpay nozzle)

প্রতিটি সিলিণ্ডারের মধ্যে স্প্রে করে ইন্জেক্ট করার জন্য ব্যবহার হয় নোজ্ল হোল্ডার ও স্প্রে নোজ্ল।

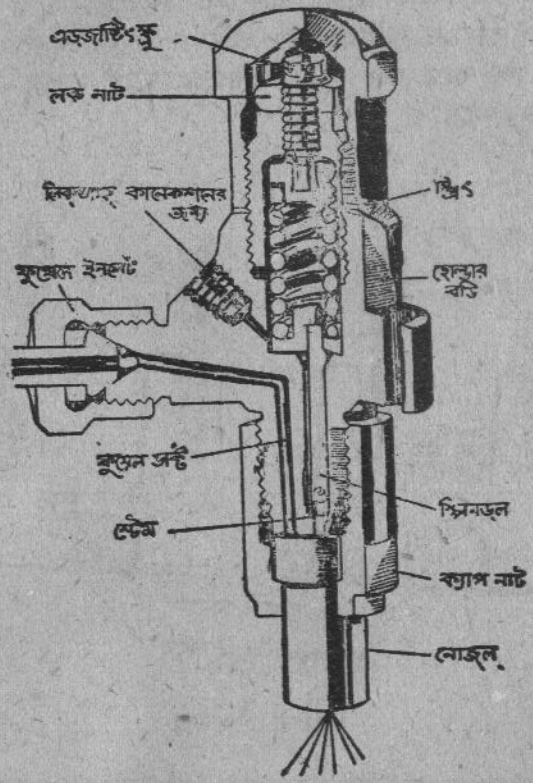

স্প্রে নোজ্ল

এটি সাধারণতঃ Spring-এর সাহায্যে কাজ করে। নোজ্লকে ধরে রাখা ও ঠিকমতো কাজ করার সুবিধার জন্যে Holderটির দরকার হয়। হোল্ডারের

থাকে Body—তার উপরে থাকে স্প্রিং ও Adjust করার জন্য স্ক্রু। এটি লক্ নাট্ (Lock nut) দিয়ে আটকানো থাকে।

প্রতিটি হোল্ডারে থাকে Fuel inlet—এখান দিয়ে তেল ঢুকে তা যায় ফুয়েল ডাক্ট (Duct) দিয়ে। তারপর তা আসে নোজ্‌লে। নোজ্‌লের পেছনে থাকে Stem ও Spindle—তারপর নোজ্‌লের ঠিক পেছনে থাকে Cap-nut। তেলকে পাম্প করে নোজ্‌লের মাঝ দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সিলিণ্ডারের মধ্যে। নোজ্‌লটি স্প্রে করার কাজ করে। নোজ্‌লের মুখে ভাল্‌ব থাকে—যাতে তেলের গতি একমুখী হয়।

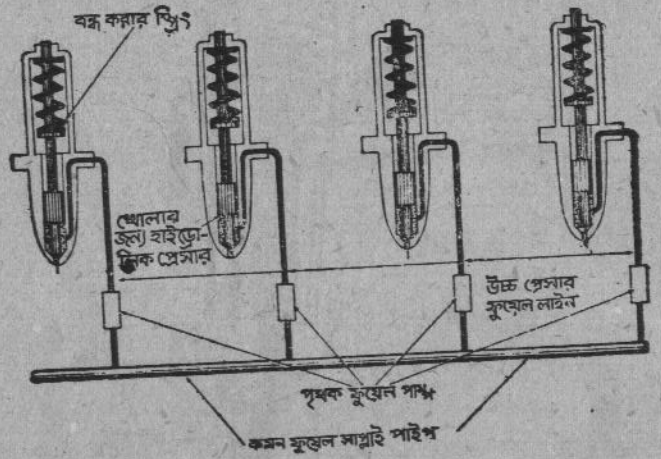

নোজ্‌ল হোল্‌ডার

একটি ইঞ্জিনে যতগুলি সিলিণ্ডার থাকে ততগুলি পাম্প ও নোজ্‌ল্ থাকে চিত্রে তা দেখানো হলো। হাইড্রলিক প্রেসার দ্বারা নোজ্‌লের পেছনের ভাল্‌ব খোলা হয়ে থাকে। প্রতিটি নোজ্‌ল হোল্‌ডারের একটি করে পাম্প থাকে।

তেল যাবার ফুয়েল লাইন থেকে প্রতিটি ইন্‌জেক্টারে পৃথক পৃথক ভাবে

তেল সাপ্লাই করা হয়ে থাকে। এই সব স্প্রে পাম্প প্রতি স্কোয়্যার ইঞ্চিতে ১০০০ পাউণ্ড থেকে ১০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপে কাজ করে থাকে।

ফুয়েল পাম্পের বর্ণনা ও কাজ

প্রতিটি সিলিণ্ডারের নোজ্‌ল পর্যন্ত কাজ করার জন্য একটি করে পৃথক ইণ্ডিভিজুয়্যাল ফুয়েল পাম্প থাকে। এই পাম্প ক্যামশ্যাফটের ক্যাম অথবা অতিরিক্ত ব্যবস্থায় ক্যাম দ্বারা চালিত হয়। প্রতিটি পাম্প নিজে নিজে কাজ করে চলে।

প্রতি পাম্পে একটি করে ছোট সিলিণ্ডার থাকে। এই সব সিলিণ্ডারে মেন ট্যাঙ্ক থেকে ট্রান্সফার পাম্প (Transfer Pump) দিয়ে তেল পাঠানো হয়।

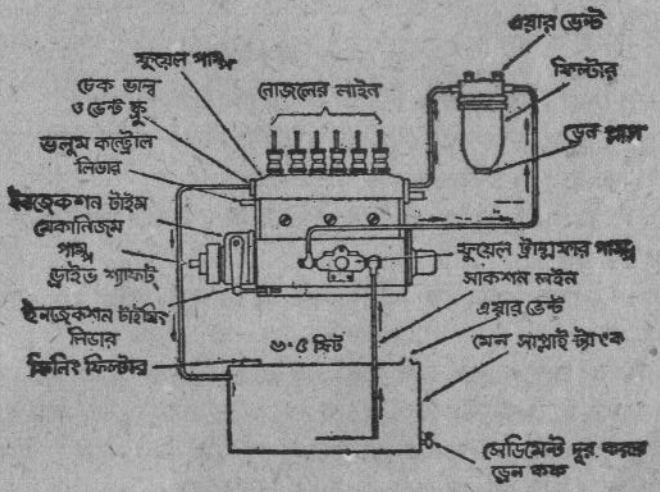

ফুয়েল পাম্প

মেন সাপ্লাই ট্যাঙ্ক ফিলিং ফিল্টার থাকে দুটি প্রবেশ পথেই। নিচে থাকে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য ও Sediment বের করে দেবার জন্যে Draincock। পাম্প চলার জন্যে এতে Pump drive shaft থাকে, তার জন্যে থাকে Lever। তারপর তা চলে যায় Filter-এ। এর সঙ্গে থাকে এয়ার ভেন্ট—তবে তা সর্বদা

বন্ধ রাখাই উচিত। তারপর তা চলে যায় সোজা ফুয়েল পাম্প (Fuel pump) ও তা থেকে নোজ্‌লগুলিতে। Check valve-এর কাজ হ'লো তেলের পরিমাণ ঠিক রাখা ও তেলের গতিকে এক মুখে চালিত করা।

আগে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিটি নোজ্‌ল ও নোজ্‌ল হোল্‌ডারের পৃথক পৃথক ইণ্ডিভিজুয়্যাল পাম্প ব্যবস্থা।

কিন্তু অনেক সময় আবার দেখা যায়, মাত্র Master fuel pump থাকে; তা থেকে তেল একটি পথ বা Common Rail দিয়ে যায় ও Fuel line দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি নোজ্‌লে যায়।

এই সব নোজ্‌লগুলি ক্যাম দ্বারা খোলে ও Spring দ্বারা বন্ধ হয়। মাস্টার পাম্প থেকে ডিস্ট্রিবিউটার দিয়ে প্রতিটি নোজ্‌লে সাধারণতঃ তেল পাঠানো হয়।

স্প্রে নোজ্‌লের কাজ

স্প্রে নোজ্‌ল কি কি কাজ করে তা এবারে বলা হচ্ছে—

১। এটি ফুয়েল তেলকে স্প্রে করে প্রতি সিলিণ্ডারে সূক্ষ্ম আকারে ছড়িয়ে দেয়। তা না হলে সিলিণ্ডার কাজ করতে পারে না।

২। তেলের সিলিণ্ডারে প্রবেশের সময়কে কণ্ট্রোল করে ঠিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্প্রে হয়।

৩। তেলের পরিমাণকে নির্দিষ্ট করে এই নোজ্‌ল, যাতে তেল বেশী বা কম হয় না।

এটি উচ্চ তাপ ও চাপে কাজ করে, তাই একে সেই রকম ভাবে তৈরি করার প্রয়োজন হয় যাতে এটি উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে। এটি ভাল্‌ব দিয়ে Operate করানো হয়—যাতে এর সময় ও পরিমাণ ঠিক থাকে। ইঞ্জিনের উপযুক্ত ভাবে কাজ করা অনেকটা এর উপরে নির্ভর করে।

এর প্রধান তিনটি অংশ। তা হলো—

১। নোজ্‌ল হোল্‌ডার।

২। নোজ্‌ল এসেম্‌ব্লি (ভাল্‌ব সহ)

৩। ক্যাপ নাট (Cap Nut)—এটি দিয়ে নোজ্‌লটি আটকে থাকে হোল্‌ডারে।

এয়ার কম্‌প্রেসার (Air Compressor)

এয়ার কম্‌প্রেসার হ'লো বাতাসের চাপ সৃষ্টি করার জন্যে। এই এয়ার কম্‌প্রেসার তিন ধরনের হয়—

১। স্টার্টিং এয়ার কম্‌প্রেসার (Starting Air Compressor)

২। স্ক্যাভেঞ্জিং এয়ার কম্‌প্রেসার (Scavenging Air Compressor)

৩। অক্সিলিয়ারি এয়ার কম্‌প্রেসার (Auxilliary Air Compressor)

এগুলি প্রতিটি কি কি কাজ করে তা বলা হচ্ছে—

স্টার্টিং এয়ার কম্‌প্রেসার

এটি ইঞ্জিন চালু করার জন্যে বাতাস সাপ্লাই করে। সাধারণতঃ বাতাসের চাপ ২৫০ পাউণ্ড হয়ে থাকে।

একটি ইঞ্জিন চালু করতে সাধারণতঃ ১৫০ থেকে ৩০০ পাউণ্ড বাতাসের প্রেসার দরকার হয় (প্রতি ইঞ্চিতে)। অনেক সময় স্টার্টিং কম্‌প্রেসার হিসাবে রোটারী পাম্প ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ স্টার্টিং এয়ার পাম্প, বিশেষভাবে তৈরি শক্ত স্টীল ট্যাঙ্কে রাখা হয়। এতেও প্রতি স্কোয়্যার ইঞ্চিতে ২৫০ পাউণ্ড প্রেসার থাকে।

এছাড়া বিশেষভাবে তৈরি এয়ার Bottle-এও উচ্চ চাপে বাতাস রাখা হয়।

স্ক্যাভেঞ্জিং এয়ার কম্‌প্রেসার

এগুলি ব্যবহৃত হয় প্রত্যেক স্টোকের পর সিলিণ্ডারে যে পোড়া গ্যাস জমে, তাকে পরিষ্কার করার জন্যে এবং কম্‌প্রেসারের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস চার্জ করার জন্যে। এতে প্রেসার কম সাপ্লাই করা হয়। সাধারণতঃ প্রতি ইঞ্চিতে মাত্র ২ থেকে ৬ পাউণ্ড প্রেসারে ব্যবহার করা হয়।

অক্সিলিয়ারি কম্‌প্রেসার

কোনও কোনও ইঞ্জিনে স্টার্টিং এয়ার কম্‌প্রেসার ছাড়াও থাকে অতিরিক্ত কম্‌প্রেসার—তাকে বলে অক্সিলিয়ারি কম্‌প্রেসার। তবে সব ইঞ্জিনে এটি থাকে না।

ডিজেল সিলিণ্ডার

ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার পেট্রল ইঞ্জিনের থেকে অনেক বেশী ভারী ও শক্ত হয়—কারণ তাকে আরও বেশী তাপ ও বাতাসের চাপ সহ্য করতে হয়।

সাধারণতঃ এগুলি শক্ত Cast Iron দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। একটি দু ভাবে তৈরি হয়—

১। একটি সম্পূর্ণ সিলিণ্ডার একত্রে তৈরি হয়—যাকে বলে One Piece Construction।

২। খণ্ডে খণ্ডে পৃথকভাবে তৈরি হয় বা Sectional কন্‌স্ট্রাকশন তৈরি হয়ে গেলে section-গুলি একত্রে শক্তভাবে আটকে দেওয়া হয়ে থাকে।

একত্রে তৈরি হলে তাতে অসুবিধা হয় বলে, আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড করেই তৈরি হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে পেট্রেল ইঞ্জিনের পিস্টনে মাত্র এক মাথায় তিনটি রিং ফিট করা থাকে—কিন্তু এতে এক মাথায় ৫টি বা তারও বেশীও অন্য মাথায় একটি বা ২টি রিং ফিট্ করা হয়।

গভার্ণার (Governors)

গভার্ণার হলো একটি কার্যকরী পদ্ধতি, যার দ্বারা ডিজেল ইঞ্জিনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইঞ্জিনে লোড কম-বেশী হলেও এটি ইঞ্জিনের গতিকে সমান রাখে।

সিলিণ্ডারের লোডের প্রয়োজন অনুসারে Load supply কম বা বেশী করে এটি গতি নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিণ্ডারে জ্বালানী সাপ্লাই কম বা বেশী করে এটি লোড সাপ্লাইকে কম বেশী করে থাকে। জ্বালানী বেশী দিলে পাওয়ার বাড়ে—কমালে পাওয়ার কমে যায়।

ফুয়েল পাম্পের সাক্‌শন ভাল্‌বে নির্দিষ্ট সময়ে খুলে দিয়ে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে

বেশী ফুয়েল সাপ্লাই করে এটি গতি বাড়ায়—আবার তা বন্ধ করে গতি কমায়। এইভাবে গভর্ণার কাজ করে।

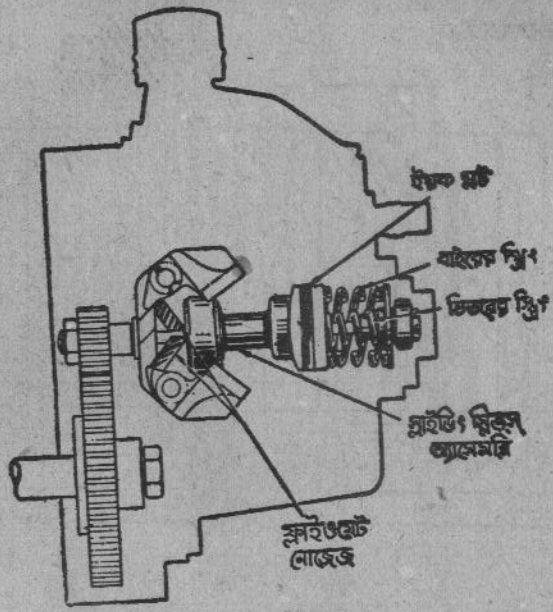

গভর্ণার

গভর্ণারও স্প্রিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কাজ করে থাকে। এতে থাকে Inner ও Outer দুটি স্প্রিং, Yoke slot, Flyweight nose ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ছবিতে এগুলি ভালভাবে বোঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের গভার্ণার এই কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—তার মধ্যে প্রধান হলো Centrifugal গভার্ণার।

কুলিং সিস্‌টেম (Cooling System)

সাধারণতঃ প্রবহমান জল সাপ্লাই করে অর্থাৎ (Air Circulation) দ্বারা

ডিজেল ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রত্যেক সিলিণ্ডারের জন্য পৃথক পৃথক কুলিং ব্যবস্থা থাকে—তার কারণ সিলিণ্ডার বেশী তাপে কাজ করে। জল গরম হলে, আবার তা ঘুরিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা থাকে।

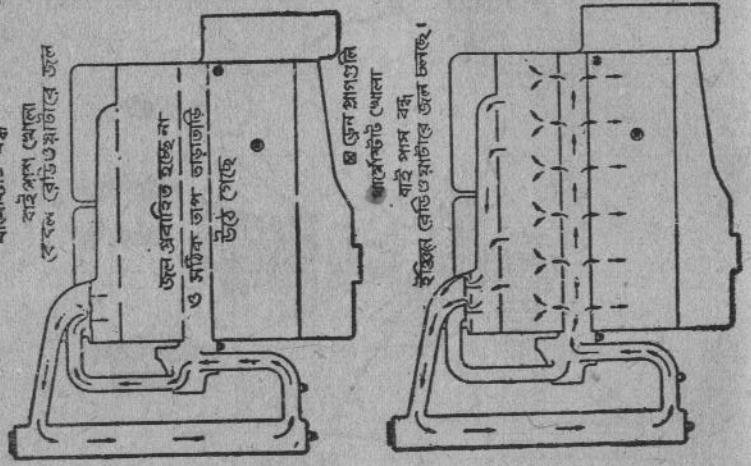

কুলিং সিস্‌টেম

সিলিণ্ডারগুলি ছাড়াও লুব্রিকেটিং তেল ও এয়ার কম্‌প্রেসারকেও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়। থার্মোস্ট্যাট বন্ধ ও খোলা অবস্থায় কুলিং সিস্‌টেম ব্যবস্থা ছবি দ্বারা বোঝানো হ'লো।

ডিজেল ইঞ্জিনের স্টার্টিং

ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট করার ব্যবস্থা পেট্রোল ইঞ্জিন থেকে পৃথক হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ডিজেল ইঞ্জিন বাইরের অন্য শক্তি দ্বারা স্টার্ট নিতে পারে না। তার কারণ হলো, সিলিণ্ডারে বাতাসের চাপ দরকার হয়, যা ফুয়েল জ্বালিয়ে তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এটি স্টার্ট করার উপায় তিনটি—

১। চাপযুক্ত বাতাস বা Compressed air।

২। ইলেকট্রিক মোটরের দ্বারা বায়ুর চাপ সৃষ্টি।

৩। হাত দিয়ে স্টার্ট বা Hand cranking।

স্টার্টিং-এর জন্যে বাতাস এয়ার বোতল বা এয়ার ট্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যায়। অক্সিলিয়ারি কম্প্রেসার বা স্টার্টিং কম্পেসার থেকে এই চাপযুক্ত বাতাস পাওয়া যায়। ২৫০ পাউণ্ড ইঞ্চি প্রতি চাপে এটি স্টার্ট নেয়।

এয়ার কম্প্রেসার থেকে বাতাসের চাপ কণ্ট্রোল করা হয় সেফটি ভাল্‌ব দিয়ে।

ইঞ্জিন স্টার্টিং

এখানে এই ছবিতে এয়ার স্টার্টিং সিস্‌টেম কিভাবে ডিজেল ইঞ্জিনে কাজ করে থাকে তা দেখানো হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিনের এই পদ্ধতি পেট্রল ইঞ্জিনে একেবারেই প্রয়োজন হয় না—তা বোঝা যাচ্ছে।

ইলেকট্রিক সিস্‌টেমে A. C. ব্যাটারী দ্বারা চার্জ করে বায়ুর চাপ সৃষ্টি করা হয় ও তার ফলে ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়ে থাকে। পেট্রল ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় ইগ্নিশন সুইচ দ্বারা।

ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট করার আগে সর্বদা দেখতে হবে যেন ফুয়েল ট্যাঙ্ক বা ফুয়েল সিস্‌টেমে কোন ময়লা জমে না থাকে। এটি নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার।

স্টার্টে আগে দ্রষ্টব্য

ইঞ্জিন স্টার্টের আগে প্রয়োজনীয় লক্ষণীয় বিষয়গুলি হ'লো—

১। ইঞ্জিনের আশে-পাশে যেন কোন যন্ত্রাংশ, বাজে জিনিস বা কোনও বস্তু না থাকে—তা হলে কম্পনের জন্য তা ইঞ্জিনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

২। সবগুলি ট্যাঙ্কে যেন প্রচুর জ্বালানী, লুব্রিকেটিং তেল এবং এয়ার ট্যাঙ্কে উপযুক্ত বাতাস থাকে।

৩। ভাল্‌বগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা দেখতে হবে।

৪। সমস্ত পার্টসগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তা দেখতে হবে।

৫। কোথাও কোন লিকেজ আছে কিনা ; তা দেখা অবশ্য কর্তব্য।

ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় না কেন ?

কি কি কারণে ডিজেল ইঞ্জিন স্টার্ট নেয় না, তা দেখা অবশ্য কর্তব্য।

১। এয়ার প্রেসার খুব কম থাকলে।

২। ইঞ্জিন ঠিকমতো কম্‌ক্ষম না থাকলে।

৩। ভাল্‌বগুলি উপযুক্তভাবে না খুললে।

৪। এয়ার Inlet বা Exhaust ভাল্‌বগুলি খোলা থাকলে বা লিক্ করলে। ৫। ইঞ্জিনের Bearing গুলি টাইট না হলে।

৬। ইঞ্জিনে লোড বেশী হলে। এক্ষেত্রে লোড কমাতে হবে।

৭। এয়ার চেক ভাল্‌বগুলি ঠিকমতো না বসলে।

৮। ইলেকট্রিক স্টার্টিং ও ব্যাটারী ঠিকমতো চার্জ না দিলে। এক্ষেত্রে ব্যাটারী সুইচগুলিও মোটর ক্লাচ পরীক্ষা করতে হবে।

ইঞ্জিন ঘুরলেও জ্বালানী না জ্বলার কারণ

ইঞ্জিন ঘুরলেও কি কি কারণে জ্বালানী না জ্বলতে পারে তা এবারে বলা হচ্ছে।

১। ট্যাঙ্কে বা পাম্পে Fuel অয়েল উপযুক্ত না থাকলে।

২। ফুয়েল পাম্প বাতাস বা জলে আটকে থাকলে।

৩। ফুয়েল লিভার বা হ্যাণ্ডহুইল ঠিকমতো না চললে।

৪। ফুয়েল ভাল্‌ব ও স্প্রে নোজল ঠিকমতো না খুললে।

৫। স্প্রে নোজল্-এর ছিদ্রগুলি বন্ধ থাকতে পারে বা 'জাম' হতে পারে।

৬। ফুয়েল অয়েল জল বা বাতাস থাকলে।

৭। বাইপাস্ ভাল্‌বগুলি ঠিক না থাকলে।

৮। ফুয়েল অয়েলের পাইপগুলি জাম হলে।

৯। ইন্‌জেকশন পাম্পের গভার্ণার আটকে গেলে।

১০। ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে ফুয়েল না গেলে।

১১। সিলিণ্ডারের কুলিং ওয়াটার দ্রুত চলতে থাকলে।

১২। ফুয়েল ডেলিভারীর টাইমিং ঠিক না থাকলে।

১৩। ফুয়েল বেশী ঘন হয়ে গ্লো না করলে।

১৪। ফিল্টার জমা হলে। ১৫। পিস্টন আটকে গেলে।

১৬। এয়ার কম্প্রেসান কম হলে বা লিক করলে।

১৭। অয়েল সিস্‌টেম পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১৮। জ্বালানী ও তাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ঠাণ্ডার জন্য স্টার্ট না নেবার কারণ

১। ঠাণ্ডার জন্যে জ্বালানী গাঢ় হতে পারে ও তাতে ঠিকমতো কাজ হতে পারে না।

২। ইন্‌লেট বাতাস খুব ঠাণ্ডা হয় এবং তা তাপে গরম না করে নিয়ে স্টার্ট হয় না। ৩। সার্কুলেটিং ওয়াটার খুব বেশী ঠাণ্ডা হলে উপযুক্ত তাপ সৃষ্টি হয় না। ফুয়েল ট্যাঙ্কে জল গিয়ে, তা জমে যেতে পারে।

৫। ব্যাটারী জমে যেতে পারে এবং তার ফলে ভোল্টেজ উৎপাদন কমে গিয়ে থাকে।

ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করার উপায়

১। ফুয়েল সাপ্লাই বন্ধ করতে পারে।

২। লুব্রিকেটিং অয়েল সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে।

৩। এয়ার কম্প্রেসারের কাজ বন্ধ করতে হবে।

৪। ফুয়েল সাপ্লাইয়ের ভাল্‌ব বন্ধ করতে হবে।

৫। ওয়াটার কুলিং ইঞ্জিন বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ চালু রাখা উচিত—

তারপর তা বন্ধ করতে হবে।

৬। ঠান্ডা দেশ হলে ইঞ্জিন বন্ধ করে ভেতরের সব জল বের করতে হবে—যাতে তা জমে না যায়।

৭। ইঞ্জিন কয়েকদিন একনাগাড়ে বন্ধ রাখা উচিত নয়—রোজ অন্ততঃ কিছু সময় তাকে চালনা করা উচিত।

কিছুতেই ইঞ্জিন বন্ধ হতে চায় না, কি কারণে?

অনেক সময় ইঞ্জিন চলতে চলতে এমন হয়, আর তা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না—সামনে ইঞ্জিন চলতে থাকে। তার ফলে বিপদও হতে পারে। কি কি কারণে এরূপ হতে পারে তা বলা হচ্ছে।

১। গভার্ণার ঠিকমতো কাজ করে না, ফলে ইঞ্জিন বন্ধ হতে চায় না;

২। গভার্ণার ও ফুয়েল সাপ্লাইয়ের মধ্যে কানেকশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩। ভাল্‌ভগুলি ঠিকমতো কাজ করে না।

৪। ইন্‌জেকশন পাম্প ঠিকমতো কাজ করে না ও ফুয়েল প্রেরণ বন্ধ করে না।

ইঞ্জিনের শক্তি কম হয় কেন?

১। ফুয়েল পাম্প বা ফুয়েল লাইনে বাতাস থাকলে।

২। জল কিংবা ইন্‌পিউরিটি ফুয়েলে থাকলে।

৩। ডেলিভারী ভাল্‌ব লিক করলে।

৪। নোজল্‌ ভাল্‌ব লিক করলে বা ঠিকমতো কাজ না করলে।

৫। ফিল্টারের স্ক্রীনগুলি 'জাম' হলে।

৬। লুব্রিকেশন ঠিকমতো না হলে।

৭। গভার্ণার ঠিকমতো কাজ না করলে বা রেগুলেট না করা হলে।

৮। অতিরিক্ত লোডের জন্য।

৯। ভাল্‌বগুলি এবং ডাকট্‌গুলি জাম হলে।

১০। এয়ার ফিল্টার জাম হলে।

১১। এয়ার কম্‌প্রেসান ঠিকমতো না হলে। ১২। পিস্টন রিং লিক করলে।

১৩। পিস্টন ঠিকমতো না নড়াচড়া করলে।

১৪। বাতাস প্রবেশ (Intake) কম হলে।

১৫। বিয়ারিং ঠিকমতো কাজ না করলে।

১৬। সব সিলিন্ডারগুলিতে ঠিকমতো কাজ না হলে।

১৭। একজস্ট দ্বারা একজস্ট লাইন জাম হলে।

ইঞ্জিন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলে কেন?

১। ঠিকমতো চালাতে না জানলে ও মেকানিক্যাল গণ্ডগোল।

২। ফুয়েল ইন্‌জেকশন তাড়াতাড়ি হতে থাকলে।

৩। ফুয়েল ইন্‌জেকশন ভাল্‌ব লিক করলে।

৪। ফুয়েল লাইন বাতাস প্রবেশ করলে।

৫। এয়ার কম্প্রেসান ঠিকমতো না হলে।

৬। পিস্টন ঢিলেভাবে কাজ করলে। ৮। বিয়ারিং ঢিলা হলে।

৯। ভাল্‌বগুলি ঢিলা হলে।

১০। ফ্লাই হুইল ঢিলা অবস্থাতে কাজ করলে।

১১। বিভিন্ন পার্টসগুলি ঢিলা হলে।

ইঞ্জিন অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয় কেন?

১। কুলিং-এর জল বন্ধ হলে বা ঠিকমতো তা সার্কুলেট না করতে থাকলে।

২। সিলিন্ডারের ওয়াটার জ্যাকেট জ্যাম হলে।

৩। পাইপগুলি জাম হলে।

৪। ওয়াটার পাম্প ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে।

৫। ইঞ্জিনের পার্টসগুলি বেশী টাইট হয়ে, ঘর্ষণের জন্য তাপ বেশী সৃষ্টি হলে। ৬। লুব্রিকেশন ঠিকমতো না হলে।

৭। ফুয়েল ইন্‌জেকশানে দেরী হলে।

৮। কুলিং ওয়াটারের তাপ খুব বেশী হলে।

দ্রষ্টব্য :—যদি ঠিকমতো কুলিং না হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জল ফেলে দিয়ে ঠান্ডা জল দেওয়া উচিত নয়। তার বদলে ইঞ্জিন কিছুক্ষণ থামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা ভাল।

সাধারণতঃ ডিজেল তেলে ইম্‌পিউরিটি থাকে—এই সব ইম্‌পিউরিটিগুলি থাকলে যে-কোন মুহূর্তে নানা বিপদ ঘটা সম্ভব।

ফিল্টার

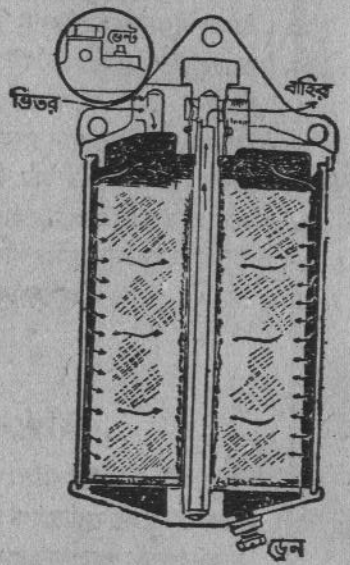

ফিল্টার সেক্‌শন

ডিজেল ইঞ্জিনের প্রতিটি ধাপে ধাপে তাই ফিল্টার দেওয়া প্রয়োজন হয়। ফিল্টারের সংখ্যাও অনেকগুলি থাকে।

এখানে ফিল্টারের দুটি ছবি দিয়ে ওটা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। তেলের প্রবেশ, নির্গমন ও তা কিভাবে ফিল্টার হয়, তা এখানে ছবি দ্বারা স্পষ্ট বোঝান হলো।

ফিল্টার সব সময় এমন হবে, যেন তা সহজে জাম না হয়। জাম হলেও সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার করা উচিত।

এয়ার সিস্‌টেম

ডিজেল ইঞ্জিনের এয়ার সিস্‌টেম একটি প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

ডিজেল ইঞ্জিনে কিভাবে এয়ার সিস্‌টেম কাজ করে, তা একটি ছবি দ্বারা ভালভাবে বোঝান হলো। ডিজেল ইঞ্জিনে বাতাস একটি বিরাট কার্যকরী বস্তু—তা আগেই বলা হয়েছে।

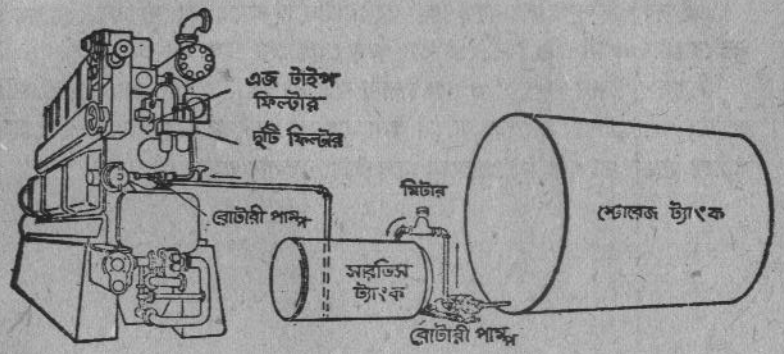

এয়ার সিস্‌টেম

গাড়িতে এয়ার ইন্‌টেক (Intake) প্রথমে হয়—তার পরে তা Air intake duct দিয়ে কিভাবে যায়, তা এই ছবি দ্বারা বোঝান হলো। Cooling fan দ্বারা বাতাসকে ঠাণ্ডা করা হয়।

ডিজেল ইঞ্জিনের গঠন

এবারে ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ একটি ছবি দ্বারা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটির একটি Cross Section দেওয়া হচ্ছে (১৫৫ পৃষ্ঠায়) প্রধান অংশগুলি হলো—

১। সিলিণ্ডার (Cylinder) ২। এয়ার পোর্ট (Port)

৩। ইন্‌জেক্টর (Injector)—যা দিয়ে তেল (ডিজেল) সিলিণ্ডারের ভিতরে স্প্রে করা হয়।

৪। সিলিণ্ডারের ভিতরের Liner।

৫। সিলিণ্ডার টেস্ট ভাল্‌ব (Test Valve)

৬। মেন বিয়ারিং ক্যাপ (Main Bearing Cap)
৭। কানেকটিং রড্ ক্যাপ।
৮। পিস্টনকে ঠান্ডা করার জন্যে (Piston cooling tube)।
৯। ক্যাম শ্যাফ্ট্ (Cam shaft)
১০। মেন বিয়ারিং (Main bearing)

এই সব পার্টস্গুলির কাজ কি, তা মোটামুটি আগে বর্ণনা করা হয়েছে। এবারে মোট জিনিসটির ফিটিং ও তার কাজ বোঝানো হচ্ছে।

ডিজেল ইঞ্জিন সম্পর্কে ও তা চালনা করা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো। সাধারণতঃ ডিজেল গাড়ির অন্য যে-সব পার্টস্ ঠিক সাধারণ পেট্রোল গাড়ির মতো, তা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করে, বললাম না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ডিজেল ইঞ্জিনের আরও বিশেষ কথা

একটি Cycle শেষ করতে এই ইঞ্জিনের চারটি করে স্ট্রোক প্রয়োজন হয়। তা হলো—

১। সাক্শন স্ট্রোক। ২। কম্প্রেশন স্ট্রোক।
৩। পাওয়ার স্ট্রোক। ৪। একজস্ট স্ট্রোক।

এবারে প্রতিটির বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাক্শন স্ট্রোক

পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখে এটি বোঝা যাবে। এতে পিস্টনটি নিচের দিকে নেমে আসে। তার ফলে ইন্লেট ভাল্ব খুলে যায়। টাটকা বাতাস তখন ভিতরে

প্রবেশ করে। একজস্ট ভাল্ব তখন বন্ধ থাকে। বড় ও ভারী ডিজেল গাড়িতে এই চার স্ট্রোকযুক্ত ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়।

কম্প্রেশন্ স্ট্রোক

চার স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনের এটি দ্বিতীয় স্ট্রোক। একটি চিত্রে এটি দেখানো হলো। এই অবস্থায় ইন্লেট্ এবং এক্জস্ট ভাল্ব বন্ধ থাকে।

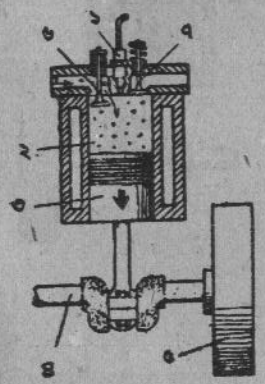

সাক্শন স্ট্রোক

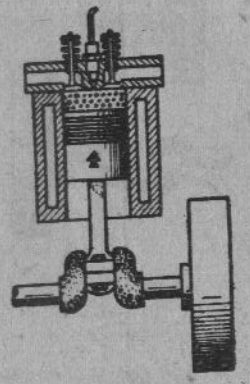

কম্প্রেশন স্ট্রোক

১। ইনজেক্টার ২। সিলিন্ডার
৩। পিস্টন ৪। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট্
৫। ক্লাইহুইল ৬। ইন্লেট ভাল্ব
৭। একজস্ট ভাল্ব

পিস্টনটি উপরে উঠে যায়। তার ফলে বাতাসে চাপ পড়ে এবং বাতাসের তাপ বৃদ্ধি পায়। এরপরে ডিজেল ফুয়েল তার মধ্যে ইন্জেক্টর দিয়ে প্রবেশ করানো হয়।

যখন গরম বাতাসের সঙ্গে ডিজেল ফুয়েল মিশে যায় তখন সেটি পুড়ে যায় এবং তার ফলেই পিস্টন চাপ লেগে নিচে নেমে আসে।

পাওয়ার স্ট্রোক

এটি তৃতীয় স্ট্রোক। এতে ইন্লেট ও একজস্ট ভাল্ব বন্ধ হয়ে যায়।

পোড়া গ্যাসের চাপে পিস্টনটি নিচে নেমে আসে। এটি আপনা থেকেই হয় এবং গ্যাসের প্রভাবে হয়ে থাকে। এটি বেশ শক্তিশালী স্ট্রোক বলা যায়।

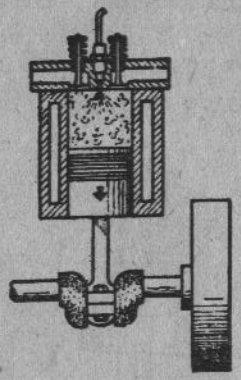

পাওয়ার স্ট্রোক

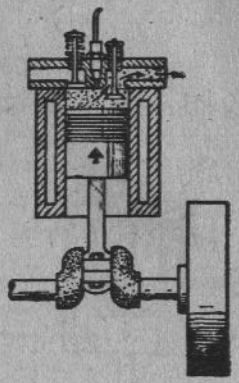

এক্‌জস্ট স্ট্রোক

এক্‌জেস্ট স্ট্রোক

এটি চতুর্থ এবং শেষ স্ট্রোক। এই স্টেট্রাকে পিস্টনটি উপরে ওঠে। ইন্‌লেট ভাল্‌ব বন্ধ থাকে। কিন্তু একজস্ট ভাল্‌বটি থাকে খোলা। এক্‌জস্ট গ্যাস বের হয়ে ধীরে ধীরে বাতাসে মিশে যায়।

এই চারটি স্টোক মিলে হলো একটি মাত্র ক্রিয়া চক্র। এর সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট দুপাক ঘুরে যায়। এইভাবে ক্রিয়াচক্র চলতে থাকে এবং ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট ঘুরে চলতেই থাকে।

এই পদ্ধতির ডিজেল ইঞ্জিন বাজারে বেশ চালু হয়েছে। তবে তাছাড়াও আজকাল দুটি স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনও বের হয়েছে। এটিও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

দুই স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিন

এখানে দুই স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিন এবং তা কিভাবে কাজ করে তা পরে পরপর দুটি ছবির দ্বারা ভালভাবে বোঝানো হলো। প্রথম ছবিটিতে উপরের দিকের স্ট্রোক বা আপ্‌ওয়ার্ড স্ট্রোক দেখানো হচ্ছে।

এটি মাত্র দুটি স্ট্রোকে কাজ করে—

১। উপরের দিকের প্রথম স্ট্রোক বা Upward stroke।

২। নিচের দিকে দ্বিতীয় স্ট্রোক বা Down ward stroke।

প্রথম স্ট্রোক—প্রথমে ইন্‌লেট পোর্টের মধ্য দিয়ে বাতাস ভিতরে টেনে নেওয়া হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে ডিজেল তেলও ভিতরে ইনজেক্ট হয়ে যায়। প্রথম স্ট্রোকের কাজ হলো বাতাসকে চাপ দেওয়া বা কম্‌প্রেস্‌ করা। উপরের দিকের চাপের ফলে এই কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। কাম্বাশ্‌সন চেম্বারের পূর্ণ উপরে গিয়ে কম্বাশ্‌সন পূর্ণ হয়।

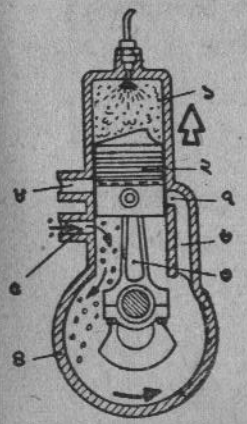

দুই স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিন

১। ইন্‌জেক্‌টর ২। পিস্টন ৩। কানেকটিং রড

৪। ক্র্যাঙ্ক কেস ৫। ইন্‌লেট পার্ট

৬। ট্রান্সফার প্রসেস ৭। ট্রান্সফার পার্ট

৮। একজস্ট পার্ট

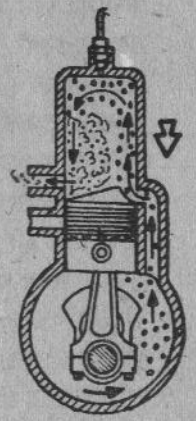

দুই স্ট্রোকযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনের নিচের দিকের স্ট্রোক

দ্বিতীয় স্ট্রোক—কম্বাশ্‌সনে পূর্ণ হবার পরই যে চাপ এবং তাপ সৃষ্টি হয় তার ফলেই পিস্টন নিচে নেমে আসে। এটিই নিচের দিকের স্ট্রোক। নিচের দিকের স্ট্রোক চলতে থাকার সময় উপর থেকে বাতাস এবং ডিজেল তেল ভিতরে

প্রবেশ করতে থাকে। তারপরই আবার প্রথম উপরের টিকের স্ট্রোক শুরু হয়।

একটি মডেল ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

সিলিণ্ডারের মোট সংখ্যা—৬

বোর—৯৬ মিলিমিটার (m m)।

স্টোক—১২০ মিলিমিটার (m m)।

মোট সিলিণ্ডার ক্যাপাসিটি ৪৭৮৮ কিউসিক সেণ্টিমিটার (C C)।

মোটামুটি হর্সপাওয়ার—৩১·৫।

ইঞ্জিনের আউটপুট (Output)—১২৫ H. P.—২৮০০ rpm-এ।

সবচেয়ে বেশী Toque—১৩ mkg—২০০০ rpm-এ।

ইঞ্জিনের ওজন (শুকনো)—৪২০ কিলোগ্রাম।

ইঞ্জিনের দ্রুতগত গতি—২৮০০ rpm।

কম্প্রেশন এর রেশিও—১৭ : ১।

কম্প্রেশনের চাপ—কম পক্ষে ২০ কিলো / প্রতি স্কোয়ার cm-এ।

কম্প্রেশনের চাপের কমবেশী—১·৫ কিলো / প্রতি স্কোয়ার cm-এ।

ফুয়েল প্রবেশ শুরু হয়—২৩° T. D. C-এর পূর্বে।

ফায়ারিং অর্ডার—১-৫-৩-৬-২-৪।

কুলিং জলের তাপ—৭৫—৯৫° সেণ্টিগ্রেড।

রেডিয়েটারের ফ্রণ্টাল এরিয়া—৩৫৫০ বর্গ সি· এম্ ।

মাল্টি হোল্ ইন্জেকশন নোজলের খোলার চাপ—২০০ +১০ কেজি / প্রতি বর্গ cm-এ।

ইন্জেকশন নোজ্লের চাপের কমবেশী—প্রতি বর্গ cm-এ ৫ কেজি।

ইন্লেট ভাল্বের ক্লিয়ারেন্স—০-২০ মিলিমিটার।

একজস্ট ভাল্বের ক্লিয়ারেন্স—০·৩-০ মিলিমিটার।

প্রত্যক্ষ (Direct) ইন্জেকশন

ডিজেল তেল সম্পূর্ণভাবে তখনই পোড়ানো যায়, যখন এটি বাতাসের

সঙ্গে মেশে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ধরনের পিস্টন ক্রাউন আবিষ্কার করা হয়েছে। এখানে নিচের চিত্রে সেটি দেখানো হল।

এতে দেখা যাচ্ছে ডিজেল তেল প্রত্যক্ষ ভাবে পিস্টন ক্রাউনের উপর inject করা হচ্ছে এর ফলে ডিজেল এবং বাতাসের মধ্যে যে মিশ্রণ ঘটে সেটি খুব সুন্দর হয়। তার ফলে জ্বালানী তেল সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় এবং ইঞ্জিনের কাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলে।

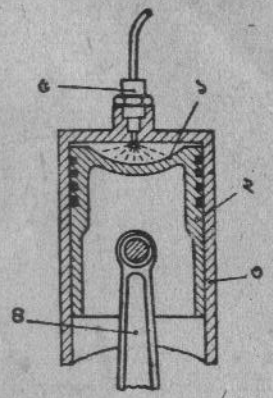

ডাইরেক্ট ইন্জেক্শন
১। পিস্টন ক্রাউন ২। পিস্টন ৩। সিলিণ্ডার ৪। কানেক্টিং রড ৫। ইনজেক্টর

সাধারণতঃ "টাটা" এবং অন্যান্য বড় ডিজেল পদ্ধতির গাড়িতে এই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন আকারের কম্বাস্শন চেম্বার

প্রত্যক্ষ injection পদ্ধতিতে পিস্টনের ক্রাউন থেকে প্রত্যক্ষভাবে তেল ইন্জেকশন দেওয়া হয়। এই কম্বাশসন্ ক্রিয়াটি চলে একটি অতি সুগঠিত চেম্বারের মধ্যে। তাকেই বলা হয় কম্বাস্শন চেম্বার। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর গাড়ীতে বিভিন্ন ধরনের এই কম্বাশ্সন চেম্বার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ইনজেকশন, কম্বাশ্সন, স্ট্রোক প্রভৃতি ক্রিয়ার পদ্ধতি একই-

ভাবে চলে, এখানে একটি চিত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওপন্ কম্বাশ্সন চেম্বার এঁকে দেখলাম।

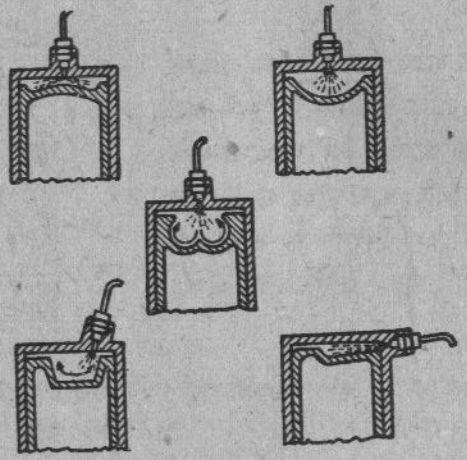

বিভিন্ন ধরনের ওপন্ কম্বাশসন্ চেম্বার

প্রিকম্বাশ্সন চেম্বার

প্রিকম্বাশ্সন চেম্বার হল সিলিণ্ডারের মাথার উপর অবস্থিত একটি পৃথক চেম্বার। পরপৃষ্ঠায় একটি চিত্রে সেটা দেখানো হল। সিলিণ্ডারে পৌঁছবার আগে এখানে একটি কম্বাশ্সন হয়ে থাকে। এই কম্বাশ্সন হবার পর ঐ বাতাস এই চেম্বার থেকে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে, এটি একটি চক্রবৎ পথে পাক খেয়ে প্রবেশ করে।

ইনজেকটর ডিজেল তেলকে কম্বাশ্সন চেম্বারের মধ্যে এই বাতাসের সঙ্গে প্রবেশ করায়। এই পদ্ধতির ফলে ডিজেল তেল সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার অবকাশ পায় এবং বাতাস ও তেলের পূর্ণ মিশ্রণ ঘটে। চেম্বারের মাথা ঠিক এমনভাবে তৈরী থাকে যাতে সিলিণ্ডারের সঙ্গে পিস্টনের প্রত্যক্ষ জোরে ধাক্কা না লাগে।

তাছাড়া এই পদ্ধতির ফলে কম তেল খরচে বেশী পরিমাণ ক্রিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং সহজেই এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

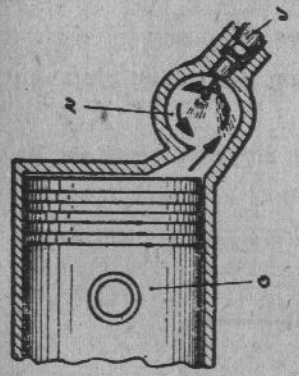

প্রিকম্বাশ্সন চেম্বার

১। ইনজেক্টর
২। প্রিকম্বাশ্সন চেম্বার
৩। সিলিণ্ডার

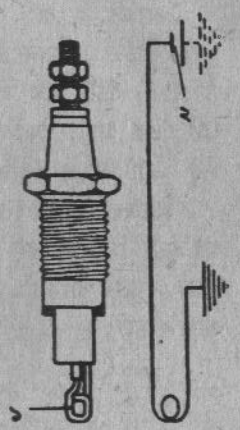

হিটার প্লাগ্

১। রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার
২। ব্যাটারী

হিটার প্লাগ

উপরে দ্বিতীয় চিত্রে হিটার প্লাগ্ এবং তার বিভিন্ন অংশও কার্য সুন্দর ভাবে বোঝানো হল। এই প্লাগ্টি কম্বাশ্সন চেম্বারের মধ্যে বসানো থাকে। এটি একটি ব্যাটারীর সাথে যুক্ত থাকে। যখন সুইচটি অন্ করা হয় তখন প্লাগের রেজিস্ট্যান্স তারটি গরম হয়ে ওঠে। ব্যাটারী থেকে কারেণ্টের প্রবাহের ফলে এরূপ হয়। এই উত্তাপ আবার কম্বাশ্সন চেম্বারকে উত্তপ্ত করে।

ইঞ্জিনটি স্টার্ট করার আগে হিটার প্লাগের সুইচটি অন্ততঃ ৩০ সেকেণ্ড ধরে স্টার্ট করা হয়। তারপর এটি বন্ধ করা হয়। তারপরেই আবার স্টার্ট করে গাড়ি চালানো শুরু করা হয়, তার ফলে ইঞ্জিন সহজেই স্টার্ট নিতে পারে।

যদি কানেকশন ব্যবস্থায় কোথাও গোলমাল থাকে, তা হলেও এই সময় তা বুঝতে পারা যায়।

ডিজেল ফুয়েল ফিড্ সিস্টেম

ডিজেল ফুয়েল ফিড্ সম্পর্কে বলার আগে ভাল ডিজেল অয়েল কেমন হওয়া উচিত তা জানতে হবে।

(১) এটি খুব হালকা হবে। (২) এটিরও Viscosity কম থাকবে। (৩) এর মধ্যে কোন নোংরা আবর্জনা বা অন্য তেলের মিশ্রণ থাকবে না। (৪) এটি সহজে প্রবাহিত হবে।

ডিজেল ফুয়েল ফিড্ সিস্টেম এমনভাবে হবে যাতে তেল সহজে প্রবাহিত হয় এবং সিলিণ্ডারের মধ্যে বা কম্বাশ্সন চেম্বারের মধ্যে এটি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে। এই পদ্ধতির দ্বারা এটি সহজে জ্বলে উঠবে এবং উপযুক্ত তাপ ও চাপ সৃষ্টি করবে।

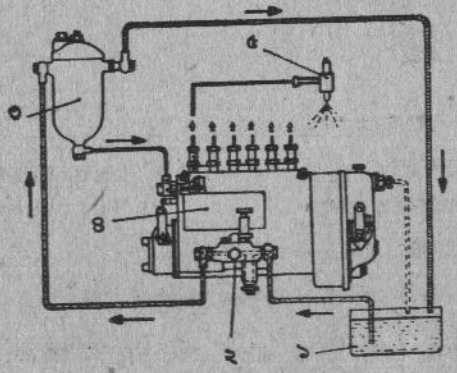

ডিজেল ফুয়েল ফিড্ সিস্টেম

১। ট্যাঙ্ক ২। ফিড্ পাম্প ৩। ফিল্টার
৪। ইন্জেক্শন পাম্প ৫। ইনজেক্টর

ডিজেল ট্যাঙ্ক থেকে ফিড্ পাম্পের মধ্য দিয়ে চাপে তেল লাইনের মধ্য প্রবাহিত হবে। এর মধ্যে উপযুক্ত ফিল্টার ব্যবস্থা থাকবে যাতে তেলে যৎসামান্য ময়লা থাকলেও তা তেলের লইনে প্রবেশ করতে না পারে।

পাম্প দ্বারা চাপ সৃষ্টির ফলে ডিজেল অয়েল লাইনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তারপর এটি ইনজেকশন পাম্পে আসে। ইনজেকশন পাম্পে আবার নূতন চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে এটি ইনজেকটরে প্রবেশ করে। ইনজেকটরে এসে এটি যথানিয়মে প্রিকম্বাশ্সন চেম্বার এবং কম্বাশ্সন চেম্বারে প্রবেশ করে।

কম্বাশ্সন চেম্বারে তেল এবং বাতাস প্রবেশের ফলেই দুই স্ট্রোক বা চার স্ট্রোক দুই ধরনের ইঞ্জিনই কাজ করতে সক্ষম হয়। অতিরিক্ত যে তেল বাঁচে তা আবার লাই দিয়ে ট্যাঙ্কে ফিরে আসে।

ফুয়েল ইনজেক্শন পাম্পের গঠন ও কার্যকারিতা

অনেকগুলি প্লাঞ্জার ধরনের পাম্প দ্বারা এগুলির Unit গঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক সিলিণ্ডারে একটি করে পাম্প থাকে। যে ইঞ্জিনে যতগুলি সিলিণ্ডার থাকবে সেখানে ততগুলি পাম্প থাকে।

প্লাঞ্জারকে কাজ করায় একটি ক্যাম্শ্যাফ্ট্। প্রতিটি ক্যাম্ এবং প্লাঞ্জারের মধ্যে একটি করে রোলার ট্যাপেট থাকে। এই রোলার Tappetটি ক্যামের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি হেলিক্যাল্ স্প্রীং দ্বারা। প্রত্যেক প্লাঞ্জার ব্যারেলের উপরের প্রান্তের দুটি পোর্টের সঙ্গে সাক্শন চেম্বার যুক্ত থাকে।

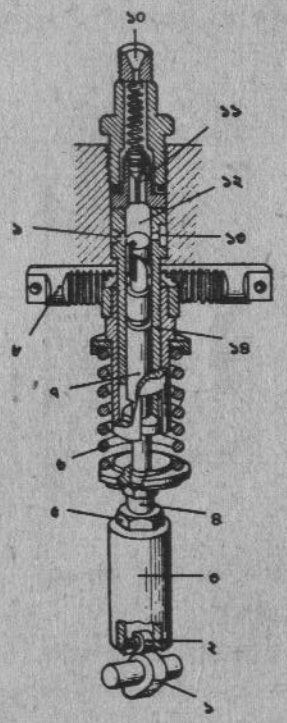

ফুয়েল ইঞ্জিন প্লাঞ্জার:

১। ক্যাম্ ২। রোলার ৩। ট্যাপেট ৪। স্ক্রু ৫। লক্ আউট

৬। স্প্রীং ৭। প্লাঞ্জার ৮। কণ্ট্রোল রড ৯। ইন্‌লেট্‌ পোর্ট ১০। ডেলিভারী প্যাসেজ ১১। ডেলিভারী ভাল্‌ব ১২। সাকশন চেম্বার ১৩। ইন্‌লেট্‌ পোর্ট ১৪। ব্যারেল

ডিজেল তেল ফিড পাম্প থেকে নেমে আসে। যেটা পোর্ট দুটির মধ্য দিয়ে প্লাঞ্জারে সরবরাহ করা হয়।

সাক্‌শন স্ট্রোকের সময় এই প্লাঞ্জার যখন তলায় থাকে তখন দুটি পোর্ট খোলা থাকে। সে সময় ব্যারেলটি ফুয়েল তেলে পূর্ণ হয়। যখন প্লাঞ্জার উপরে ওঠে, তখন উপরের তেলে প্লাঞ্জার চাপ সৃষ্টি করে থাকে। ডেলিভারী ভাল্‌ব দিয়ে ইন্‌জেক্‌টর নোজ্‌লে এই তেল ঠেলে বের করে দেওয়া হয়।

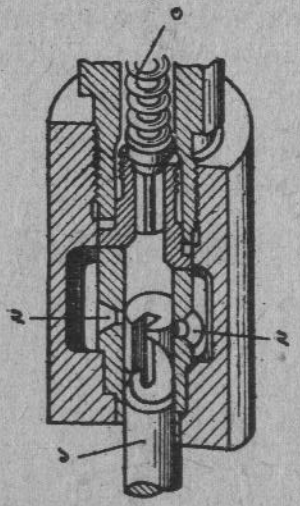

প্লাঞ্জার দ্বারা পোর্ট বন্ধ করা
১। প্লাঞ্জার ২। পোর্ট
৩। ডেলিভারী ভাল্‌ব স্প্রীং

সব সময় প্লাঞ্জারের স্ট্রোক সমান থাকে। কিন্তু গতি অনুযায়ী ইন্‌জেকশনের পরিমাণ কম বেশী হয়ে থাকে। প্লাঞ্জারের পোজিশনের পরিবর্তন করে গতির এই পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

কিভাবে প্লাঞ্জারের দ্বারা পোর্ট বন্ধ করা বা খোলা যায় তা চিত্র দ্বারা বোঝানো হলো।

প্লাঞ্জারের অবস্থান অনুযায়ী তেলের সরবরাহ কম বা বেশী করা যায়।

প্লাঞ্জারের একটি Helical edge থাকে। যখন প্লাঞ্জার উপর দিকে ওঠে তখন দুটি পোর্টই বন্ধ হয়ে যায়। তখন ভাল্‌ব ওঠে না। যদি ব্যারেলে কোনও তেল থাকে তাও পোর্ট হোল্‌ দিয়ে বের হয়ে যায়।

তারপর আবার যখন প্লাঞ্জার নিচে নেমে আসে, তখন পোর্ট খুলে যায় এবং জ্বালানী তেল পোর্ট দিয়ে প্রবেশের পথ পায়।

এই একইভাবে একবার প্লাঞ্জার ওঠে, একবার নামে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্ট হোল্‌ বন্ধ হয় একবার এবং একবার খুলে যায়।

ইঞ্জিনের পাওয়ার আউটপুটের নিয়ন্ত্রণ (Control)

ইঞ্জিনের পাওয়ার আউটপুটের নিয়ন্ত্রণ ডিজেল ইঞ্জিনের পক্ষে একটি বিশেষ অপরিহার্য অংশ। পেট্রোল ইঞ্জিনের সঙ্গে এ বিষয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

একটি কণ্ট্রোল রড দ্বারা প্লাঞ্জারের অবস্থান vary করানো যায়।

ঐ কণ্ট্রোল রডের সঙ্গে একটি র‍্যাক্‌ ও পিনিয়ন ব্যবস্থা থাকে। এই রডটি অপারেট করে প্লাঞ্জারের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো হয়।

প্লাঞ্জারের অবস্থান পরিবর্তন করে ইন্‌জেক্‌শন্‌ নোজ্‌লের সরবরাহ কমানো বা বাড়ানো যায়, কিংবা বন্ধ করা যায়। এভাবে ইঞ্জিন বন্ধ করাও যায়।

এখানে একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে কিভাবে ভাল্‌বের মধ্য দিয়ে জ্বালানী তেল প্রবাহ প্রবেশ করছে। অন্য চিত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রুভের মাঝ দিয়ে জ্বালানী তেল কিভাবে পোর্টের মধ্যে প্রবেশ করছে।

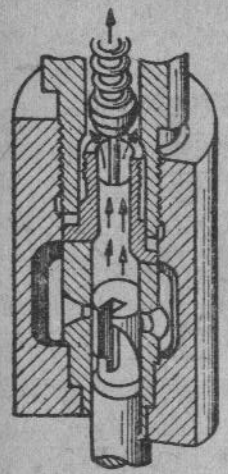

ভাল্‌বের মধ্য দিয়ে জ্বালানী তেল প্রবাহ প্রবেশ করছে

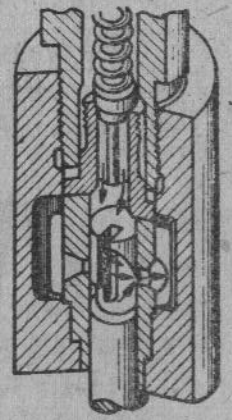

জ্বালানী তেল পোর্টের মধ্যে প্রবেশ করছে গ্রুভের মাঝ দিয়ে

এই ভাবে ইঞ্জিন চালানো, বন্ধ করা আর তার গতি কমানো বা বাড়ানো যায়।

নিচের চিত্রে কণ্ট্রোল রডের মুভমেণ্ট এবং সেই অনুসারে প্লাঞ্জারের অবস্থানের পরিবর্তন দেখানো হল।

এখানে দেখা যাচ্ছে পিনিয়নটি কেমন খাঁজ কাটা ভাবে থাকে। তার সঙ্গে তার রেখে কণ্ট্রোল রডেও খাঁজ কাটা থাকে।

এইভাবে কণ্ট্রোল রডের নড়াচড়ার সঙ্গে কিভাবে প্লাঞ্জারের যোগ থাকে তা ছবিতে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে।

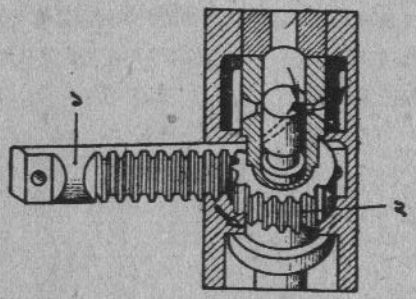

কণ্ট্রোল রডের মুভমেণ্ট এবং প্লাঞ্জারের অবস্থানের পরিবর্তন

এখন আমরা প্লাঞ্জারের বিভিন্ন অবস্থানের সম্পর্কে আলোচনা করছি। ছয়টি চিত্রের দ্বারা প্লাঞ্জারের বিভিন্ন অবস্থান দেখানো হচ্ছে।

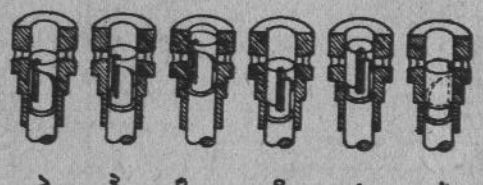

প্লাঞ্জারের বিভিন্ন পোজিশন

(১) এখানে প্লাঞ্জার স্ট্রোকের সবচেয়ে তলায় অবস্থান করছে।

(২) এখানে প্লাঞ্জার তার অবস্থানের দ্বারা দুটি পোর্টকেই বন্ধ করে দিচ্ছে।

(৩) সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সাপ্লাই এখানে দেখানো হচ্ছে।

(৪) প্লাঞ্জার এখানে পরিপূর্ণ লোড (Load) সহ কাজ করছে।

(৫) এখানে প্লাঞ্জার আংশিক লোড সহ কাজ করছে।

(৬) এখানে ইনজেকটরের মধ্যে জ্বালানী তেল সরবরাহ করা হচ্ছে না, অর্থাৎ ইঞ্জিন বন্ধ করা হচ্ছে।

এইসব বিভিন্ন অবস্থান দ্বারা প্লাঞ্জার বিভিন্ন ক্রিয়া পদ্ধতি চালিয়ে থাকে।

ফুয়েল ইনজেকেশন ব্যবস্থা পরীক্ষা

ফুয়েল ইনজেকশন ব্যবস্থা ঠিকমত হচ্ছে কি না সেটা ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার পদ্ধতি পেট্রোল ইঞ্জিনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সাধারণতঃ দুইটি পৃথক ব্যবস্থার দ্বারা এটি করা হয়ে থাকে।

(১) ফুয়েল পাম্প যন্ত্রগুলির Calibration ব্যবস্থা।

(২) ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের Phasing ব্যবস্থা।

(১) **কেলিব্রেশান ব্যবস্থা**—ফুয়েল ইনজেকশান পাম্প ভালভাবে কাজ করার জন্য কেলিব্রেট করা হয়। এইজন্য একটি টেস্টিং ব্যবস্থা থাকে। টেস্টিং-এর জন্য পাম্পটি প্রথমে টেস্টিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারপর ইঞ্জিনটি না চালিয়ে ওটি 2000 গতিতে ঘূর্ণায়মান করা হয়। এই অবস্থায় ডিজেল তেল কি পরিমাণ সাপ্লাই হচ্ছে তার পরিমাপ করা হয়। যদি এই পরিমাণ মোটামুটি ঠিক থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ইনজেকশন ব্যবস্থা ঠিক আছে। যদি এটি অনেকটা কম বা বেশী হয় তা হলে বুঝতে হবে যে ইনজেকশন ব্যবস্থার কিছু মেরামতী প্রয়োজন।

(২) **ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের Phasing ব্যবস্থা**—ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের গতির অর্ধেক গতিতে পাম্পের ক্যামশ্যাফট ঘুরতে থাকে। সেইজন্য চার সিলিণ্ডারযুক্ত ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে প্লাঞ্জার থেকে জ্বালানী তেলের সাপ্লাই নব্বই ডিগ্রী পার্থক্যে হবে। তার অর্থ ফুয়েল ডেলিভারীর সময়সীমা এবং কাট অফ এর মধ্যে একটি সিলিণ্ডার থেকে অন্যটি নব্বই ডিগ্রী পার্থকে থাকবে। ফুয়েল পাম্পগুলি ঠিকমত নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কাজ করছে কিনা তা ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। একটি পাম্প প্রথমে ভাল করে চেক করে দেখতে হবে, তারপর তার সঙ্গে মাত্রা বজায় রেখে বিভিন্নগুলির কাজ কিভাবে চলছে সেগুলি ঠিকমত

লক্ষ্য করতে হবে। এই লক্ষ্য করার সময় প্লাঞ্জার এবং ইনজেকশন পাম্প প্রত্যেকটির কাজই সঠিক হচ্ছে কিনা ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

প্রতিটি প্লাঞ্জারের ওঠানামা, প্রতিটি ইনজেকশন পাম্পের দ্বারা ফুয়েল সাপ্লাই প্রভৃতি ঠিকমত সমান গতিতে হচ্ছে কিনা তা বোঝা যাবে যদি এই phasing ঠিক থাকে।

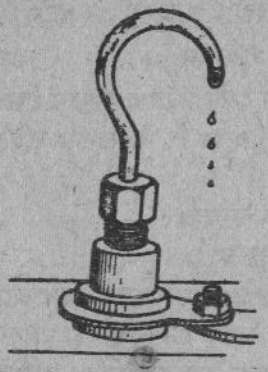

সোয়ান নেক্ পাইপ

পোর্ট বন্ধ হওয়া, পোর্ট খুলে যাওয়া ভাল্বগুলির কাজ, ভাল্ব স্প্রিঙের কাজ সব কিছুই ঠিকমত অনুসন্ধান করতে হবে। এইগুলি পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় "সোয়ান নেক পাইপ"। এটি পাম্প ব্যারেলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যখন প্লাঞ্জার ওপরে ওঠে তখন এর মাঝ দিয়ে ফুয়েল সাপ্লাই ঠিকমত হতে দেখা যায়। যখন প্লাঞ্জার বন্ধ হয় তখন এর মধ্য দিয়ে কোন ফুয়েল তেল বের হবে না। এইভাবে প্রতিটি অংশই একে একে পরীক্ষা করা হবে। যদি কোন অংশে এটি ঠিকমত না হয় তাহলে সেটি খুলে মেরামত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ফুয়েল ফিড্ পাম্প

ফুয়েল ফিড্ পাম্পের কাজ হল, ডিজেল ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানী তেল নিয়ে ফুয়েল ইনজেকশান পাম্পে সরবরাহ করা, এখানে একটি চিত্রের দ্বারা সেটি বোঝানো হল। এর মধ্যে থাকে—

(১) একটি ব্যারেল (২) একটি প্লাঞ্জার (৩) প্লাঞ্জা রিটার্ন স্প্রিং (৪) স্পিণ্ডল (৫) রোলার ট্যাপেট (৬) সাকশন পাম্প এবং ডেলিভারী ভাল্ব (৭) একসেণ্ট্রিক (৮) প্রেসার চেম্বার

ফুয়েল পাম্প পরিচালিত হয় ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের ক্যাম্শ্যাফটের সাহায্যে। যখন প্লাঞ্জার ভেতরের দিকে প্রবেশ করে তখন তার রিটার্ন স্প্রিঙের

ক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় ডিজেল ট্যাঙ্ক থেকে ডিজেল তেল সাকশন চেম্বারে টেনে নেওয়া হয়। তারপর সাকশন ভাল্বটি খুলে যায় এবং ডেলিভারী

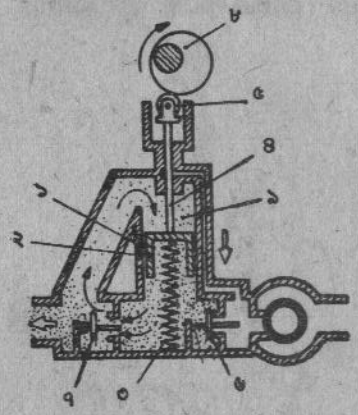

ফিড্ পাম্প

১। ব্যারেল ২। প্লাঞ্জার। ৩। প্লাঞ্জার রিটার্ন স্প্রীং ৪। স্পিণ্ডল ৫। রোলার ট্যাপেট ৬। সাক্শন পাম্প ৭। ডেলিভারী ভাল্ব ৮। এক্সেন্ট্রিক ৯। প্রেসার চেম্বার।

ভাল্বটি বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে প্লাঞ্জারের ক্যাম্পশ্যাফটের সঙ্গে সমান তাল রেখে ফুয়েল ফিড পাম্পের ক্রিয়া সমানভাবে চলতে থাকে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে একটি ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য ক্রিয়া ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। সাকশন ভাল্ব এবং ডেলিভারী ভাল্ব একটি অন্যটির পরিপূরক। একটি খুললে অন্যটি বন্ধ হয় এবং অন্যটি খুললে পূর্বেরটি বন্ধ হয়। এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে ক্রিয়া।

ফুয়েল ফিড পাম্পের বিভিন্ন অংশ—ফুয়েল ফিড পাম্পের বিভিন্ন অংশগুলি একটি চিত্রে পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হল। এগুলি একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে।

ফুয়েল ফিড পাম্পের বিভিন্ন অংশ হল—

(১) হাউসিং ব্যবস্থা (২) পাম্প ব্যবস্থা

(৩) প্রেসার স্পিণ্ডল-এর দ্বারা পাম্প প্লাঞ্জারের সঙ্গে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(৪) প্লাঞ্জার স্প্রিং (এই স্প্রিং প্লাঞ্জারের সঙ্গে আটকানো থাকে)।

(৫) স্ক্রু প্লাগ (৬) রোলার ট্যাপেট (৭) রোলার

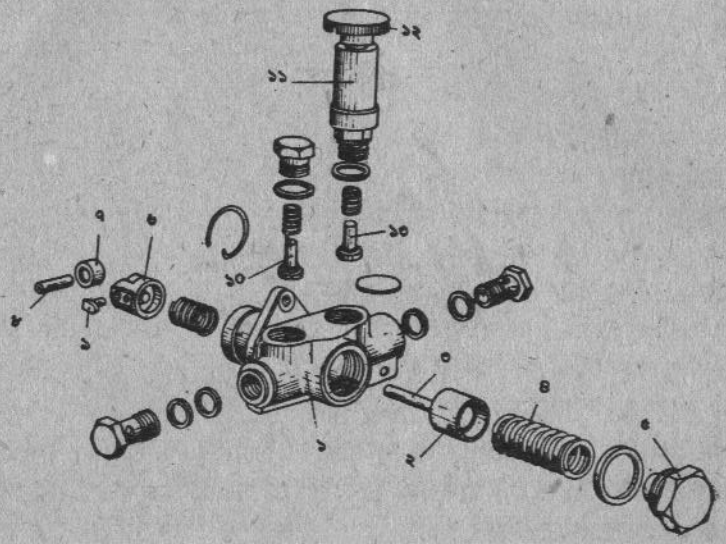

১। হাউসিং ২। পাম্প ৩। প্রেসার স্পিণ্ডল ৪। প্লাঞ্জার স্প্রীং ৫। স্ক্রু প্লাগ ৬। রোলার ট্যাপেট্ ৭। রোলার ৮। রোলার পিন ৯। স্লাইডার ১০। প্রেসার ভাল্‌ব ১১। হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প ১২। হ্যাণ্ডেল ১৩। সাক্‌শন্ ভাল্‌ব।

(৮) রোলার পিন—এটির দ্বারা রোলার ক্রিয়াশীল করা হয়।

(৯) সাপ্লাই তার—এটিকে গাইড পিনও বলা হয়।

(১০) প্রেসার ভাল্‌ব—এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ।

(১১) হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প। (১২) হ্যাণ্ডেল। (১৩) সাকশন্ ভাল্‌ব।

হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প

হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প সাকশন ভাল্‌বের মাথায় অবস্থিত থাকে। এটি ফুয়েল

ফিড সিস্‌টেমের একেবারে উপরে থাকে।

এটি ফুয়েল ফিড সিস্‌টেমকে অপারেট করতে বিশেষ সাহায্য করে। যখন ইঞ্জিন চালানো হয় না তখন এই পাম্পের দ্বারা কিছু কিছু জ্বালানী তেল সরবরাহ করা যায়।

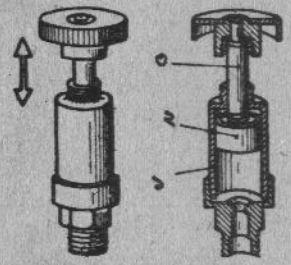

হ্যাণ্ড প্রাইমিং পাম্প

১। ব্যারেল ২। প্লাঞ্জার ৩। স্পিণ্ডল্

একটি ব্যারেল, একটি প্লাঞ্জার এবং একটি স্পিণ্ডল দ্বারা এটি গঠিত হয়। স্পিণ্ডলটি চালনা করলে যথেষ্ট পরিমাণ তেল সাপ্লাই করা সম্ভব হয়। তার ফলে ইনজেকশন পাম্প কার্যকরী হয়। এটি ডিজেল ইনজেকশন পাম্পটি পরীক্ষা করার জন্য সাহায্য করে। পরীক্ষা করা শেষ হলে এটি ভালভাবে স্ক্রু দ্বারা আটকে ঠিকমত বসিয়ে দিতে হয়।

ইনজেকটরের বিশেষ কথা

ইনজেকটর হল একটি যন্ত্র যার দ্বারা ফুয়েল তেল সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সবসময় ইনজেকটর একান্ত প্রয়োজন—কিন্তু পেট্রল ইঞ্জিন পদ্ধতিতে এটির প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ একটি ইনজেকটরের মধ্যে পাঁচটি প্রধান অংশ থাকে।

(১) নোজ্‌ল (২) নোজ্‌ল ভাল্‌ব (৩) স্প্রিং (৪) ইনজেকটরের বডি (৫) লিঙ্ক অফ্ পাইপ।

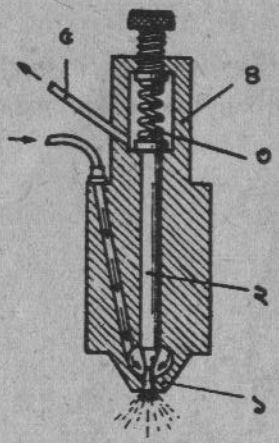

ইনজেক্টরের বিভিন্ন অংশ

১। নোজ্‌ল ২। নোজ্‌ল ভাল্‌ব ৩। স্প্রিং
৪। বডি ৫। লিঙ্ক অফ্‌ পাইপ

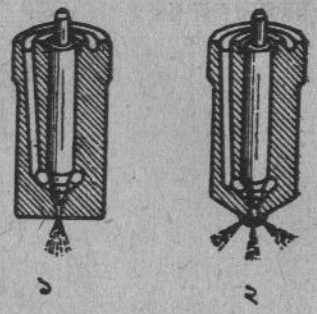

দুই ধরনের নোজল

১। সিঙ্গল হোল
২। মাল্টি হোল

বিভিন্ন ধরনের ইনজেকটর নোজ্‌ল—নানা ধরনের ফুয়েল ইনজেকটর নোজ্‌ল বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

সিঙ্গল হোল—এগুলিতে নোজ্‌ল-এর আগায় মাত্র একটি ছিদ্র থাকে বলে একে সিংগল হোল বলা হয়।

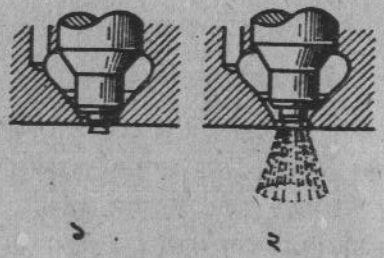

পিন্টল নোজ্‌ল

১। বন্ধ অবস্থায় ২। খোলা অবস্থায়

এই একটি মাত্র ছিদ্র দিয়েই ফুয়েল তেল ছড়িয়ে পড়ে, ছিদ্রটি বড় থাকার জন্য এবং চাপ বেশী থাকার জন্য এটি বেশ জোরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইক্ষেত্রে ফুয়েল তেল খাড়াভাবে জোরে সোজা নিচের দিকে নেমে আসে।

মালটি হোল—এই নোজ্‌লগুলিতে আগায় তিনটি বা চারটি বা তার বেশী ছিদ্র থাকে, বিভিন্ন ইঞ্জিন অনুযায়ী এই ছিদ্রের সংখ্যা বিভিন্ন রকম হয়। অনেক সময় একটি বৃত্তের আকারে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি দিয়ে তেল সিলিণ্ডারের ভেতর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক এক কোম্পানীর গাড়িতে এগুলি এক এক রকম ভাবে থাকে।

পিন্টল নোজ্‌ল

এটি অন্য আর এক ধরনের নোজ্‌ল পদ্ধতি। এতে নোজ্‌লের আগার ভাল্‌বে একটি পিন বা পিন্টল লাগনো থাকে। এই জন্যই এর নাম হয়েছে পিন্টল নোজ্‌ল। পর পর দুটি চিত্রে দুই ধরনের পিন্টল নোজ্‌ল দেখানো হল। পিন্টল নোজ্‌ল তার ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে তার ভালবের উপর নির্ভর করে সম্পন্ন করে থাকে।

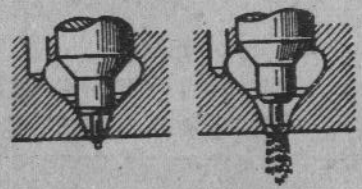

দ্বিতীয় ধরনের পিন্টল নোজ্‌ল

১। বন্ধ অবস্থায় ২। খোলা অবস্থায়

১ম চিত্রে নোজলের পিনটি মোটা হবার জন্য তেলটি বড় ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।

২য় চিত্রে পিনটি সরু হবার জন্য ফুয়েল তেল খাড়া ভাবে এবং জোর ভাবে নেমে আসছে।

এই নোজ্‌লের সুবিধা এই যে, এতে গর্তের মধ্যে কার্বন বিশেষ জমতে পারে না। তার ফলে অন্য নোজ্‌লের ক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে পারে এবং তা মেরামত করার প্রয়োজন হয়, এতে তা হয় না। এটি সবচেয়ে আধুনিক-তম নোজ্‌ল পদ্ধতি।

ডিলে নোজ্‌ল

এটি অন্য এক ধরনের নোজ্‌ল পদ্ধতি যাতে ফুয়েল তেল ধীরে ধীরে কমে বা বাড়িয়ে চেম্বারের মধ্যে পাঠানো সম্ভব হয়। এখানে একটি চিত্রে সেটি দেখানো হল। এই নোজ্‌ল যেমন সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়, তেমনি এর মুখটি একটু একটু করে খুলতে পারা যায় এবং তার পর এটি সম্পূর্ণ রূপে ইচ্ছামত খুলে দিয়ে পূর্ণ গতিতে চালনা করা যায়।

ডিলে নোজ্‌ল

১। বন্ধ অবস্থায় ২। কিছু খোলা অবস্থায় ৩। পূর্ণ খোলা অবস্থায়

আজকাল কিছু কিছু আধুনিক ইঞ্জিনে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপরে যে সকল নোজ্‌ল-এর কথা বলা হল, তা ছাড়াও আরও নানা ধরনের সুবিধা অসুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন ইনজেকশন নোজ্‌ল আবিষ্কারের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন কোম্পানী এই সব নিয়ে গবেষণা করছেন।

ইনজেকটর নোজ্‌ল

ইনজেকটর নোজ্‌ল কিভাবে টেস্ট বা পরীক্ষা করা হয় তা এখানে একটি চিত্রের দ্বারা বোঝানো হল। টেস্টারের মধ্যে যে সব প্রধান অংশগুলি থাকে তা হল, একটি ট্যাঙ্ক, একটি পাম্প, প্রেসার গেজ, হ্যাণ্ডেল, বাউল, কন্ট্রোল ভাল্‌ব।

যে ইনজেকটরটি টেস্ট করা হবে সেটি এই যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করা হয়,

জ্বালানী তেল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ভাল্‌ব থাকে। যখন ভাল্‌বটি খোলা হয় এবং হ্যাণ্ডেলটি হঠাৎ জোরে চাপ দেওয়া হয়, তখনই টেস্ট শুরু হয়। এর

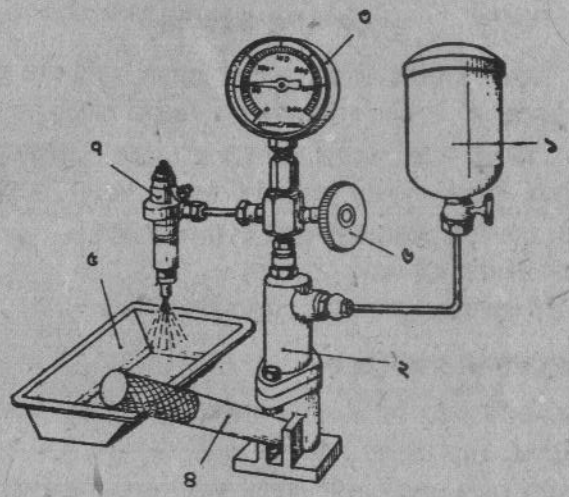

ইনজেকটর নোজল টেস্টিং

১। ট্যাঙ্ক ২। পাম্প ৩। প্রেসার গেজ ৪। হ্যাণ্ডেল্‌ ৫। বাউল

৬। কন্ট্রোল ভাল্‌ব ৭। যে ইনজেকটর টেস্ট হচ্ছে

ফলে ইনজেকটরের মধ্যে তেল স্প্রে করে প্রবেশ করানো হয়। তারপর প্রেসার গেজের রিডিং দেখা হয়। যদি সঠিক রিডিং পাওয়া যায় তবে ইনজেকটরটি ঠিক আছে। নাহলে ইনজেকটরটি মেরামত করার প্রয়োজন হয়।

টাইমিং অফ্‌ ফুয়েল ইনজেকশন

বিভিন্ন সিলিণ্ডারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জ্বালানী তেল প্রবেশ করানো হয়। এটি ইঞ্জিনের কাজ ঠিকমত চালনা করানোর পক্ষে প্রয়োজন।

চার সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনের বেলায় যে সময় অন্তর অন্তর তেল প্রবেশ করানো হয় দুই সিলিণ্ডার ইঞ্জিনের বেলায় এই সময় পৃথক হয়ে থাকে।

সময় মনে রাখতে হবে যে ইঞ্জিনের প্রতি অংশের কাজ একটি নির্দিষ্ট

ক্রিয়াচক্র অনুযায়ী চলছে। সুতরাং এই সময়ের হেরফের হলে সমস্ত ক্রিয়া-চক্রেরই গোলমাল হবে।

ফুয়েল পাম্প গভার্নার

সমস্ত ডিজেল ইঞ্জিনেই এই ফুয়েল পাম্প গভার্নার একটি অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র। গভার্নার-এর উদ্দেশ্য হল গাড়ির এবং ইঞ্জিনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই গভার্নার ডিজেল ফুয়েল পাম্পের সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। ড্রাইভারের পায়ের এ্যাক্সিলিরেটর ইঞ্জিনের গতিকে মাঝামাঝি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু খুব দ্রুত গাড়ি চললে গভার্নারের প্রয়োজন সবসময়ই দেখা দিতে পারে।

গভার্নার প্রধানতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে—

(১) সেণ্ট্রিফোগাল গভার্নার (২) নিউমেটিক গভার্নার—

সেণ্ট্রিফোগাল গভার্নার :—

এখানে একটি চিত্রে সেণ্ট্রিফোগাল গভার্নার-এর বিভিন্ন অংশ্য দেখানো হল। পাম্পের ক্যাম্ শ্যাফট দুটি বল ওয়েট-এর সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। যখন শ্যাফটি ঘোরে যখন একই গতিতে ক্যাম্ শ্যাফটের সঙ্গে সঙ্গে বলওয়েট

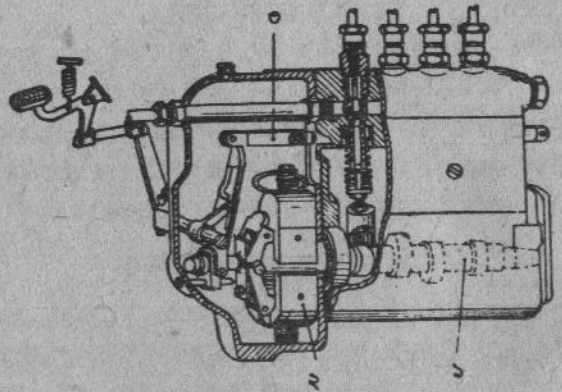

সেণ্ট্রিফোগাল গভার্নার (ফুয়েল পাম্পযুক্ত)

১। ক্যাম্ শ্যাফট্ ২। বল্ ওয়েটস্ ৩। কণ্ট্রোল রড

গুলিও ঘুরতে থাকে। সেণ্ট্রিফোগাল গতির জন্য বলগুলি বাইরের দিকে ছিটকে গিয়ে ঘুরতে থাকে।

এই বলগুলি একটি কলার এবং লিঙ্ক মেকানিজমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যখন বলগুলি ঘুরতে থাকে তখন তা কণ্ট্রোল রডের গতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তার ফলে ফুয়েল পাম্প নিয়ন্ত্রিত হয়।

যখন কণ্ট্রোল রড বাঁদিকে ঘোরে তখন গতি বন্ধ হয়ে আসে। এই সময় জ্বালানী তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে ইঞ্জিনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে গভার্নার এবং কোন সময়েই উচ্চতম গতিতে সহজে গাড়িকে উঠতে দেয় না—আবার গতি কম বেশী করতে সাহায্য করে। এখানে একটি ছবির দ্বারা কণ্ট্রোল রডের মুভমেণ্ট দেখানো হল।

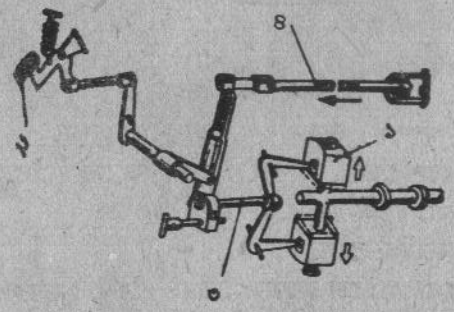

সেণ্ট্রাল রডের মুভমেণ্ট

১। বল্ ওয়েট্ ২। এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেল্ ৩। রড ৪। কণ্ট্রোল রড

এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেল কণ্ট্রেল রডের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তার সঙ্গে জ্বালানী তেলের পাম্পের যোগ থাকে। এই ভাবে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ড্রাইভার গাড়ীর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

নিউমেটিক গভার্নার

এটি আর এক ধরনের গভার্নার, যা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টির দ্বারা কাজ করে থাকে। ইঞ্জিনের ইনলেট পাইপের মধ্য থেকে বাতাসকে সাকশন করে টেনে নিয়ে এই ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা হয়।

এই ভ্যাকুয়ামের প্রধান দ্'টি অংশ।

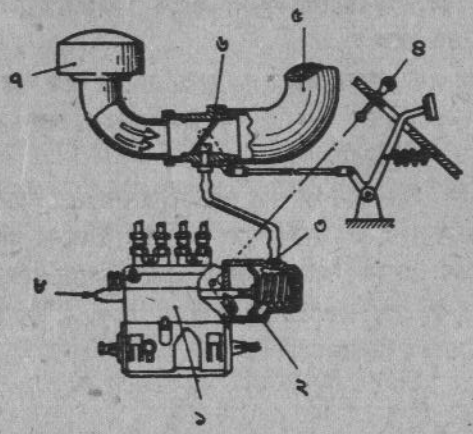

নিউমেটিক গভার্নার

১। পাম্প ২। ডায়াফ্রাম ৩। ভ্যাকুয়াম চেম্বার

৪। ড্যাশ বোর্ডে কণ্ট্রোল স্টপ ৫। ইন্‌লেট ম্যানিফোল্ড

৬। বাটারফ্লাই ভাল্‌ব ৭। এয়ার ফিল্‌টার

৮। ফ্য়েল এন্ট্রান্স

১ম অংশটি হল এয়ার ফ্লো কন্ট্রোল ইউনিট—যেটি ইনডাকশন সাইডে হয়ে থাকে। অন্য অংশটি হল ডায়াফ্রাম ইউনিট—সেটি ফ্য়েল ইনজেকশন পাম্পের সাথে যুক্ত থাকে।

ইনডাকশান অংশে পায়ের এ্যাক্সিলিরেটর দ্বারা থ্রোটলটি অপারেট করা হয়। এটি ডায়াফ্রাম স্প্রিং ইউনিটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে।

এখানে একটি চিত্রে নিউমেটিক গভার্নার বিস্তৃত ভাবে এঁকে দেখানো হয়েছে।

যখন ইঞ্জিনটি চাল্ থাকে এবং গাড়ি চলতে থাকে তখন এয়ার ইনলেট পাইপের মাঝ দিয়ে বাতাস সাকশন করে ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। তার ফলে ভিতরে কিছ্টা ভ্যাকুয়ামের স্ৃষ্টি হয়। সেটি আবার ডায়াফ্রামের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এবং স্প্রিংয়ের উপরেও তার ক্রিয়া হয়।

ডায়াফ্রামের একদিকে একটি স্প্রিং থাকে।—যা পাম্পের কন্ট্রোল রডের সঙ্গে অন্যদিকে যুক্ত থাকে। যখন ডায়াফ্রামটি নড়াচড়া করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে একই ভাবে কণ্ট্রোল রডটিও নড়াচড়া করে।

যখন এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেলে চাপ দেওয়া হয় তখন থ্রোটলটি খ্লে যায়। সেখানে ভ্যাকুয়াম স্ৃষ্টি হয়। সেটি ডায়াফ্রামে সঞ্চারিত হয়।

ভ্যাকুয়ামের জন্য ডায়াফ্রামের একদিকে চাপ স্ৃষ্টি হয় আবার কণ্ট্রোল রডকে পাম্পের ডানদিকে আকর্ষণ করে। এই ব্যবহার দ্বারা কম ফুয়েল খরচায় বেশী পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়।

পাম্প স্টার্ট করার সময় কণ্ট্রোল রড সবচেয়ে বেশী স্থির পোজিশানে থাকে। তার ফলে ইনজেকটরে ফুয়েল সাপ্লাই সব থেকে বেশী থাকে। যখন এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেলে চাপ দেওয়া হয় তখন রডটি ডানদিকে টান পড়ে। এই পদ্ধতির দ্বারা তেলের সাপ্লাই ক্রমশ কমে আসে।

কিন্তু এই অবস্থায় কণ্ট্রোল রড জোরে নড়াচড়া করতে পারে না। এর দ্বারা কেবল ফুয়েল সাপ্লাই কণ্ট্রোল করা হয়। তার পর এক্সিলিরেটর ঠিকমত চালাতে শ্র্ করলে ধীরে ধীরে গাড়ী চালানো হয় এবং ইচ্ছামত গতি নিয়ন্ত্রণ করে কম বা বেশী গতিতে গাড়ী চালানো সম্ভব হয়। গাড়ীর গতির কম বেশীর উপরেতে এবং গাড়ীর মাঝে মাঝে গতি বিহীন অবস্থায় থেমে থাকার উপরে গাড়ীর তেল খরচ অনেকটা নির্ভর করে।

ইঞ্জিনের গতির বৃদ্ধি—যখন এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেলে সম্প্র্ণ চাপ দেওয়া হয়, তখন বাটারফ্লাই ভাল্‌ব খ্লে যায়। ভ্যাকুয়াম কমে যায়, ডায়াফ্রাম স্প্রিংয়ের উপরে প্রবল চাপ দেয়। এর ফলে কণ্ট্রোল রড সবচেয়ে বেশী জোরে ঘ্রতে থাকে। তার ফলে ইঞ্জিনের গতি প্রচন্ড বেড়ে যায়।

কিন্তু ইঞ্জিনের গতিব্দ্ধির একটা সীমারেখা আছে। তার বেশী গতি কখনও বাড়ে না। বিভিন্ন কোম্পানীর ইঞ্জিনের পক্ষে এটি প্রায় এক হলেও সামান্য হেরফের হতে পারে।

ব্যাটারী

ব্যাটারীর উদ্দেশ্য হল এনার্জী সঞ্চয় করা। এটি ডায়নামোতে ইলেকট্রিক এনার্জীর যোগাযোগ ঘটায়। ইলেকট্রিক এনার্জী গাড়ীতে সবসময় প্রয়োজন

হয়। যখন ইঞ্জিন ঠিকমত কাজ করে না, তখন স্টার্টার, ইগনিশান ব্যবস্থা, লাইটিং ব্যবস্থা, প্রভৃতি সবকিছুই চালায় ব্যাটারী এবং ডায়নামো, তা ছাড়াও রাতের বেলা গাড়ী চালাতে গেলে গাড়ীর অপরিহার্য অংশ হচ্ছে তার আলোক ব্যবস্থা। রাতের বেলা অন্য কোন সিগন্যাল কেউ দেখতে পায় না। তখন আলোর সিগন্যাল বা সংকেতের মাধ্যমে বিভিন্ন গাড়ীর মধ্যে সংযোগ আদান প্রদান চলে।

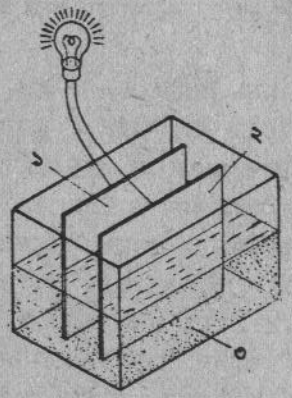

ব্যাটারীর গোড়ার কথা

১। পজিটিভ ইলেকট্রোড ২। নেগেটিভ ইলেকট্রোড
৩। ইলেকট্রোলাইট

ব্যাটারীর মূল কথা :—উপরে একটি চিত্রের দ্বারা ব্যাটারী তৈরী গোড়ার কথা বোঝানো হল। ব্যাটারীতে অনেকগুলি সেল থাকে। প্রত্যেকটি সেলে যা প্রধান অংশ থাকে তা হল—

(১) পজিটিভ ইলেকট্রোড (২) নেগেটিভ ইলেকট্রোড (৩) ইলেকট্রোলাইট।

যে কোন সেলে এই তিনটি বস্তু থাকলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইলেক-ইলেকট্রোডের সঙ্গে দুটি তার যোগ করে একটি অল্প পাওয়ারের বাল্‌বে যোগ করলে বাল্‌বটি জ্বলে উঠবে।

একটি ব্যাটারীতে এই ধরনের অনেকগুলি সেল একত্রিতভাবে যুক্ত থাকে।

এইগুলি যোগের ফলে ব্যাটারীর ভোলটেজ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও ব্যাটারীকে ডিজেল গাড়ীর উপযুক্ত করে তৈরী করার জন্য আরও অনেকগুলি অংশ এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। সব মিলিয়ে ব্যাটারীটি গাড়ীর নির্দিষ্ট একটি স্থানে স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে এটি ডায়নামোর সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাছাড়াও এটি গাড়ীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্রয়োজনমত যুক্ত থাকে।

ব্যাটারীর মধ্যখানে বিভিন্ন সেলের সঙ্গে একটি করে সেপারেটর থাকে। বিভিন্ন সেল একটির সঙ্গে অন্যটি ভিতরের দিকে পরস্পর যুক্ত থাকে।

ব্যাটারীর বিভিন্ন অংশ—

এখানে একটি চিত্রের দ্বারা ব্যাটারীর বিভিন্ন অংশ দেখানো হল। কিছু অংশ কর্তিত দেখিয়ে ভিতরের অংশগুলি বোঝানো হলো। বাইরের যে খোলটির মধ্যে ব্যাটারী থাকে তাকে বলে কন্টেনার। ওপরে যে ঢাকনা থাকে বলে কভার।

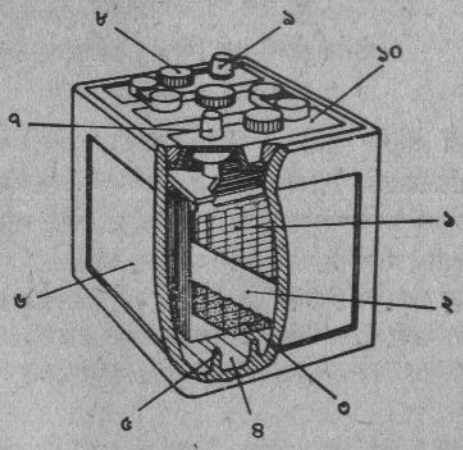

ব্যাটারীর বিভিন্ন অংশ

১। নেগেটিভ প্লেট ২। সেপারেটর ৩। পজিটিভ প্লেট
৪। সেডিমেন্ট স্পেস ৫। এলিমেন্ট রেস্ট ৬। কন্টেনার ৭। নেগেটিভ টার্মিন্যাল ৮। ফিল্টার ক্যাপ ৯। পজিটিভ টার্মিন্যাল ১০। কভার

এছাড়া পজিটিভ প্লেট, নেগেটিভ প্লেট, সেপারেটর, সেডিমেণ্ট স্পেশ, নেগেটিভ টার্মিন্যাল, ফিল্টার কাপ প্রভৃতি দেখানো হলো।

ব্যাটারীর সবচেয়ে নীচু অংশ কণ্টেনারের তলা স্পর্শ করে না। এটি তলা থেকে ১·২৫ সেমি ওপরে থাকে। এর ফলে তলায় সেডিমেণ্ট জমে শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করতে পারে না।

ব্যাটারীর ওপরের অংশ ঢাকা থাকার কারণ হল এ্যাসিড বাইরে উঠে যেতে পারে না। ব্যাটারীর সঙ্গে বিভিন্ন ফিল্টার ক্যাপ এবং প্লাগ যুক্ত থাকে। এর ফলে এটি ডিজেল ইঞ্জিনের সঙ্গে সহজে যুক্ত করা যায়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মোটর চালাবার বিশেষ কৌশল

(Driving system)

শরীরের সব অংশের প্রতি ভালভাবে নজর না রাখলে শরীর যেমন ভাল থাকে না, তেমনি মোটরের বিভিন্ন অংশের দিকে ভালভাবে নজর না রাখলে, মোটরও দ্রুত খারাপ বা বিকল হয়ে যায়। গাড়ি চালাতে শুরু করার আগেই যে-যে দিকে অবশ্যই চালকের নজর দিতে হবে, তা হলো—

(১) গাড়ির সব সচল অংশগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না—কোথাও কোনও অসুবিধা থাকলে, তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা উচিত।

(২) গাড়ি স্টার্ট করার আগে গাড়িতে লুব্রিকেটিং তেল অবশ্য দিয়ে নিতে হবে।

(৩) কোনও ফিটিং ঢিলা আছে কিনা, তা গাড়ি বের করার আগে দেখে নিতে হবে। কোনও ফিটিং ঢিলা থাকলে, তা সঙ্গে সঙ্গে টাইট করে দিতে হবে।

(৪) চাকার মধ্যে ঠিকমতো বাতাস আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৫) গাড়ির সবগুলি আলো ঠিক আছে কি না, তা রাত্রে গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৬) গাড়ির রেডিয়েটারে জল আছে কিনা, পেট্রল ট্যাঙ্কে আবশ্যকমতো পেট্রল আছে কিনা, গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৬) গাড়ির টুকিটাকি মেরামত করার যন্ত্রগুলি, গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে, গাড়িতে তুলে নিতে হবে।

গাড়ির নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে নিয়মিত তেল না দিলে ঐ অংশগুলি ঠিকমতো খেলবে না। যদি সব অংশগুলি খেলতে না পারে, তাহলে পার্টস্‌গুলি ক্ষয় হবে ও তার ফলে তার উপরে একটু জোর পড়া মাত্র তা ভেঙে যাবে। চাকায় যদি ঠিকমতো বায়ুর চাপ না থাকে, তাহলে টায়ার মুড়ে ক্যাম্বিস খুলে যায়। তা ছাড়া কোনও তীক্ষ্ম বা কঠিন পদার্থের উপরে চলার সময় চাকাতে যে চাপ পড়ে, তাতে টিউবগুলিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দু'চারবার টায়ার খোলা ও পরানোতে টায়ার ও টিউব এই দুয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে।

মোটর গাড়ির বাতিগুলি ঠিক না রাখলে—পথের পথিকদের বিপদের সম্ভাবনা। তা ছাড়া চালক ভালভাবে পথ দেখতে না পেলে, গাড়িটা কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারে ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দু'টি গাড়ির মধ্যেও ধাক্কা লেগে যেতে পারে। তাই গাড়ি খারাপ থাকা মোটর গাড়ির আইন অনুসারে বে-আইনী। গাড়ির রেডিয়েটারে যদি জল না থাকে তাহলে ইঞ্জিন কিছুক্ষণ চললে তা গরম হয়ে যায় ও তার ফলে লুব্রিকেটিং তেলও কমে যায়। তার ফলে পিস্টন রিং ভাঙার ও সিলিণ্ডার ফেটে যাবারও বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এর ফলে রেডিয়েটারের ঝাল বা জোড় খুলে যাবার আশংকাও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

যদি পেট্রল ট্যাঙ্কে উপযুক্ত পরিমাণে পেট্রল না থাকে, তাহলে দূর পথে গাড়ি চালাবার পর যদি পেট্রল ফুরিয়ে যায়, তাহলে গাড়ি ফিরে আসতে পারে না ও নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। ব্রেক ঠিক না থাকলে, আচমকা গাড়ি থামাবার প্রয়োজন হলে, তা থামানো যায় না এবং তার ফলে নানা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। গাড়ি মেরামতির টুকিটাকি যন্ত্র না থাকলে,

হঠাৎ পথের মাঝে যদি গাড়ি মেরামত করার প্রয়োজন হয়, তবে তা করা যায় না।

আজকের দিনের সব ধরনের মোটর গাড়িতেই ইলেকট্রিক সেল্‌ফ্‌ স্টার্টার

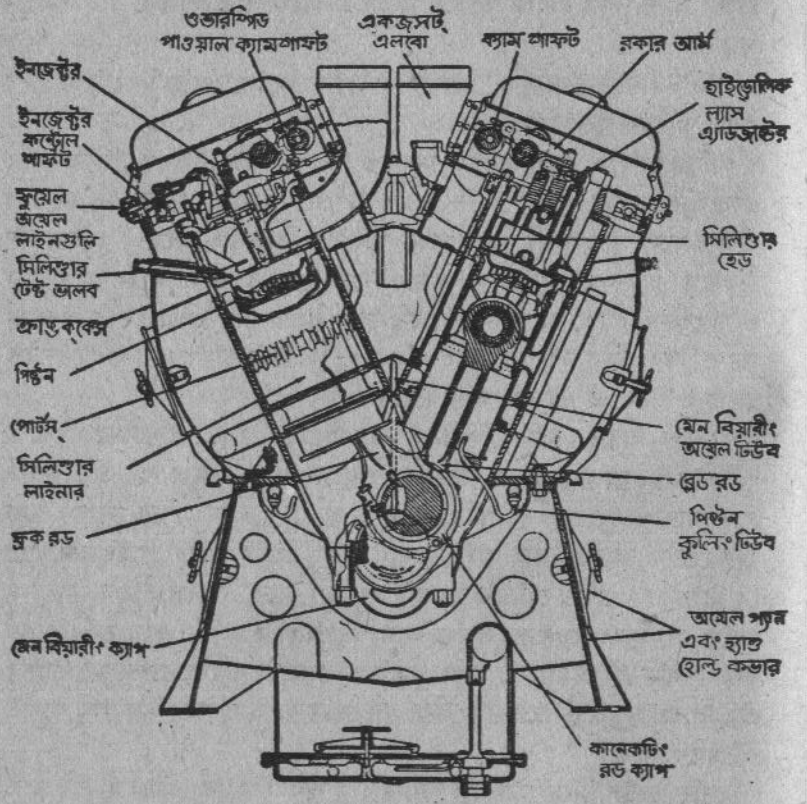

ডিজেল ইঞ্জিনের ক্রস সেক্‌শন

(Self starter) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মোটরকে স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভারকে অবশ্যই দেখতে হবে যে, গীয়ার লিভার নিউট্রালে আছে কিনা। তাছাড়া ইগ্নিশান সুইচ (Ignition Switch) দেওয়া আ.. কি না তা

দেখতে হবে। পেট্রোল কক্ খোলা আছে কিনা তাও দেখতে হবে। যদি সেল্‌ফ্‌ স্টার্টার ব্যবহৃত হয়, তাহলে সুইচ দিয়ে মোটর গাড়িকে স্টার্ট করতে হয়। তা না হলে স্টার্টিং করা হয় হ্যাণ্ডেল মেরে। তারপর দেখতে হবে যে, ব্রেকগুলি ঠিকমতো খোলা আছে কিনা। ক্লাচ চেপে প্রথমে প্রথম গীয়ার দিতে হবে। এ্যাক্‌সিলিরেটরকে ধীরে ধীরে চাপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাচ্‌কে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে হবে।

এইরূপ ক্রমশঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় গীয়ার বদল করলে মোটর গাড়িটি স্বাভাবিক গতি পেয়ে ক্রমশঃ জোরে চলতে থাকবে। যখনই গীয়ার বদল করতে হবে, তখনই ক্লাচকে সম্পূর্ণ চেপে বদল করা উচিত। তা না হলে গীয়ার পিনিয়ানগুলি অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

গাড়ির গতি কম বা বেশী করতে হলে এ্যাক্‌সিলিরেটরকে কম বা বেশী চাপতে হবে। এই এ্যাক্‌সিলিরেটার কোনও গাড়িতে পায়ের দ্বারা চালিত হয়, আবার কোনও কোনও গাড়ির স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। আবার কোনোও কোনও গাড়িতে হাত ও পা দুটি দিয়েই এ্যাক্‌সিলিরেটারকে কাজ করানো হয়ে থাকে। হাতে যেটি থাকে তাকে থ্রোট্‌ল লিভার (Throttle) আর পায়ে যেটি থাকে, তাকে বলে এ্যাক্‌সিলিরেটর (Acceleratar)—কিন্তু দুটি মিলিতভাবেই কাজ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, গাড়ি চলার সময় ড্রাইভারকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। যাতে কোনরূপ বিপদ না হয়, সব সময় সেদিকে নজর রাখতে হবে। যাতে কোনও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা না লাগে বা কিছু চাপা না পড়ে—সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। ব্রেক খুব বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রেক ব্যবহার কম করতে হলে, আগে থাকতেই সতর্ক হতে হবে যে, কখন্ গতি কমাতে হবে। এ্যাক্‌সিলিরেটারের সাহায্যেই গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমানো যায়। তবে একটা কথা—হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হলে ও হঠাৎ থামাতে হলে ব্রেক কষা ছাড়া উপায় নেই।

সাধারণভাবে ধীরে ধীরে গাড়ির গতি কমাতে হলে এইভাবে করা হয়। হঠাৎ গাড়িকে যে কোনও জায়গায় থামাতে হলে, প্রথমে ক্লাচকে বিযুক্ত করে তারপর গীয়ার হ্যাণ্ডেলকে নিউট্রালে আনতে হবে ও ঈষৎ ব্রেক কষতে হবে। তাহলে গাড়ি থেমে যাবে।

ইঞ্জিনকে যদি একেবারে বন্ধ করতে হয়, তাহলে ইগ্নিশান সুইচ (Ignition Switch) বন্ধ করে দিতে হবে।

যদি ইগ্নিশান সুইচে দোষ থাকে এবং কোনও কারণে মেরামত করার সময় না পাওয়া যায়, তাহলে গাড়িটাকে টপ্‌গীয়ার দিয়ে বন্ধ করা যেতে পারে। ঐ সময়, এ্যাক্‌সিলিরেটরের সাহায্যে মোটরে গ্যাস একেবারে কমিয়ে ফেলতে হবে।

তাতেও যদি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়, তাহলে ব্রেক দিয়ে এবং টপ গীয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়লেই মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য একটা কথা—এইভাবে মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করা ভাল নয়—তাতে গাড়ির ক্ষতি হয়। কিন্তু যদি কোনও ক্ষেত্রে অন্য উপায় না থাকে অর্থাৎ সুইচ খারাপ থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে এরূপ করতে হয়।

সব সময় ড্রাইভারের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কোনও জিনিস, কোনও জন্তু বা কোনও মানুষের উপর দিয়ে যেন গাড়ির চাকা না চলে যায়। রাস্তায় যদি বেশী লোকজন থাকে বা বেশী গাড়ি থাকে, তাহলে ঘন ঘন হর্ণ ব্যবহার করতে হয়। তবে বেশীক্ষণ হর্ণ বাজলে লোকে বিরক্ত হতে পারে তাও মনে রাখা উচিত।

সব সময় ড্রাইভারকে বাঁ পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালাতে হয় (Keep to the left)। সাধারণত: অন্য গাড়ির পিছনে পিছনে সমান গতিতে গাড়ি চালানো উচিত। যদি হঠাৎ গাড়ি বন্ধ করতে হয়, তাহলে হাত উঠিয়ে পিছনের গাড়িকে গতি বন্ধ করতে নির্দেশ দিতে হবে।

কোনও মোড় ঘুরতে হলে, যেদিকে ঘুরবে সেদিকে হাত বাড়িয়ে ও হর্ণ দিয়ে জানাতে হবে যে, মোটর গাড়িটা মোড় ঘুরছে। তা না হলে অন্য কোনও গাড়ি এই গাড়ির উপরে এসে পড়তে পারে। তা ছাড়া গাড়ি মোড় ঘোরাবার সময় তার গতিও কম রাখতে হয়। তার কারণ হলো, তা না হলে অন্য পথের গাড়ি বা লোক তা আদৌ জানতে পারে না—ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কোনও কোনও মোটরের গীয়ারকে এই সময় বদল করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। ভাল মোটর ড্রাইভার যখন গীয়ার পরিবর্তন করেন, তখন গীয়ার কোনও রকম শব্দ হয় না। তা ছাড়া সব অংশ ভাল করে লুব্রিকেটিং তেল

দেওয়া থাকলে সহজেই একাজ হয়। যদি গীয়ার বদলের সময় শব্দ হয়, তবে গীয়ার পিনিয়ানের দাঁতের ক্ষতি হয়ে থাকে।

যদি টিউবে বাতাস কম থাকে বা বাতাস্ কোনোও ভাবে বের হয়ে যায়, তাহলে আবার বাতাস না ভরে কখনও গাড়ি চালানো উচিত নয়। এইভাবে চালাতে চেষ্টা করলে টিউবটি একেবারে ফেটে যায় ও গাড়ির ক্ষতি হয়।

বেগে গাড়ি মোড় ঘোরালে চাকার রিম (Rim) থেকে চাকা খুলে যাবার আশংকা থাকে। তার ফলে চাকার ক্ষতিও হওয়া অসম্ভব নয়।

গাড়ি চালাতে গেলে সব সময় ঘন ঘন গাড়িকে Overtake করানো অর্থাৎ সামনে অন্য গাড়ির পাশ কাটিয়ে ঘন ঘন বেরিয়ে যাবার বা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। গাড়ি যদি Overtake করাতে হয় তাহলে অন্য গাড়ির ডানদিক দিয়ে তা করানো উচিত। কিন্তু বার বার এইভাবে করতে থাকলে বা সঙ্গে এই গাড়ির ধাক্কা লাগার সম্ভবনা থাকে।

যদি গাড়ি Overtake করার দরকার হয় তাহলে হর্ণ দিয়ে আগের গাড়িকে তা জানাতে হয়। তা ছাড়াও উল্টো দিকে থেকে অন্য কোনও গাড়ি আসছে কিনা তা সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হয়।

নানাভাবে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় বিশেষ থাকে না। সাধারণতঃ বড় বড় রাস্তায় মোড় পার হবার সময় পথের ঠিক মাঝখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে ও সিগন্যাল দেয়। সেই সিগ্‌ন্যাল সব সময় মেনে চলা উচিত। সিগন্যাল না মানলে তার জন্যে জরিমানা হয়ে থাকে ও দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রত্যেকটি সিগ্‌ন্যাল ও তার অর্থ এর পরে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের সিগ্‌ন্যাল ছাড়া আরো অনেক সিগ্‌ন্যাল আছে সেগুলিও মেনে চলা কর্তব্য। অনেক জায়গায় পুলিশের সিগ্‌ন্যালের পরিবর্তে লাইটিং সিস্‌টেম দ্বারা সিগ্‌ন্যাল দেওয়া হয়। লাল আলো জ্বললে গাড়ি বন্ধ রাখতে হবে। হলদে আলোর অর্থ—গাড়ি স্টার্ট করতে হবে। সবুজ আলো জ্বললে গাড়ি চালাতে হবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ যদি পথের মাঝে কোনও কারণে খারাপ হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পিছনের গাড়িকে ইঙ্গিত করে তা জানাতে

হবে, তারপর গাড়িকে পথের বাম পাশে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজে মেরামত করতে চেষ্টা করা উচিত। তাতে সফল না হলে অবিলম্বে গাড়ির কারখানায় খবর দিতে হবে। পথের মাঝে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখাও আইনসঙ্গত নয়।

যদিও মোটর চালনা আরামের, তবু সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, এর দায়িত্বও কম নয়। চালক নিজে পাকা না হলে পথের মাঝে যে সব গোলমাল ঘটতে পারে, তা মনে রাখতে হবে—যেমন, অনেক সময় ব্রেক কাজ করে না, টায়ার ফেটে যেতে পারে। অনেক সময় স্টিয়ারিং কাজ করে না, ইঞ্জিন বন্ধ করার সুইচও খারাপ হতে পারে।

গাড়িকে কখনো অযথা বেশী জোরে চালানো উচিত নয়। মাদক দ্রব্য খেয়ে গাড়ি চালানো উচিত নয়, তাতে ভুল হতে পারে। গাড়িতে কোনও সময় মাদকদ্রব্য বহন করাও উচিত নয়।

পেট্রোল ইঞ্জিন স্টার্ট করার কৌশল

এবারে পেট্রল ইঞ্জিন স্টার্ট করার নিয়মাবলী সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। ড্রাইভিং জানতে বা শিখতে গেলে সবার আগে ভালভাবে জানা উচিত। প্রথমে ড্রাইভারের সিটে বসলে—সামনে একটা চাকার মতো স্টিয়ারিং, তার নীচে গীয়ার লিভার বা একটা রডের সাথে লাগানো হাতল দেখা যায়। আর আছে ড্যাস বোর্ড আর তার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রগুলি। নীচে আছে তিনটি প্যাডেল—যা আগেই বলা হয়েছে।

প্রথমে বাঁ পা দিয়ে ক্লাচে চাপ দিয়ে পরে গীয়ার নিউট্রাল করতে হবে। দেখতে হবে তা ঠিকমতো নিউট্রাল হলো কিনা। যদি গীয়ার লাগানো থাকে তবে তা নিশ্চয়ই একদিকে হেলানো থাকবে। এ অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট করা কর্তব্য নয়।

গীয়ার নিউট্রাল হবার পর গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। প্রথমে ইগ্নিশান সুইচ দিয়ে চাবির সাহায্যে ইগ্নিশানকে অন্ করতে হবে। তখন দেখতে হবে পেট্রল ট্যাঙ্ক আর এম্পিয়ার মিটারকে, দেখতে হবে ব্যাটারী ও পেট্রল ঠিক আছে কিনা তারপরে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনকে স্টার্ট করতে হবে। ডান পা দিয়ে চাপ দিতে হবে এ্যাকসিলিরেটরে। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্টার সুইচ অন্ করতে হবে। ইঞ্জিন

চালু হলে স্টার্টার সুইচ অফ করে দিতে হবে এবং দেখতে হবে অয়েল প্রেসার গেজটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা।

ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলে, অন্য সব পার্টস্ ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, তা দেখে নিতে হবে।

এইবার দেখতে হবে সেলফ্ স্টার্টার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। যদি তা না করে, তাহলে হ্যাণ্ডেল মেরে স্টার্ট করতে হবে।

হ্যাণ্ডেলটি গাড়ির সামনে রেডিয়েটারের নীচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জোরে জোরে ৪।৫ বার ঘোরালেই ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়। এই হ্যাণ্ডেল বাংলা 'দ' অক্ষরের মতো আকৃতিযুক্ত হয়, এর একপ্রান্তে থাকে একটি পিন। যা ভিতরে আটকে যায়, তারপরে তা ঘোরানোর ফলে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়। ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলে হ্যাণ্ডেল বের করে দিতে হয়।

ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলে এ্যাকসিলিরেটরে চাপ দিতে হবে। তারপর গাড়ি চলতে থাকলে, গীয়ার বদল করে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করা হয়।

গাড়ি চলতে থাকলে তা ঘোরানো বা গতি কমানো-বাড়ানো স্টিয়ারিং ও গীয়ার-এর উপরে নির্ভর করে। গতি বন্ধ করতে হলে ব্রেক কষতে হয়।

ধাক্কা (Push) দিয়ে গাড়ি স্টার্ট

অনেক সময়, গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। শীত বা বর্ষাকালে প্রায়ই এটি হয়ে থাকে। এ সময় গাড়ি স্টার্ট না নিলে ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করাতে হয়। ধাক্কা দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করার সময় ইগ্নিশান সুইচ অন্ করতে হবে এবং গীয়ার নিউট্রাল করতে হবে।

তারপর অন্য গাড়ি দিয়ে বা মানুষ দিয়ে গাড়িতে ধাক্কা দিতে হবে। ধাক্কার ফলে গাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করবে। সেই সময় ক্লাচে বাঁ পা দিয়ে চেপে দ্বিতীয় গীয়ার ব্যবহার করতে হবে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি ক্লাচ প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে এ্যাক্সিলিরেটর চাপ দিতে হবে।

এর ফলে, ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যায়। যদি তাতেও স্টার্ট না হয়, তাহলে ইঞ্জিনকে হিট দিয়ে বা তাপ দিয়ে গরম করে নিতে হবে।

চালাবার প্রথম অভ্যাস

ড্রাইভারের সিটে বসে স্টিয়ারিং দু'হাত দিয়ে ধরতে হবে। তারপর নজর

রাখতে হবে সামনের দিকে। সামনে কোন বাধা আছে কিনা তা দেখতে হবে।

তারপর ক্লাচ প্যাডেলটি বাঁ পা দিয়ে চেপে বাঁ হাত দিয়ে গীয়ার লিভারকে নিউট্রাল থেকে ফার্স্ট গীয়ারে নিয়ে আসতে হবে।

স্টার্ট করার আগে দু একবার হর্ণ দেওয়া উচিত। তার কারণ হলো, যদি আশেপাশে কেউ থাকে তারা সাবধান হবে—বুঝবে গাড়ি স্টার্ট হতে চলেছে। তা ছাড়া সাইড মিরার দিয়ে দেখে নিতে হবে, আশেপাশে বা পিছন থেকে কেউ আসছে কিনা। এবং পরেই ডান হাত বের করে দু-একবার তা নাড়তে হবে সতর্কতা জানানোর জন্যে। গাড়ি চালাবার আগেই এইসব অভ্যাসগুলি করে রাখা ভাল।

এবার স্টিয়ারিং ভাল করে ধরে ক্লাচ প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেলে একটু একটু করে চাপ দিতে হবে। দেখা যাবে গাড়ি একটু করে চলছে। এ্যাক্সিলিরেটর প্যাডেলে ঠিক ততটুকু চাপ দিতে হবে—যতটুকু গতি প্রয়োজন। তারপর স্টিয়ারিং ঠিকমতো ধরে রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

গাড়ি যখন ২০।২৫ মাইল গতিতে চলতে থাকবে, তখন ক্লাচ প্যাডেলে চাপ দিয়ে, গতি একটু কমিয়ে নিয়ে প্যাডেল ছেড়ে দিতে হবে।

তারপর গীয়ার নিউট্রাল করে দ্বিতীয় গীয়ার দিতে হবে। অরপর এ্যাক্সিলিরেটরে একটু চাপ দিলেই গাড়ি আরও জোরে ভালভাবে চলতে থাকবে। স্টিয়ারিং বেশ ভালভাবে ধরে থাকতে হবে।

গাড়ি চালানো অভ্যাস করতে হলে তৃতীয় গীয়ার না দিয়ে, দ্বিতীয় গীয়ারেই প্রথমে চালানো ভাল। কিছুদিন অভ্যাস হলে তৃতীয় গীয়ারে চালানো যাবে। এই অভ্যাস সব সময় খুব ভোরে ফাঁকা রাস্তায় তৃতীয় গীয়ারে বা টপ্ গীয়ারে করা কর্তব্য। তাতে বিপদের ভয় থাকে না।

মনে রাখতে হবে যে, চালানো শিক্ষায় প্রথম ২।৩ মাস ২৫।৩০ মাইলের বেশী স্পীডে চালানো উচিত না।

যতদিন স্টিয়ারিং ভালভাবে অভ্যাস করা ও কণ্ট্রোল করা না যায়, ততদিন ঐ স্পীডে চালাতে হবে। তাছাড়া দ্রুত গীয়ার পাল্টানো অভ্যাস করাওয়া পর্যন্ত বেশী জোরে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

গীয়ার পাল্টানোর নিয়মগুলি এবার বলা হচ্ছে। এগুলি তাড়াতাড়ি করতে অভ্যাস করতে হবে।

১। প্রথমে ক্লাচ প্যাডেল চাপ দিতে হবে।

২। তারপর এ্যাকসিলিরেটরে হাল্কা চাপ দিতে হবে।

৩। গীয়ারকে নিউট্রালের রাখতে হবে। ক্লাচ প্যাডেল ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাতে আবার চাপ দিতে হবে।

৪। এ্যাকসিলিরেটরের কাজের ক্ষমতা দেখে তাতে চাপ দিতে হবে। তারপর ফার্স্ট গীয়ার লাগাতে হবে।

৫। গীয়ার লাগানো হলে ক্লাচ ছেড়ে এ্যাকসিলিরেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

৬। গাড়ি চলতে থাকলে এ্যাকসিলিরেটারের উপর চাপ প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে।

৭। গীয়ার পাল্টাতে হলে ক্লাচে চাপ দিয়ে গতি কমিয়ে গীয়ার নিউট্রাল করতে হবে। তারপরে দ্বিতীয় গীয়ার দিতে হবে।

৮। তৃতীয় গীয়ার দিতে হলেও একই নিয়ম পালন করতে হবে। কখনো ক্লাচে চাপ না দিয়ে গীয়ার পাল্টানো উচিত নয়।

৯। গাড়ি টপ্ গীয়ারে চলতে চলতে যদি সামনে কোন উঁচু-নীচু রাস্তা পড়ে বা পথ জ্যাম থাকে, তাহলে গীয়ার ডাউন করতে হবে ও প্রয়োজন হলে ব্রেক কষার জন্যে তৈরী থাকতে হবে।

গাড়ি ঐ জায়গা পেরিয়ে গেলে আবার স্পীড বাড়াতে হবে।

গীয়ার চেঞ্জ ও গীয়ার ডাউন করার কাজটি যাতে দ্রুতভাবে করা যায়, তা অভ্যাস করতে হবে। এগুলো শেখা হলে, রোড্ সিগ্ন্যাল বা পথের নানা নির্দেশ শিখতে হবে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে নানাধরনের রাস্তা ও বাধা-বিপত্তি এবং সেখানে কিভাবে সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়, তা আলোচনা করা হচ্ছে।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নানা বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা

গাড়ি চালাতে গেলে যত দুর্ঘটনা ঘটে তার বেশীর ভাগই হয় রাস্তার ক্লসিংয়ে, কিংবা অন্য নানা বাধার জন্যে। কোন্ রাস্তায়, কিভাবে, কোন্ গাড়ি চালাতে হবে, তা না জানালে এরূপ হতে বাধ্য। সব সময় মনকে সচেতন ও একাগ্র রাখতে হবে। কোনও সময় নিম্নলিখিত অবস্থায় গাড়ি চালাতে নেই—

১। দীর্ঘ পরিশ্রমে শরীর খুব ক্লান্ত থাকলে গাড়ি চালাতে নেই।

২। মানসিক চাঞ্চল্য বা শোক, দুঃখ অথবা দুশ্চিন্তা থাকলে গাড়ি চালাতে নেই।

৩। মদ বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য খেয়ে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

৪। গাড়ির কিছু কিছু প্রধান পার্টস্ খারাপ থাকলে সেই গাড়ি চালাতে নেই।

৫। কারও উপরে খুবই বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই মানসিক অবস্থায় গাড়ি চালানো উচিত নয়।

৬। ধূমপান করতে করতে গাড়ি চালাতে নেই। অনেক সময় চোখে ধোঁয়া লেগে গাড়ির সামনের জিনিস আবছা হয়ে যায়। তাতে গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৭। যদি হাতে বা পায়ে cramp বা আড়ষ্টতা ভাব আসে, তখনই গাড়ি থামিয়ে কিছুটা বিশ্রাম না করে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

৮। চালকের পায়ের জুতো যেন বেশ টাইট্ থাকে—তা দেখে নিতে হবে। জুতোয় বেশী কাদা বা ময়লা থাকা উচিত নয়—তাতে পা পিছলে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৯। কখনো খুব তাড়াতাড়ি করে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

১০। খুব বেশী ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে গাড়ি চালানো উচিত নয়—তাতে মন বিরক্ত থাকে ও যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

১১। গাড়িতে যত জন যাত্রী বহন করা সম্ভব, তারচেয়ে বেশী যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালানো উচিত নয়—তাতে বিপদ আসা খুবই স্বাভাবিক।

১২। গাড়িতে শিশু থাকলে তাদের যাতে ভালভাবে আয়ত্তে রাখা হয়, সেদিকে যাত্রীদের নজর রাখা কর্তব্য। তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

১৩। গাড়িতে অতিরিক্ত মালপত্র বা লাগেজ চাপানো উচিত নয়। এ অবস্থায় গাড়ি চালালে, তাতে নানা বিপদ ঘটা সম্ভব।

ড্রাইভিং সিস্টেম বা ড্রাইভারের পর পর কর্তব্য

মনে করা যাক, একজন ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে কিছুটা দূরে একটা রাস্তার মোড় দেখতে পেল—সেখানে তাকে গাড়ি ঘোরাতে হবে। তখন পর পর কতটা পথ যাবার পর তাকে কি কি কাজ করতে হবে—তা একটি ছবি দিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মনে করা যাক, গাড়ি 1 নং স্থানে এসেছে। গাড়িটির চারদিকে ভালভাবে দৃষ্টি রেখে সব বিপদ কাটিয়ে মোড়ের উপর 12 নং স্থানে নিয়ে যেতে হবে তাহলে পর পর যে-স্থানে যে-যে কাজগুলো করতে হবে, তা হলো—

1. চারদিকের ঝামেলাগুলো দেখে নিতে হবে। উপযুক্ত পথ ও গতিবেগ স্থির করতে হবে।
2. গাড়ির আয়না বা মিরারে নজর দিয়ে চারদিকটা দেখে নিতে হবে।
3. গাড়ির গতি পাল্টাতে হলে তার জন্য হর্ণ দিতে হবে।
4. গাড়ি ঘোরার জন্য সিগন্যাল দিতে হবে।
5. গাড়ি মোড় ঘোরার সুবিধার জন্য ডানদিকে কিছুটা সরাবার উদ্দেশ্য স্টিয়ারিং ঘোরাতে হবে।
6. এই স্থানে গাড়ি এলে প্রয়োজন হলে ব্রেক দেবার জন্যে তৈরী থাকতে হবে।
7. উপযুক্ত গীয়ার চেঞ্জ করতে হবে।
8. প্রয়োজন হলে ব্রেক কষতে হবে।
9. মিরারে দেখতে হবে—সিগন্যাল দিতে হবে—গাড়ি পাশে আসার জন্যে

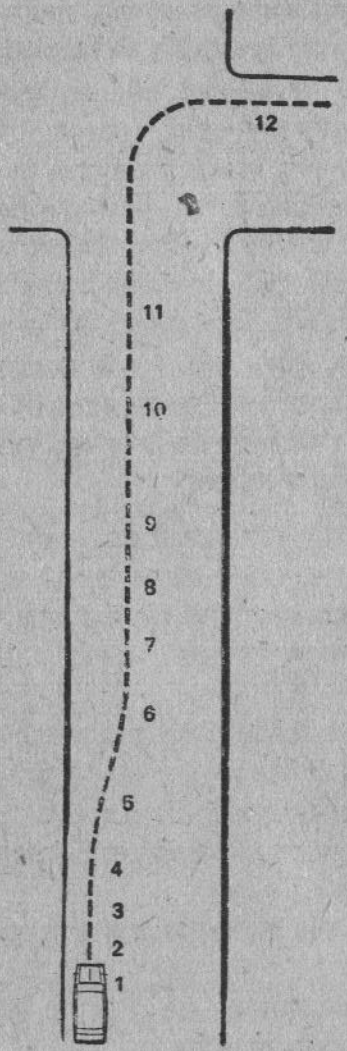

রাস্তায় গাড়ি ঘোরাবার আগে কি কি করণীয়।

দু'ধারে ঝামেলা কিছু আছে কিনা তা দেখতে হবে।

10. হর্ণ দিতে হবে।

11. মিনার দেখতে হবে। ঘোরাবার সিগ্‌ন্যাল আবার দিতে হবে।

12. সিগ্‌ন্যাল বন্ধ করে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করে ছবির পথ অনুযায়ী গাড়ি ঘুরিয়ে আনতে হবে। এইভাবে গাড়ি চালালে ড্রাইভারের পক্ষে কোন বিপদের ভয় থাকে না।

গাড়ি ওভারটেক করার কৌশল

গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে নানারকম বিপদ প্রায়ই ঘটে থাকে। তাই এই বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রতিটি শিক্ষার্থীর কর্তব্য। এর আগে এবিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এবার দেখানো হচ্ছে যে, যদি গাড়ি ওভারটেক করার কৌশল জানা থাকে, তবে খুব আঁকাবাঁকা রাস্তায়ও কোন ভয় থাকে না।

কিন্তু যদি তা না থাকে, তাহলে সরল রাস্তাতেও নানা বিপদ হয়ে থাকে। সাধারণ নিয়ম হলো, গাড়ি একটার পিছনে একটা চলবে। পর পর লাইন দিয়ে গাড়ি চালাতে থাকে। এতে যদি সামনের গাড়ির গতি কম হয় তাহলেই ওভারটেক করার প্রয়োজন হয়।

ওভারটেক করতে হলে সবার আগে সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে। এটা অবশ্য কর্তব্য। পর পৃষ্ঠায় ছবি নং a-তে দেখানো হচ্ছে, কিভাবে আঁকাবাঁকা পথেও গাড়ি যদি সারিবদ্ধ হয়ে চলে, তাহলে বিপদের ভয় থাকে না।

ছবি নং b-তে দেখানো হয়েছে, ঠিকমতো সিগ্‌ন্যাল দিয়ে গাড়ি যদি ওভারটেক্‌ করা যায়, তাহলে আঁকাবাঁকা পথেও বিপদ হয় না।

গাড়ি নং L হলো লাগিং কার। এটি আগে চলেছে। পিছনের গাড়িগুলো কিভাবে বিপদ না ঘটিয়েও তাকে পর পর ওভারটেক্‌ করবে তা দেখানো হয়েছে। ছবি নং c-তে দেখানো হয়েছে, ওভারটেক করতে না জানলে সরল পথেও গোলমাল হয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি উল্টোদিক থেকে গাড়ি আসতে থাকে, তা হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

একমাত্র One way পথ ছাড়া গাড়ি দুদিকে থেকে আসে। সেখানে যদি

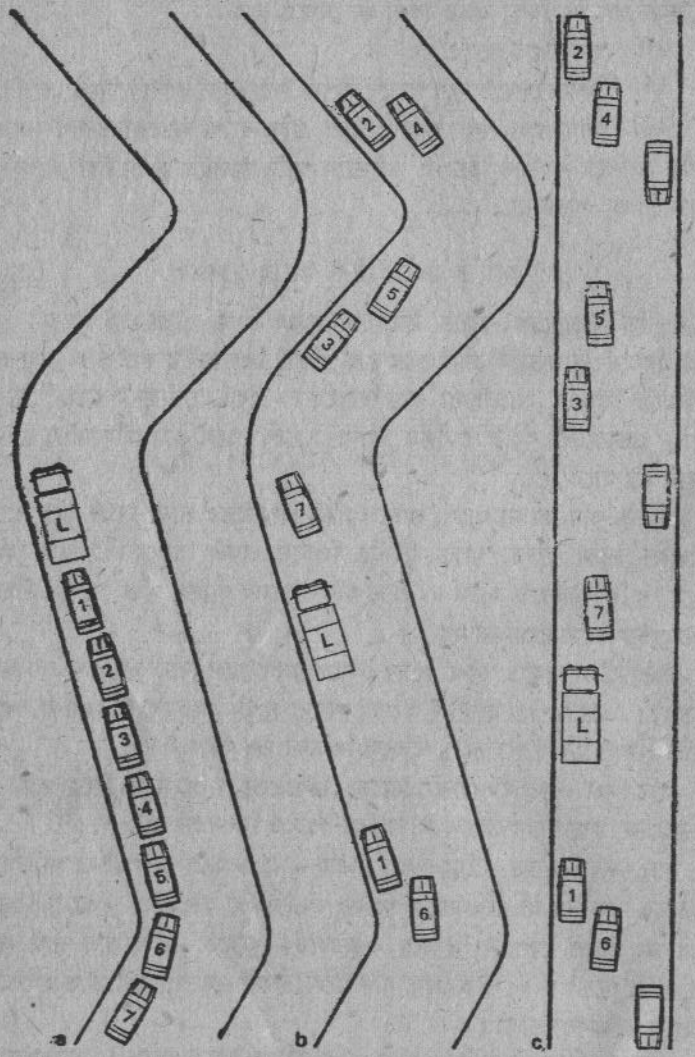

গাড়ি ওভারটেকর কৌশল

গাড়ি এভাবে একদিকেই সব পথ জুড়ে নেয়, তাহলে উল্টোদিক থেকে আগত গাড়ির জন্যে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য।

ওভারটেক্ করার সময় কি কি বিষয়ে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য তা বলা হচ্ছে—

(১) নিজের গাড়ির গতিবেগকে কণ্ট্রোল করতে হবে।

(২) যে লাইনে গাড়ি চলছে তার সমনের ও পিছনের গাড়িকে সিগ্ন্যাল দিতে হবে।

(৩) সবসময় নজর রাখতে হবে যে, ওভারটেক্ করার সময় রাস্তার মধ্যখান থেকে গাড়ি যেন বেশী ডাইনে না যায়।

(৪) ওভারটেক্ করার সময় উল্টোদিক থেকে আগত গাড়ির দিকে নজর রাখতে হবে।

(৫) গাড়ির গতি বৃদ্ধি করে যতটা সত্বর সম্ভব ওভারটেকিং শেষ করতে হবে।

(৬) কখনো বিপজ্জনক ওভারটেকিং করা অনুচিত।

(৭) নিজে ওভারটেকিং করার সময় অন্য গাড়িও তা করেছে কিনা দেখতে হবে। তা না দেখলে দুর্ঘটনা হবার আশংকা থাকে।

(৮) বহু যানবাহন বা লোকজনপূর্ণ পথে, ঘন ঘন ওভারটেকিং করা উচিত নয়।

(৯) পথ আঁকাবাঁকা হলে অথবা দুদিক থেকে গাড়ি চললে সাবধানে ওভারটেকিং করতে হবে।

(১০) বড় গাড়ি বা লরী থাকলে কতটা পথ ফাঁকা তা ভাল করে না দেখে ওভারটেকিং করা উচিত নয়।

গলিপথে ওভারটেকিং ও চালানো

গলিপথে ওভারটেকিং করা বিপজ্জনক—অবশ্য যদি গলিটা One way না হয়। গলিপথে গাড়ি চালাতে গেলে কতকগুলি নিয়ম-কানুন অবশ্যই মেনে চলা উচিত। গলিপথের নিয়ম হলো—

১। কখনো গাড়ি সোজা ছাড়া আড়াআড়ি করা উচিত নয়।

২। উপযুক্ত কারণ ছাড়া গাড়ি ঘোরানো উচিত নয়। তা করতে হলে সর্তকভাবে করতে হবে।

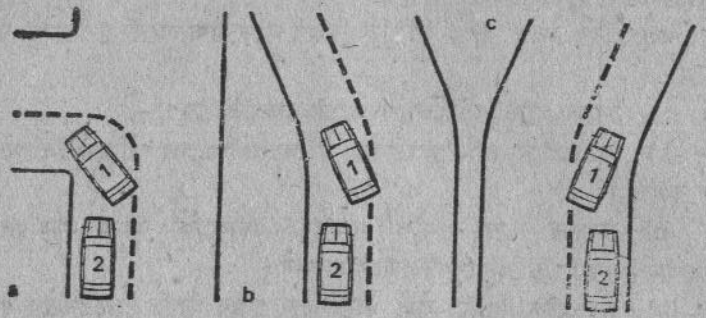

গালিপথে গাড়ি ঘোরানো

৩। সব সময় গাড়ি বাঁকা করলে বা ঘোরালে চারিদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সামনে ও পিছনে ভালভাবে চোখ রাখতে হবে। অবশ্য কোন গাড়ি আসছে কিনা, তা ভাল করে দেখতে হবে।

এইসব নিয়মগুলি কি শহরে, কি গ্রামে সর্বত্র পালন করা কর্তব্য। গলি পথে গাড়ি ঘোরাতে গেলে সতর্কভাবে তা করতে হবে।

ছবিতে দেখানো হচ্ছে—গলিপথে গাড়ি ঘোরাতে গেলে কতভাবে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় ও দুর্ঘটনা ঘটে।

ছবি নং a ও b-তে দেখা যাচ্ছে গলিপথে গাড়ি বিনা কারণে আড়াআড়ি ভাবে রাখলে তা কিভাবে বিপদে ডেকে আনে। গলিপথের নিয়ম না জানার ফলে এই ভাবেই বিপদ আসে।

ছবি নং c-তে দেখা যাচ্ছে One way গলিতে এসে ডানদিকে ঘোরাতে গিয়ে কিভাবে বিপদ আসা সম্ভব।

সামনে পূর্ণ দৃষ্টিসঞ্চার

ডট্ দেওয়া পথে গাড়ি চালানোই এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু তা না মেনে গাড়ি আড়াআড়ি করার জনে বিপদ আসা সম্ভব।

সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিয়মমতো গাড়ি চালানোই হলো দুর্ঘটনা এড়াবার প্রকৃত পথ।

ওভারটেকিং করতে গেলে সামনের দিকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিসঞ্চার আবশ্যক। অনেক সময় সামনে অন্য গাড়ি এসে পথ বন্ধ করে—পূর্ণ দৃষ্টি যায় না।

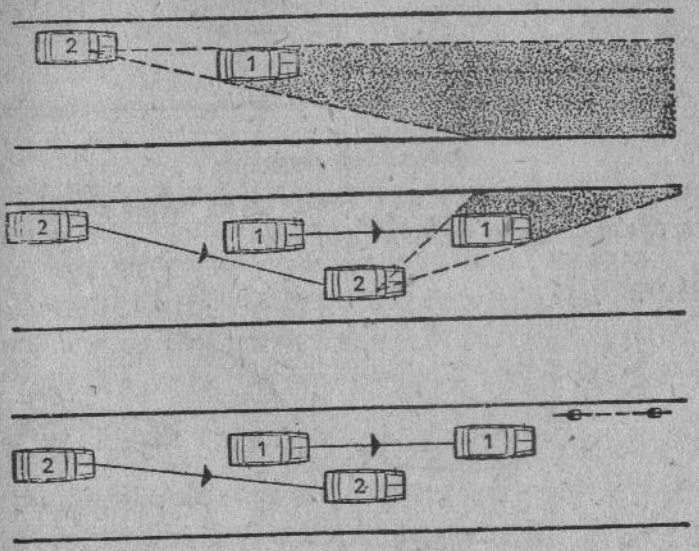

সামনে পূর্ণ দৃষ্টিসঞ্চার
(উপরে a, মাঝে b, নিচে c,)

তার ফলে কি ভাবে অসুবিধা হয়, তা ছবি দেখে বেশ বুঝতে পারা যাবে।

ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে যে, একই পথ দিয়ে দুটি গাড়ি চলেছে। 1নং গাড়ি এমন ভাবে যাচ্ছে যে, তার ফলে 2নং গাড়ির ড্রাইভার সামনের অধিকাংশ পথ দেখতে পাচ্ছে না।

ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে, যদি গাড়ি নং 1 ঠিকমতো না চলে তাহলে গাড়ি নং 2 পাশে নিয়ে গিয়ে, সামনের অধিকাংশ পথটা দেখতে হবে। ছবি নং c-তে দেখা যাচ্ছে গাড়ি নং 2-কে পথের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে সহজেই কিভাবে ওভারটেক্ করে সামনের সম্পূর্ণ পথটা দেখতে পাবে।

অনেক সময় অনেক ড্রাইভার ইচ্ছা করেই সামনের পথকে আবৃত করে বা

পিছনের গাড়িকে অসুবিধার ফেলে। এরা ড্রাইভিং জগতের শত্রু। এদের

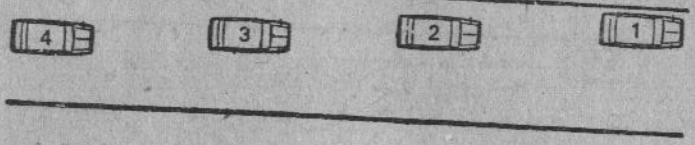

স্বল্প পরিসরে ওভারটেকিং

হাত থেকে কিভাবে বাঁচতে হয় ও কিভাবে সহজেই গাড়িকে ওভারটেক্ করা যায়, ছবি নং c দেখে তা পূর্ণভাবে বোঝা যাবে।

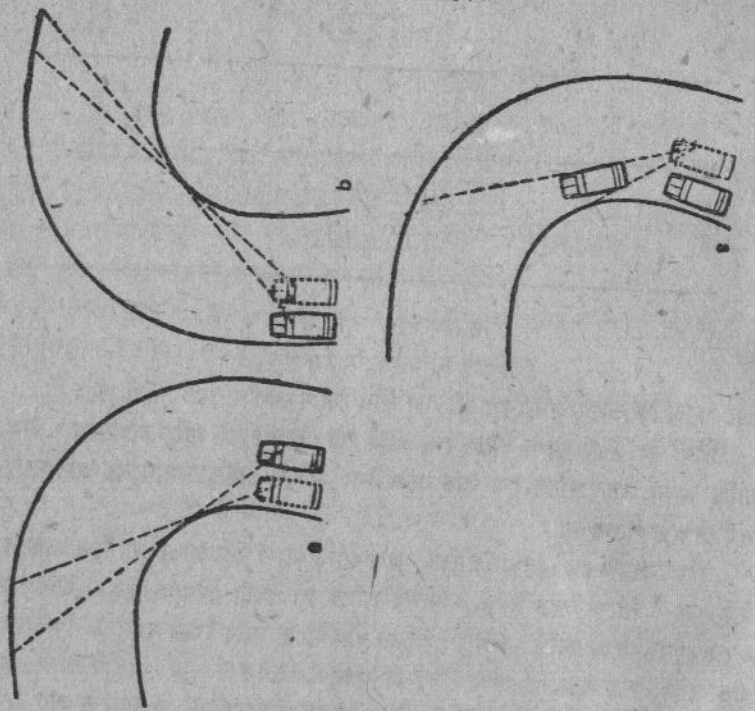

দুটি ও তিনটি গাড়ির মোড় ঘোরার বিপদ

অবশ্য আগে হর্ণ দিয়ে দেখা উচিত, সামনের গাড়ি তা শোনে বা মানে কি না। যদি তা না মানে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এই সময় আবার পিছনের গাড়ির কথাও চিন্তা করতে হবে।

আগের পাতার প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছে 2 নং গাড়ি 1 নং-কে ওভারটেক্ করতে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি নং 3 ও 4 পথ দেখতে পাচ্ছে না। তার ফলে তারা বিপদে পড়েছে। কিন্তু উল্টোদিকের গাড়ির জন্যে ওভারটেক্ করাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তাদের কর্তব্য হলো ওভারটেক্ না করে 2 নং গাড়িকে অনুসরণ করা। তা নাহলে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

আরও নানা ব্যাপার এ সময় মনে রাখতে হবে। মনে করা যাক, একটা গোল রাস্তা ঘুরতে হবে। দ্বিতীয় ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। ফুটকি ফুটকি চিহ্নিত গাড়ি হলো, বিভিন্ন অবস্থায় আসা সম্ভব অতিরিক্ত গাড়ি।

ছবি নং a ও b-তে দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি দুটি গাড়ি যথাক্রমে বাঁদিকে ও ডানদিকে গোল রাস্তায় মোড় ফিরছে।

যেভাবে মোড় ঘোরা উচিত বা যেভাবে ওভারটেক্ করা উচিত, তা না জানার জন্যে ভুলভাবে চালাতে গিয়ে দুটি গাড়ির মধ্যে ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। ছবি নং c-তে দেখা যাচ্ছে তিনটি গাড়ি চলেছে একপথে এবং একদিকে মোড় ফিরবে। পিছনের দিকে একটা গাড়ি সামনের গাড়ির ঠিক পিছনে পিছনে ঠিকভাবে চলবে। কিন্তু অন্য গাড়িটা ওভারটেক্ করতে গেলে কিভাবে বিপদ হতে পারে তা ছবিতে দেখানো হয়েছে।

অন্ধ গলিপথ থেকে মোড় পার হওয়া

অন্ধ গলিপথ বা Blind Lane থেকে বেরিয়ে মোড় পার হওয়া বা ক্রস করা, দ্বিমুখী পথ বা Two way Road-এর থেকে অনেক সুবিধাজনক।

কিন্তু এই পথ পার হবার সময়ও একটা ভয় সব সময় থাকে।

তা হলো উল্টোদিকের বড় রাস্তা সম্পর্কে—যে পথে আরও অনেক গাড়ি আসতে পারে।

পরপৃষ্ঠার ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে Blind Lane থেকে একটি গাড়ি ডান-দিকে ঘুরতে চায়। গাড়িটা খুব দ্রুতগামী নয়।

কিন্তু উল্টোদিকের বড় রাস্তা ধরে দুটি গাড়ি আসছে—তা হলো গাড়ি নং

2 এবং 3। তাহলে দুর্ঘটনার ভয় থাকে। ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে উল্টো-দিক থেকে তিনটি গাড়ি আসছে—তারা হলো গাড়ি নং 2, 3 এবং 4 সেগুলি সারাটা পথ যেভাবে জুড়ে আছে, তাতে দ্রুত গাড়ি ঘোরাতে গেলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুব বেশী।

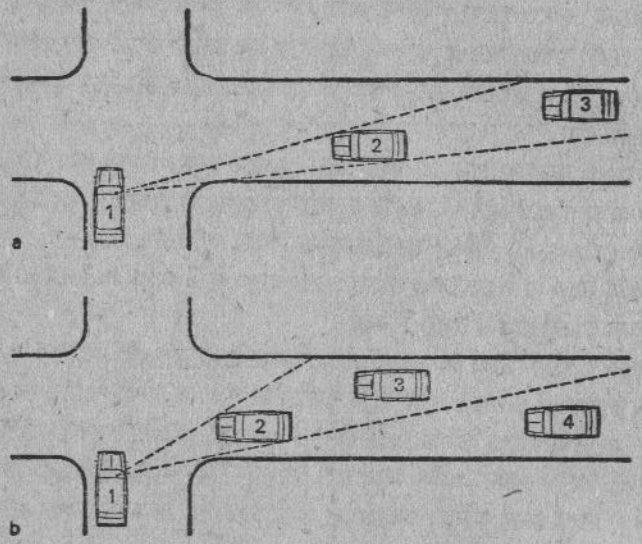

একমুখী বন্ধপথ থেকে মোড় ঘোরা বা পার হওয়া

তার কারণ হলো গাড়ি নং 1-এর ড্রাইভার জানে যে, গাড়ি নং 2-এর সামনে দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে সে ডানদিকে গাড়ি ঘোরাবে। গাড়ি নং 3 এবং 4 সেটা দেখতে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় জোরে গাড়ি ঘোরালে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তাই অন্ধ গলিপথ থেকে গাড়ি ঘোরাতে গেলে, ভাল করে, চারদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে বা অপেক্ষা করে গাড়ি ঘোরানো উচিত।

রাতের বেলা এইভাবে গাড়ি ঘোরাতে হলে ভালভাবে চারদিকের সিগন্যাল লাইট দেখে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

উঁচু-নিচু পথ

উঁচু-নিচু পথে বা পার্বত্য পথে গাড়ি চালান অনেকে সহজ মনে করেন। কিন্তু তা খুবই কঠিন।

বিশেষ করে পথ যদি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়, বৃষ্টি পড়ে অথবা বরফ পড়ে, তা হলে এই পথে মোটর চালনা করা অতিশয় কঠিন। অনেক দক্ষ ড্রাইভার পর্যন্ত এই পথে যেতে ভয় পান বা বিভ্রান্ত হন।

উঁচু-নিচু পথের অসুবিধা হলো, যে গাড়ি উঁচুতে থাকে সে নিচের গাড়িকে দেখতে পায় না।

পথ এমন হয় যে, সামনে দেখা যাচ্ছে, কোনও গাড়ি নেই, ঐ পথের নিচুতেই হয়তো এক বা একাধিক গাড়ি ছুটে আসছে।

নীচের ছবি দ্বারা ভালোভাবে বোঝানো হলো।

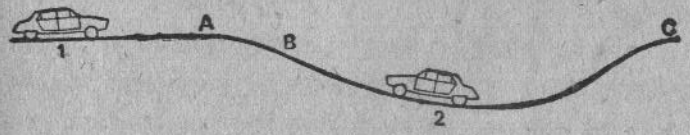

পার্বত্য অঞ্চলে গাড়ি চালাবার বিপদ

একটি পার্বত্য পথে গাড়ি নং 1 চলেছে পূর্ণ গতিতে।

উল্টোদিক থেকে গাড়ি নং 2 পূর্ণগতিতে আসছে। গাড়ি নং 1 জানে না যে, 2 নং গাড়ি আসছে—কারণ সেটা রয়েছে দৃষ্টির আড়ালে।

তেমনি আবার গাড়ি নং 2 জানে না যে, গাড়ি নং 1 আসছে—কারণ সেটাও তার দৃষ্টির অন্তরালে।

যদি গাড়ি নং 2 A অবস্থানে থাকতো, তাহলে গাড়ি নং 1 তা দেখতে পেতো। কিন্তু নীচে থাকার জন্য তা সম্ভব হয়নি।

এখন এই পূর্ণগতিতে যদি গাড়ি নং 1 চলে আসে A স্থানে ও গাড়ি নং 2 আসে B-এর স্থানে, তাহলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক।

যদি গাড়ি নং 1-এর ড্রাইভার খুব কুশলী হন, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু যদি গাড়ি নং 2-এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গাড়ি বা লরী আসে তাহলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

তাই উঁচু-নিচু পথ দিয়ে চলতে হলে, পথ ফাঁকা থাকা সত্বেও গতি খুব কমাতে হবে—তা না হলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

পথ ও ট্রাফিক বিষয়ে জ্ঞান

ভালভাবে ড্রাইভিং করতে হলে পথ ও কোন পথে কি ধরনের ট্রাফিক চলাচল করে তা জানা কর্তব্য।

এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তাহলেও ভাল চালককে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে কিছু কিছু আইন-কানুন মেনে চলা কর্তব্য। এখানে তা বলা হচ্ছে।

১। সব সময় অন্য গাড়ির চালককে খুব বেশী বিশ্বাস করা উচিত নয়।

২। অন্য ড্রাইভারের দেওয়া সিগ্‌ন্যাল সব সময় পুরোপুরি বিশ্বাস করা উচিত নয়। অনেক সময় ড্রাইভার ভুল সিগ্‌ন্যালও দিয়ে থাকে; তা মনে রাখা উচিত।

৩। সব সময় ওভারটেক্‌ করতে হলে ফাঁকা পথে তা করা উচিত। যে পথে ঝামেলা থাকা স্বাভাবিক, সে পথে ওভারটেক্‌ করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

৪। অন্য ড্রাইভাররা সে সব সময় ট্রাফিক সিগ্‌ন্যাল মেনে চলবে, তা ভাবা উচিত নয়। তাই সব সময় আগে থেকেই সাবধান থাকা কর্তব্য। বে-আইনি চালককে অযথা দোষ দিয়েও কোনও লাভ নেই।

৫। যে পথে অন্য গাড়ি দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু অন্য গাড়ি আসতে পারে তা আগে থেকে চিন্তা করেই সাবধান হওয়া উচিত। গাড়ি আসতে পারে মনে মনে এ কথাটা চিন্তা করে সতর্কভাবে গাড়ি চালনা করা অবশ্য কর্তব্য।

৬। যদি একজন ড্রাইভার অন্য গাড়ি দেখে, তাহলে তার চালকও যে এই গাড়ি দেখবে, এমন কোন নিয়ম নেই। তাই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া বা হর্ণ দেওয়া উচিত।

৭। কখনো অনভিজ্ঞ বা আইন না-জানা ড্রাইভারকে গালাগালি করে লাভ নেই—নিজে সাবধান হওয়াই হলো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

মোড় ঘোরার সময়-জ্ঞান

সব রাস্তার মোড় বা জংশন এক ধরনের হয় না। তাই চালককে সব সময়

মনে রাখতে হবে যে, কোন্ পথের মোড় ঘুরতে কতটা সময় লাগবে এবং সেই মতো তাকে তৈরী থাকতে হবে।

এখানে প্রদত্ত ছবিটি দেখেই তা বুঝতে পারা যাবে।

ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে দুটি গাড়ি আগে-পিছে যাচ্ছে। এখানে প্রথম গাড়িটি ডানদিকে ঘুরতে ৫ সেকেণ্ড সময় লাগবে, ধরা যাক।

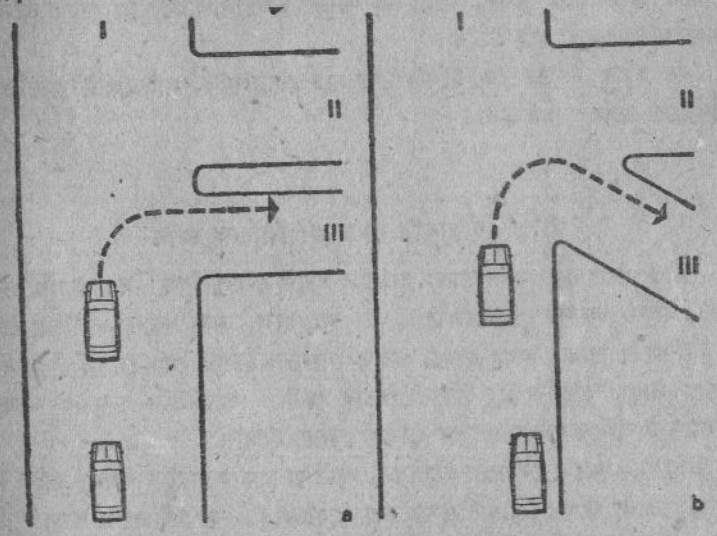

মোড় ঘোরার সময়-জ্ঞান

কিন্তু ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে অন্য ধরনের মোড় ঘুরতে হচ্ছে। তাই ওখানে মোড় ঘুরতে, নির্দিষ্ট নিয়মমতো ঘুরলে দেড়গুণ অর্থাৎ ৭।৮ সেকেণ্ড লাগবে। তাই যে পথে ঘোরানো হচ্ছে, তার কোন্‌দিকে কোন্ গাড়ি আসছে বা তা কত স্পীডে আসছে, তা সঠিক না জেনে গাড়ি ঘোরাতে গেলে বিপদ হবে।

তারপর আসছে বিপরীত পথের অবস্থা জানার প্রশ্ন।

দুটি গাড়ি চলছে—দুটিই ঘুরবে। কিন্তু 111নং পথে গাড়ি থাকতে পারে। তা ছাড়া 11 নং পথেও গাড়ি থাকতে পারে। তারাও গাড়ি ঘোরাতে পারে,

তাই ঠিকমতো বিচার-বিবেচনা না করে গাড়ি ঘোরাতে গেলে বিপদ আসা স্বাভাবিক।

আর একটা কথা। এই রকম পথে গাড়ি ঘোরাতে হলে সব সময় হর্ণ ব্যবহার করা কর্তব্য। হর্ণ না দিয়ে এই সব পথে গাড়ি চালাতে গেলে যে-কোনও সময় উল্টোদিকের গাড়ির এই গাড়ির অবস্থান বুঝতে না পারার জন্যে, বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

তা ছাড়া রাতের বেলা হর্ণের সঙ্গে সঙ্গে হেড্‌লাইট, সাইড্‌লাইট প্রভৃতিও ঠিকমতো জ্বালানো কর্তব্য।

গাড়ি ঘোরাবার সময় জ্যামিতিক জ্ঞান

গাড়ি ঘোরানো সঠিকভাবে অভ্যাস করতে গেলে, কিছু কিছু জ্যামিতিক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে, নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। প্রথম কথা হলো, গাড়ি সামনের চাকার দ্বারা ঘোরে, পিছনের চাকার উপর স্টিয়ারিং-এর কোন প্রভাব নেই। পরে ছবি দ্বারা এই অবস্থা কিভাবে বিপদ আনতে পারে তা বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

ছবি নং a-তে দেখানো হলো যে, সামনের চাকার দ্বারা (কালো লাইন), গাড়িটা কোন্ পথে ঘোরাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পিছনের চাকা দুটি ঠিক সেই পথে না ঘুরে যে পথে ঘুরবে তা ডট্-চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হলে।

ছবি নং b-টি এবার ভাল করে দেখতে হবে। দেখা যাচ্ছে চওড়া কালো রঙের লাইন দ্বারা চিহ্নিত স্থানে একটি শক্ত বাধা বা কোনও বাড়ি আছে। তা হলে জ্যামিতিক জ্ঞান না থাকলে গাড়িটি বাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খাবে। (ডট্ চিহ্নিত স্থান হলো গাড়ির পিছনের চাকার গতিপথ)।

ছবি নং c-তে দেখানো হলো দুটি গাড়ি বাঁদিকে ঘুরতে চায়। কিন্তু জ্যামিতিক জ্ঞান ঠিকমতো না থাকলে গাড়ি নং 1 এবং গাড়ি নং 2 যেভাবে ঘুরতে চায়—তাতে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

ছবি নং d-টি এখাবে লক্ষ্য করা যাক। অনেক সময় রাস্তার ক্রসিং এমন হয় যে, গাড়ি কিছুটা সামনে এগিয়ে টার্ণ নিতে হয়। সঠিক পথটি ডট্ দিয়ে

দেখানো হলো। এভাবে গাড়ি না ঘোরালে তা বাঁদিকে ধাক্কা খাবে এবং দুর্ঘটনা অনিবার্য।

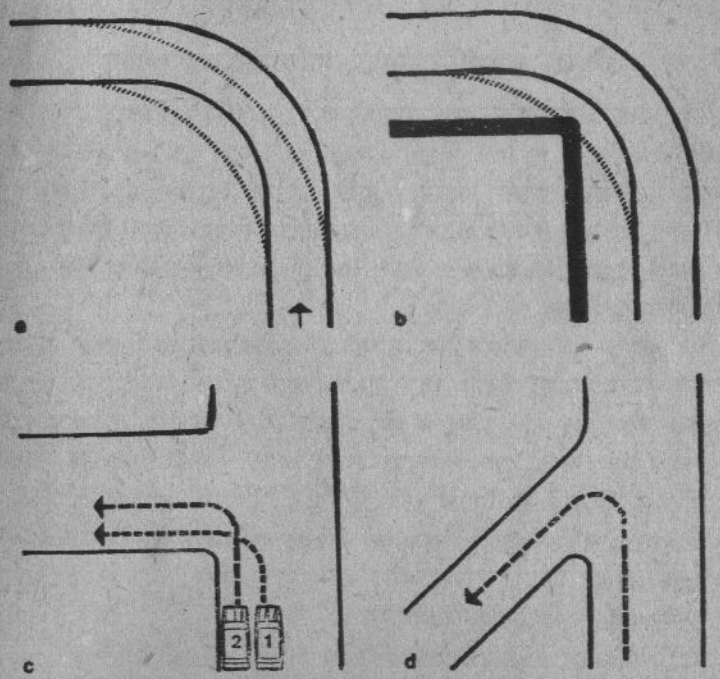

গাড়ি ঘোরাবার জ্যামিতিক জ্ঞান

সব সময় মনে রাখতে হবে যে, গাড়ি যত অল্প পরিসরে ঘোরাতে হয়, তত বিপদ বেশী। তাই জ্যামিতিক জ্ঞান ঠিকমতো না থাকলে, তা করা সম্ভব নয়।

এখানে একটা কথা। গাড়ি ঘোরাবার এই অসুবিধাগুলো অনেক কম হয়, যদি নিয়মিত অভ্যাস করা যায়। তাই অভ্যাসই হলো বড় কথা। গাড়ি চালানোর বিষয়ে নিয়মিত অভ্যাস থাকলে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় কম থাকবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সঠিকভাবে গাড়ি ঘোরাতে না পারার জন্য দুর্ঘটনা

সব সময় ড্রাইভারকে মনে রাখতে হবে যে, গাড়ি নিয়মমতো ঘোরালেও উল্টোদিকে থেকে যে সব গাড়ি আসছে, তার ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অনেক ড্রাইভার মনে করেন, দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে (at the junction of two roads) দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু তিনটি বা চারটি রাস্তার সংযোগস্থলে (at the junction of three or more roads) সে সম্ভাবনা বেশী থাকে।

এ ধারণা যে সব সময় ঠিক, তা নয়। অনেক সময় দুটি পথের সংযোগে সামান্য নানা ভুলের জন্যে বহু দুর্ঘটনা ঘটে থাকে—যা হয়তো চৌরাস্তার মোড়েও কখন হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণতঃ সরলপথে যতটা দুর্ঘটনা ঘটে, তার চেয়ে অনেক বেশী ঘটে, মোড় ঘোরাবার সময়। আমেরিকার একজন বিখ্যাত মোটর ড্রাইভিং বিশারদ বলেছেন—মোটরের যে সংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ঘটে মোড়ের গোলমালের জন্যে।

তিনি একটা পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন। তা হলো :

(১) মোড়ের দুর্ঘটনা শতকরা ৬০ ভাগ।
(২) পার্বত্য পথের " " ২০ "।
(৩) আঁকাবাঁকা পথে " " ১০ "।
(৪) গলিপথে " " ৭ "।
(৫) সরলপথে " " ৩ "।

যাই হোক, এখানে মোড়ের নানা গোলমেলে কারণে দুর্ঘটনা, পর পৃষ্ঠায় ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যদি মোড়ের মাথায় গাড়ি না থাকে, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় থাকে না। যেমন দেখা যাচ্ছে ছবি নং a-তে। এখানে একটা গাড়ি একা বাঁদিকে ঘুরছে।

অন্যপথে কোনও গাড়ি নেই। এখানে পথচারী বা জীব-জন্তুর বাধা না এলে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় নেই।

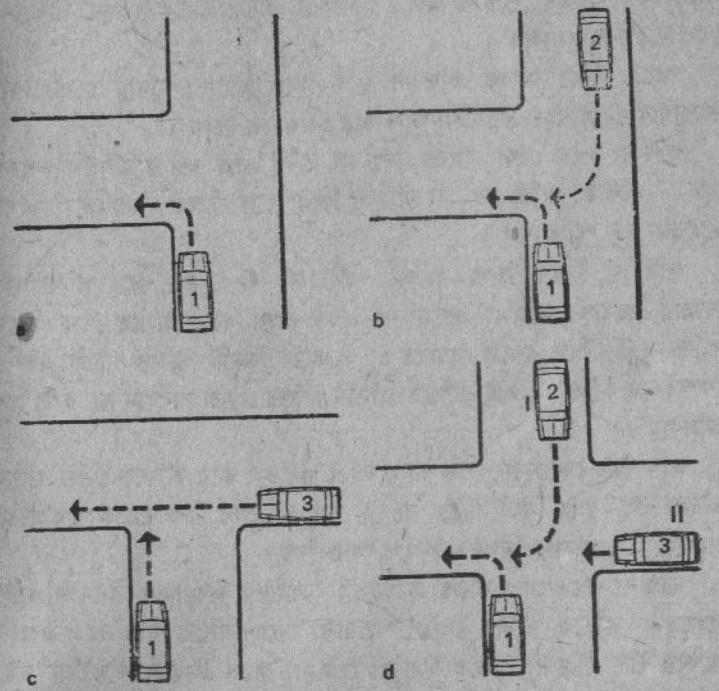

ঠিকমতো না ঘোরানোর জন্য দুর্ঘটনা

ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি গাড়ি ঘুরছে। এখানে গাড়ি নং 2 যে পথে ঘুরে আসবে, গাড়ি নং 1 ও সেই পথেই ঘুরছে। তাই সাবধান না হলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

ছবি নং c তে দেখা যাচ্ছে যে, গাড়ি নং I একটি মোড় ঘুরতে চলেছে। এদিকে গাড়ি নং 3 পূর্ণবেগে অন্য পথ দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা—যদি ড্রাইভাররা সাবধান না হয়।

ছবি নং b-তে যা হয়েছে, তা রীতিমতো বিপজ্জনক বলা চলে। গাড়ি নং 1 বাঁদিকে ঘুরতে চায়। গাড়ি নং 2 এসে ঐ একই পথে ঘুরছে। এদিকে গাড়ি নং 3 আসছে পূর্ণগতিতে। এক্ষেত্রে আগে থেকে সম্পূর্ণ সাবধান না হলে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

পরের পতায় আরও কয়েকটা ছবি দিয়ে মোড়ের মাথায় মোটর গাড়ির ঘোরাবার সময়ে নানা দুর্ঘটনা ভাল করে বোঝানো হলো।

ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে গাড়ি নং 1 বড় রাস্তা ক্রস করে বাঁদিকে ঘুরতে চায়। এদিকে গাড়ি নং 2 বাঁদিক দিয়ে পূর্ণগতিতে আসছে। এখানে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে, গাড়ি নং 1 পথ ক্রস করে বাঁদিকে মোড় ঘোরার জন্যে চলেছে। গাড়ি নং 3 বড় রাস্তা দিয়ে আসছে পূর্ণগতিতে। গাড়ি নং 2 বাঁদিক থেকে আসছে। এক্ষেত্রে তিনটি গাড়ির গতিই একদিকে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে প্রতিটি গাড়ির চালক সাবধান না হলে বিপদ অনিবার্য।

ছবি নং c-তে দেখা যাচ্ছে গাড়ি নং 1 পথ ক্রস করে বাঁদিকে মোড় ঘুরবে। এদিকে বড় রাস্তা ধরে গাড়ি নং 2 আর 4 উল্টো দিক থেকে পূর্ণগতিতে আসছে। এক্ষেত্রেও বিপদ ঘটা খুব স্বাভাবিক।

ছবি নং d-তে দেখা যাচ্ছে, গাড়ি নং 1 বাঁদিকে ধাবমান হয়ে মোড় ঘুরতে চলেছে। এদিকে দুদিক থেকে বড় রাস্তা দিয়ে আসছে গাড়ি নং 2 এবং 4। এক্ষেত্রে যদি গাড়ি নং 2 আর 4 একত্রে ব্রেক না চাপে তাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য।

ছবি নং e-তে দেখা যাচ্ছে চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি নং 1 একটি রাস্তা দিয়ে মোড় ঘুরতে চলেছে। এদিকে তিনদিক থেকে আসছে তিনটি গাড়ি—গাড়ি নং 2, 3 এবং 4। এক্ষেত্রে অন্য গাড়িগুলি গতি বন্ধ না করলে বিপদ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ছবি নং f-এ দেখা যাচ্ছে দুটি গাড়ি 1 ও 3 চৌরাস্তার মোড়ে, পরস্পর বিপরীত দিকে মোড় ঘুরতে চায়। ফলে কিভাবে গাড়ি দুটি বিপদে পড়তে পারে তা বোঝা যাচ্ছে।

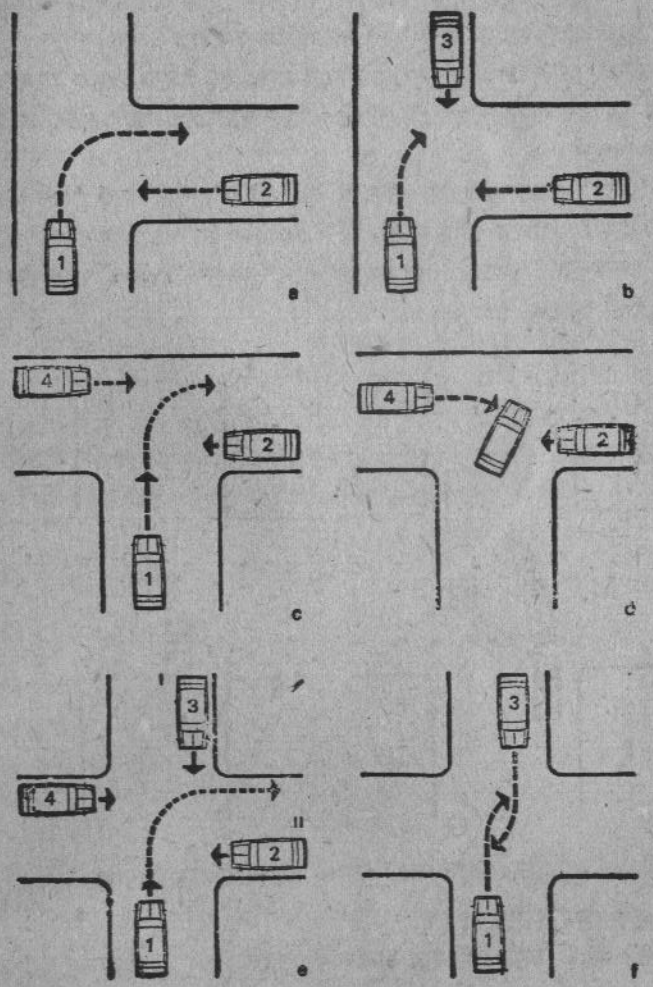

গাড়ি ঘোরানোর সময় সম্ভাব্য বিপদ

এ অবস্থায় মোড়ে যদি বাম এবং ডানদিক থেকে আরও দুটি গাড়ি একই সময়ে ছুটে আসে তাহলে দুর্ঘটনা এড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এছাড়া চৌরাস্তার মোড়ে নানাদিকে যাতায়াত করতে ইচ্ছুক অনেকগুলি গাড়ির মধ্যে চলার পথের গোলমাল হবার দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব তা পরের ছবিতে দেখুন।

ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে গাড়ি নং 1, 2, 3 চৌরাস্তার মোড় থেকে ডাইনে ঘুরতে যায়। এদিকে গাড়ি নং 4, 5, 6 উল্টোদিকের পথ থেকে এসে ঘুরতে চায়। তার ফলে কিভাবে মুখোমুখি এসে পড়া সম্ভব, তা ছবি দেখলে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়।

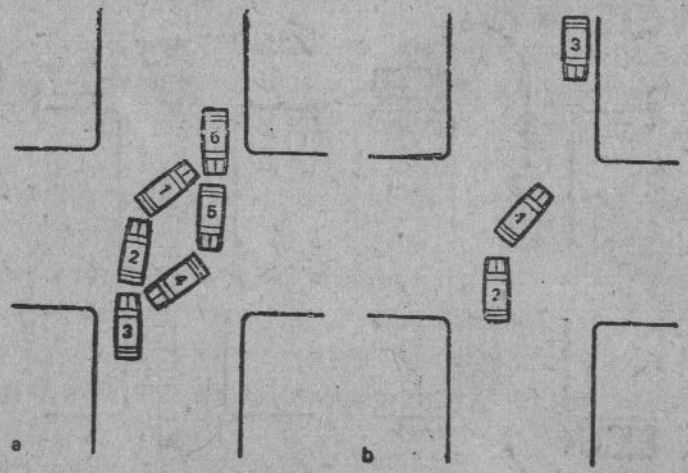

চৌরাস্তার মোড় পার হওয়া ও গাড়ি ঘোরানোর বিপদ

তারপর দেখুন ছবি নং b।

গাড়ি নং 1 মোড় পার হয়ে ডানদিকে ঘুরতে চায়। গাড়ির নং 2 পিছনে আসছে, সে সোজা যাবে। গাড়ির নং 3 আসছে উল্টো দিক থেকে—সে সোজা চালাবে। এক্ষেত্রেও একইভাবে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

জটিল পথের মোড়

এবারে কতকগুলি জটিল পথের মোড় বা জংশন সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সব সময়ে দুটি রাস্তা ঠিক সোজাভাবে বা + চিহ্নের মতো হয় না। প্রায় মোড়েই নানা উল্টোপাল্টা ক্রসিং দেখা যায়। এই সব অবস্থায় গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

নানা ধরনের জটিল মোড় ড্রাইভারকে পার হতে হয়। এখানে বিভিন্ন জটিল মোড়ের অবস্থা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

ছবি নং a-তে দেখা যাচ্ছে দুটি পথ কিভাবে কোণাকুণি এসে একটি জটিল জংশন সৃষ্টি করেছে।

ছবি নং b-তে দেখা যাচ্ছে দুদিক থেকে দুটি রাস্তা কিভাবে বেঁকে এসে প্রধান পথের সঙ্গে মিশে একটি জংশন সৃষ্টি করেছে।

ছবি নং c এবং d-তে দেখা যাচ্ছে, দুটি পথ প্রধান রাস্তার সঙ্গে সোজাসুজি না মিশে, পৃথকভাবে মিশে জটিল জংশন সৃষ্টি করেছে। তাই ছবি নং d-তে দেখানো হচ্ছে, এই পথে এসে কিভাবে গাড়ি ঘোরানো উচিত।

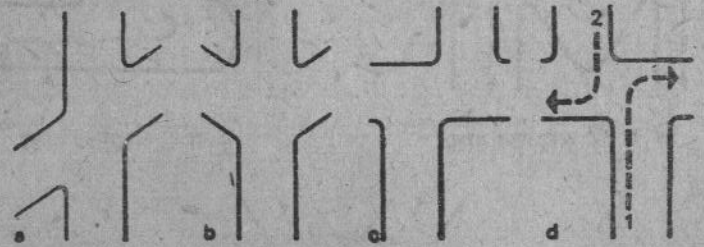

নানা জটিল পথের মোড়

এছাড়া আরও জটিল কতকগুলি নানা ধরনের আঁকাবাঁকা পথের ছবি দেওয়া হলো। সে সব জায়গাতে গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হবে। এদের ইংরাজী অক্ষর অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন :—(1) H-টাইপ রোড, (2) K-টাইপ রোড, (3) M বা W-টাইপ রোড, (4) S বা Z-টাইপ রোড, (5) Y-টাইপ রোড প্রভৃতি। এইসব পথ কিভাবে গেছে, তা আগে থেকে না জানলে

চালকদের বিপদে পড়া খুব স্বাভাবিক। এই সব পথের আগে সিগন্যাল বোর্ড দেওয়া থাকে। তা দেখলেই রাস্তার টাইপ জানা যায়। তাছাড়া অনেক সময়

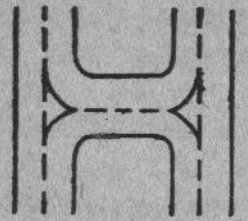

H-আকৃতির রাস্তা

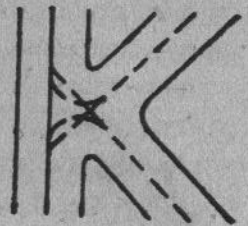

K-আকৃতির রাস্তা

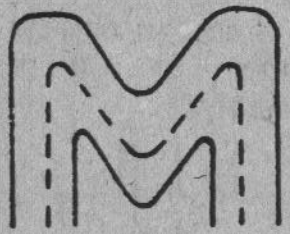

M বা W-আকৃতির রাস্তা

S বা Z-আকৃতির রাস্তা

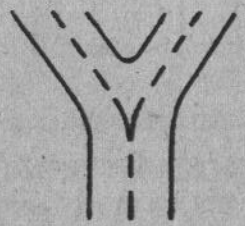

Y-আকৃতির রাস্তা

এ সব পথে বিপরীত দিক থেকে গাড়ি এলে, তা চোখে না পড়ার জন্যেও বিপদ ঘটে।

অনেক সময় গাড়ি গোলভাবে ঘুরিয়ে নিতে হয়—যদি সেখানে চারটি পথের ক্রসিং থাকে। তার ঠিক কেন্দ্রে থাকে গোল পার্ক। অনেক সময় দুটি রাস্তার কাটিংয়ের কেন্দ্রে থাকে গোল রাস্তা। তারও কেন্দ্রে পুলিশ থাকে বা বড় রাস্তার মুখে থাকে লাল-সবুজ বাতির সংকেত।

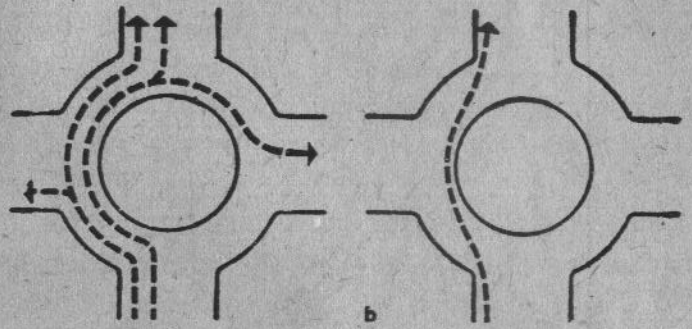

চৌরাস্তার মোড়, কেন্দ্রস্থলে গোল রাস্তা

এই রাস্তা দিয়ে অনেকগুলি গাড়ি একসঙ্গে যখন চলবে তখন আইনসঙ্গত ভাবে, কিভাবে গাড়ি চালানো উচিত তা ছবি নং a-তে দেখানো হলো। ছবি নং b তে দেখানো হলো একটি গাড়ি কিভাবে একপ্রান্ত থেকে পথ পার হয়ে অন্য প্রান্তে যাবে। এইভাবে যাওয়াটাই হলো স্বাভাবিক নিয়ম। এ ছাড়া উল্টোপাল্টা চালাতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক।

পাঁচ বা ততোধিক পথের জোট

অনেক সময় পাঁচটি পথ এসে একসঙ্গে মিলিত হয়। এই সব অবস্থায় ঠিক আইনমতো মোড় ঘোরাতে না পারলে, গাড়ির দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

পাঁচ বা ততোধিক পথের জংশনের প্রতিটি মোড়ের মাথায় উপযুক্ত সময়ে গাড়ি চালানো বন্ধ রাখা বা শুরু করার জন্যে লাইটিং সিগন্যাল ব্যবস্থা থাকে। ছবিতে একটি ছয় পথের মোড়ের প্রতি মোড়ের কোথায় বাতি থাকবে, তা GO ও stop লিখে বোঝানো হয়েছে। H স্থান থেকে যখন গাড়ি C স্থানের দিকে আসবে, তখন অন্য একটি গাড়ি H স্থানে থেকে P স্থানে যেতে পারে। ছবিতে

তা ডট্ চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে। কিন্তু তখন বিপরীত দিকের পথের গাড়ি বন্ধ থাকবে, W ও তার পাশের দুটি গাড়িও তখন বন্ধ থাকবে। ছবিটি

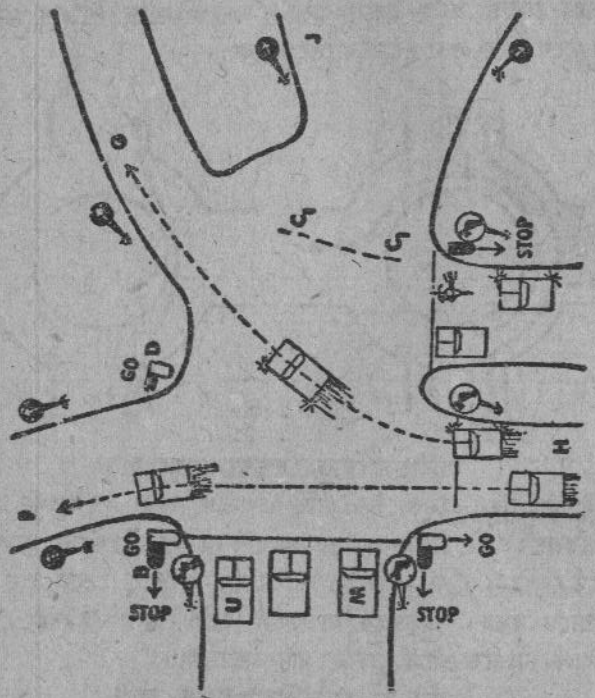

একটি ছ-মাথার মোড়

ভাল করে লক্ষ্য করলে এবিষয়ে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে। এই সব পথে ভুল চালালে, বিপদ না ঘটলেও পুলিশ গাড়ির নম্বর লিখে নেবে ও সতর্কতামূলক নোটিশ পাঠাবে।

ভুল পাশ অন্ লংকেত

ভুল পাশ-অন্ সংকেত দেওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ, তা সব সময় মনে রাখা উচিত। মনে করা যাক, একটি বড় লরী যাচ্ছে আর উল্টোদিক থেকে একটি ট্রাক আসছে।

এখন লরীর পাশে পাশে যাচ্ছে একটি ট্যাক্সি। লরীর ড্রাইভার পাশ-অন্ সংকেত দিল। ট্যাক্সি পূর্ণগতিতে লরীকে ওভারটেক করতে গেলে। কিন্তু লরীর ডাইভার গতি কমালো না। তখন ঐ ট্যাক্সির সঙ্গে সামনে থেকে আগত ট্রাকের সংঘর্ষ হতে বাধ্য। অবশ্য যদি সামনের ট্রাকের ড্রাইভার আগে থেকেই গতি সামলে নেয়, তাহলে দুর্ঘটনা বাঁচতে পারে। তাই কখনো এইভাবে ভুল পাশ-অন্ সংকেত দিতে নেই। অনেক ড্রাইভার আবার ইচ্ছা করেই এই ধরনের অন্যায় কাজ করে অপরের ক্ষতি করার জন্যে। তারা পথ চলার পক্ষে মারাত্মক বিপদস্বরূপ। মোড়ের মাথায় গাড়ি ওভারটেক করতে যাওয়াও খুব অন্যায়। তেমনি অন্যায় খুব উঁচু-নিচু পথে বা পার্বত্য পথে ঘন ঘন ওভারটেক করতে যাওয়া।

আর একটা কথা হলো, কখনো গাড়ির হর্ণ না বাজিয়ে অর্থাৎ সামনের গাড়িকে সতর্ক না করে, ওভারটেক করতে যাওয়া উচিত নয়। এতেও বহু সময় বিপদ আসে।

যদি পথে গাড়ি আট্‌কে যায়

অনেক সময় দেখা যায় পথ চলতে চলতে, গাড়ি হঠাৎ কাদায় আট্‌কে গেল। এমনভাবে গাড়ি আট্‌কালো যে, স্টার্ট দিলে চাকা ঘুরছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না।

ভাল ড্রাইভার এই অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা দেখলে আগে থেকেই সাবধান হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকে বোঝাও সম্ভব হয় না।

এসব ক্ষেত্রে গাড়িকে প্রথমে দ্বিতীয় গীয়ারে নিয়ে গিয়ে এ্যাকসিলিরেটরের উপরে চাপ দিতে হবে। তাহলে গাড়ির শক্তি বৃদ্ধি পাবে ও গাড়ি এগিয়ে যাবে। তবে এর মধ্যে যদি গাড়ির কোনও পার্টস্ খুলে যায়, তাহলে অবশ্য গাড়ি বের করা সহজে সম্ভব হবে না।

কোন সময় গাড়িকে ঝাঁকুনি দিয়ে বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে গাড়ির নানা যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে যাবার আশংকা থাকে।

অনেক সময় এই ভাবে ভুল ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে গাড়ির গীয়ারের মধ্যস্থ পিনিয়ান ভেঙ্গে যায়।

যদি গাড়ি কাদা থেকে তোলা না যায় তাহলে অবশ্য অন্য গাড়ির সাহায্যে

নিতে হবে। গাড়িকে চেন নিয়ে অন্য গাড়ির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে তার সাহায্যে তাকে কাদা থেকে তুলে দিতে হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ড্রাইভিং-এর উপরে আবহাওয়ার প্রভাব

মোটর গাড়ি চালানোর উপরে নানা ধরনের আবহাওয়ার বিরাট প্রভাব আছে। রোদ, জল, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতির সময় কি কি গোলমাল হতে পারে এবং এই সময় কিভাবে গাড়ি চালানো উচিত, তা জেনে রাখতে হবে। এই সব নানা প্রাকৃতিক গোলমালের জন্যে প্রায়ই মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাই সবার আগে একটা কথা জানা উচিত—যদি প্রকৃতি বিমুখ হয় অর্থাৎ ঝড়, জল ইত্যাদি হয় তাহলে গাড়ি কখনো খুব জোরে চালাতে নেই। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে ড্রাইভিং করতে হবে।

রৌদ্র

রৌদ্র হলো গাড়ি চালাবার পক্ষে আর একটি বিপদস্বরূপ। যদি রোদের তাপ অল্প হয়, তাহলে ততটা ভয় নেই, তবে যদি রোদ খুব বেশী হয়, তা হলে নানা অসুবিধা ঘটে।

প্রথমতঃ, অতিরিক্ত রৌদ্রে পথঘাট, বিশেষ করে পিচের রাস্তায় পিচ গলে যায়। তার ফলে গাড়ি চালানো অসুবিধাজনক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তীব্র রৌদ্রে, শরীর ক্লান্ত হয়ে মাথা গরম হয়ে ওঠে। ফলে মনোযোগ দিয়ে, মন স্থির করে গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ঠিক না থাকলে গাড়ি চালাবার সময় অনেক রকম অসুবিধা ঘটে থাকে।

উজ্জ্বল রোদ হলে তা সামনের উইণ্ডস্ক্রীনে প্রতিফলিত হয়—তা চক্‌চক্‌ করে। তার ফলে গাড়ি চালাতে অনেক অসুবিধা হয়।

রৌদ্র যদি বাঁকাভাবে পড়ে, তাহলে পাশের গাড়িতে প্রতিফলিত হয়ে এই

গাড়ির উপরে পড়ে—তার ফলেও ড্রাইভিং করতে অসুবিধা হয়। রৌদ্র ও তাপ বেশী হলে, তার ফলে অনেক সময় গাড়ি শীতল করার ব্যবস্থা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বেশী পেট্রল পোড়ে। তা ছাড়া ইঞ্জিনের ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়।

বৃষ্টি

গাড়ি চালানোর সময়ে বৃষ্টি নামলে তা নানাভাবে গাড়ি চালাবার পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এইজন্য অনেক ড্রাইভারই খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হলে গাড়ি চালাতে চান না।

বৃষ্টি নামলে, গাড়ির সামনের কাঁচে জল পড়ে তা ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। গাড়িতে ওয়াইপার থাকলে এ অবস্থায় সুবিধা হয়। তবে যদি ওয়াইপার খারাপ থাকে তাহলে এ অবস্থায় গাড়ি চালানো বন্ধ রাখা উচিত।

দ্বিতীয় কথা হলো পথের অবস্থা। বৃষ্টি পড়লে পথ যায় ভিজে। তখন গাড়ির টায়ারের ও পথের সঙ্গে ঠিকমতো ঘর্ষণ ঘটে না। ব্রেক কষলেও গাড়ি দাঁড়াতে পারে না—কারণ ভেজা পথে চাকা পিছলে যায়। তাই বৃষ্টি নামলে ধীরে গাড়ি চালানো কর্তব্য।

তৃতীয় বিষয় হলো বৃষ্টি নামলে পথ কর্দমাক্ত হয়। পথ চলতে গেলেই দুদিকে কাদা ছিট্‌কায়। কোনও পথচারীর গায়ে যেন কাদা ছিট্‌কে না যায়, তা দেখতে হবে।

আবার যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়ে পথে জল জমে যায়, তাহলে আর এক বিপদ। পথে ফুটখানেক জল জমে গেলে গাড়ি চলতে চলতে তার নিচ দিয়ে গাড়ির মধ্যে জল ঢুকতে থাকে—তখন গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

কুয়াশা

কুয়াশাও ড্রাইভিং-এর পক্ষে নানা বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। কুয়াশা বেশী হলে পাশের, পিছনের বা সামনের গাড়ি ভালভাবে নজরে পড়ে না, এই অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। তাই কুয়াশা হলে সব সময় হর্ণ দিয়ে আস্তে আস্তে চালাতে হবে।

কুয়াশাতে সামনের কাঁচেও জল জমে। তাই যদি গাড়ির ওয়াইপার ঠিক না থাকে তাহলে এই অবস্থায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক হয়ে যায়। কুয়াশা খুব বেশী হলে তাতে পথের Surface ভিজে যায়—তাতেও পথ চলতে অসুবিধা

ঘটায়। এসময় গাড়ি জোরে চালানো কদাচ উচিত নয়।

কুয়াশার সময় সর্বদা গাড়িকে একেবারে পথের বাঁদিক ঘেঁষে ধীরে ধীরে চালাতে হবে। কোনও সময়ই ওভারটেকিং করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কুয়াশা বেশী থাকলে অবশ্যই খুব একাগ্র মনে গাড়ি চালাতে হবে।

ঝড়

জোরে বাতাস বা ঝড় বইলে, তার ফলে যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। ঝড়ে ধুলো-বালি ওড়ে, তার ফলে পথ ভাল দেখা যায় না। তাই এসময় সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়।

অনেক সময় ঝড়ে গাছ ভেঙ্গে পড়তে পারে। কোনও কিছু উড়ে আসা অসম্ভব নয়। যদি পাশ থেকে খুব জোরে ঝড় বয়, তাহলে অনেক সময় গাড়ি উল্টে যায়। তাই এসময় খুব ধীরে ও চারদিকে ভাল করে নজর রেখে গাড়ি চালাতে হবে।

তুষারপাত

তুষারপাত অবশ্য সকল স্থানে হয় না—কেবল পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া। ভাবতে নানা জায়গায় শীতকালে বরফ পড়ে, এতে গাড়ি চালানো কষ্টকর। কুয়াশায় যা অসুবিধা, তুষারপাতে তার চেয়েও বেশী অসুবিধা। তাই খুব সাবধানে মন দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

তুষারপাতের মধ্যে গাড়ি না চালানোই ভাল। সম্ভব হলে কারও বাড়িতে বা কোনও আশ্রয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে এ সময় বিশ্রাম নেওয়া উচিত। বিশেষ করে উঁচু-নিচু পার্বত্য পথে যদি বরফ পড়ে তাহলে বিপদ আরও বেশী হয়। এই অবস্থায় গাড়ি যদি একান্তই চালাতে হয়, তাহলে তা খুব ধীরে চালাতে হবে এবং ঘন ঘন হর্ণ দিতে হবে যাতে অন্য গাড়ি সাবধান হয়ে যায়।

খুব দূরের পথে যাত্রা করার জন্য সতর্কতা

খুব বেশী দূরের পথে যাত্রা করতে হলে, সবসময় সতর্ক হতে হবে, যাতে গাড়ি হঠাৎ পথের মধ্যে বিগড়ে না যায় বা কোনও গোলমাল না হয়। তাই এই অবস্থায় গাড়ির টায়ার, টিউব, ব্রেক, গীয়ার ইত্যাদি সব পার্টস্ ঠিক আছে কি না ; তা আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে।

পেট্রল ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে নিতে হবে। দূর পথ পাড়ি দিতে গেলে অনেক ছোটখাট দরকারি জিনিসপত্র গাড়িতে রাখতে হবে। তার কারণ যদি পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, বা কোনও কারণে কিছু গোলমাল হয়, তাহলে ছোট-খাট মেরামতী করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তাই এই সব পার্টস সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। কোন্‌টা কি কাজ করে, তাও ভালভাবে জানা উচিত। দূরের পথে যাত্রা করতে গেলে, একদিকে যেমন ড্রাইভারের

দূরপথে যাত্রার জনা গাড়িতে বসার সঠিক নিয়ম

জন্য খাদ্য ও পানীয় চাই, তেমনি চাই গাড়িকে ঠিকমত নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুতি।

এবার দূরের পথে গাড়ি বের করতে হলে কি কি জিনিসপত্র ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে হবে তার একটা বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে দূরের জন্য এর কোনটারই প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

১। দূরের পথে যেতে গেলে পেট্রল ট্যাঙ্ক পেট্রল ভর্তি করা ছাড়াও পাঁচ লিটার পেট্রলের তিনটি টিন সঙ্গে রাখা উচিত। কারণ পথে পেট্রল পাম্প কতটা দূরে দূরে পড়বে, তা জানা সম্ভব নয়। যদি ডিজেল চালিত গাড়ি হয়, তাহলে ডিজেল সঙ্গে নিতে হবে।

২। এক বোতল Distilled Water অবশ্য রাখতে হবে। যদি ব্যাটারীতে জল কম থাকে তবে তা পুরো করে নিতে হবে।

৩। ইঞ্জিনে কমপক্ষে দুই লিটার পরিমাণ মবিল অয়েল ভর্তি করে নিতে হবে। ৪। এক টিন ব্রেক অয়েল অতিরিক্ত রাখতে হবে।

৫। আধ থেকে এক পাউন্ড গ্রীজ সঙ্গে রাখা উচিত।

৬। এক লিটার C. Oil সঙ্গে রাখা উচিত।

৭। গ্রীজ ব্যবহার করার জন্যে গ্রীজ গান চাই। এটাও সঙ্গে রাখা কর্তব্য।

৮। দুটি অতিরিক্ত লাইটের বাল্‌ব সঙ্গে রাখা উচিত—তাহলে পথে কোনও বাল্‌ব ফিউজ হয়ে গেলে বিপদে পড়তে হবে না।

৯। অয়েল ক্যান বা তেলের কুপি—যার দ্বারা তেল প্রয়োগ করতে হয়, তা সঙ্গে রাখতে হবে। ১০। ডাই সঙ্গে রাখতে হবে।

১১। প্রেসার গেজ বা প্রেসার মাপার যন্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

১২। প্রায়ই ছোট বা বড় স্ক্রু খোলার প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই একটি স্পেনার সেই সঙ্গে রাখা উচিত।

রেঞ্জ বা স্পেনার সেট হলো স্ক্রু খোলার যন্ত্র। এতে বিভিন্ন আকৃতির স্ক্রু খোলার ব্যবস্থা থাকে। এগুলি অবশ্যই থাকা উচিত। নিজের গাড়ির হিসাব মতো আকৃতির স্পেনারগুলি রাখতে হয়।

পেট্রল ও ডিজেল চালিত যন্ত্রের অংশগুলি খুলতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্পেনার চাই।

১৩। অনেক সময় চাকার হাওয়া কমে যায়। কিন্তু কাছাকাছি পেট্রল পাম্প পাওয়া গেল না—তখন চাকায় হাওয়া ভরতে অসুবিধা হয়। তাই একটি

পাম্প করার যন্ত্র বা ইন্‌ফ্লেটার রাখা কর্তব্য।

১৪। একটি বা দুটি হাতুড়ি সঙ্গে রাখতে হবে। এই হাতুড়ি একদিকে ঠোকার ব্যবস্থা এবং অন্য দিক সরু ও দুইভাগে বিভক্ত হবে। যন্ত্রপাতির কাজে এই ধরনের হাতুড়িই ব্যবহৃত হয়।

১৫। একটি প্লাস সঙ্গে রাখতে হবে। প্লাস দিয়ে তার জোড়া যায়, কাটা যায়, মোড়া যায়। তাই এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া এর দ্বারা স্ক্রু বা তার টেনে তোলা যায়।

১৬। একটি বা দুটি ছোট-বড় স্ক্রু ড্রাইভার সঙ্গে রাখতে হবে।

১৭। গাড়িতে একটি জ্যাক্‌ অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। এর সাহায্যে গাড়ির সামনের অংশ বা পিছনের অংশ বা যখন যেটা প্রয়োজন, তা মাটি থেকে কিছুটা উপরে তুলে গাড়ি মেরামত করা যায়। এতে তিনটি লম্বা রড, থাকে যা লিভারের সাহায্যে মুড়ে ছোট করা হয়।

১৮। একটি টায়ার লিভার সঙ্গে রাখতেই হবে। এর দ্বারা টায়ার খুলে নেওয়া বা তা লাগানো সম্ভব হয়। টায়ারের রিম খুলতে বা চড়াতে এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এটি একটি চ্যাপ্‌টা পাতের মতো হয়—তার সঙ্গে আগা বেঁকানো একটা অংশ থাকে।

১৯। কয়েক টুকরা ছোট-বড় কাঠ রাখতে হবে—এগুলি অনেক কাজেই প্রয়োজন হয়। গাড়ি উঁচু করতে হলে টুকরো কাঠ দরকার।

২০। একটি ছেনি সঙ্গে রাখতে হবে।

২১। প্লাগ খোলা বা আটকানোর জন্য একটি প্লাগ স্পেনার রাখতে হবে।

২২। একটি হুইল স্পেনার সঙ্গে রাখা উচিত। এর দ্বারা টায়ারের নানা নাট্‌-বল্টু খুলতে বা আট্‌কাতে পারা যায়। ছোট-বড় যে-কোনও আকারের নাট্‌-বলটু হোক না কেন, এর সাহায্যে তা খোলা ও আট্‌কানো যাবে।

২৩। কিছুটা ফ্রেঞ্চ চক্‌ রাখতে হবে। এটি টায়ার মেরামত করতে প্রয়োজন হয়।

২৪। কিছুটা কাঁচা রবার সঙ্গে রাখতে হবে।

২৫। গরম করার জন্যে কয়েকটি মোমবাতি বা একটি স্পিরিট ল্যাম্প রাখা উচিত।

২৬। কিছুটা দড়ি সঙ্গে রাখা ভালো—১০-১২ গজ হলেই চলবে।

২৭। একটি ফার্স্ট এডের বাক্স সঙ্গে রাখা কর্তব্য।

২৮। একটি রবারের পাইপ সঙ্গে রাখলে খুব ভাল হয়।

২৯। অতিরিক্ত চাকা রাখা কর্তব্য (১টি)।

৩০। একটা ছোট বালতি, দু-তিনটি টিনের কৌটো ও কিছুটা ছেঁড়া কাপড় সঙ্গে রাখা উচিত।

এই সব বস্তুগুলি সঙ্গে না নিয়ে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে বের হওয়া যায় না। তা ছাড়াও ড্রাইভারকে গাড়ি মেরামতীর সাধারণ জ্ঞান রাখতে হবে। এবারে হঠাৎ প্রয়োজন হলে পথের মাঝে ড্রাইভারকে গাড়ি মেরামত করার উপায় সম্পর্কে বলা হচ্ছে। একে বলা হয় Emergency repair.

রাস্তার মাঝে ছোটখাট মেরামতীর কাজ

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ নানা কারণে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। সে সময় ভাল ড্রাইভারকে অবশ্যই ছোটখাট মেরামতীর কাজ জানতে হয়। খারাপ হয়ে গেলে, যদি সামান্য দু'একটা মেরামতী করলে গাড়ি সেরে যায়, তবে তাতে খুব ভাল ফল হয়—চলার সময় ভয় থাকে না। একে ইংরাজীতে বলা হয় এমার্জেন্সি রিপেয়ার।

১। যদি চলতে চলতে হঠাৎ গাড়ির ব্যাটারী ডাউন হয়ে যায়, অথবা ব্যাটারী ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে প্রথম কয়েকজন মিলে ঠেলে গাড়ি স্টার্ট করে নিতে হবে। তারপরে কারখানায় গিয়ে ব্যাটারীর চার্জ করে নেওয়া যাবে। যদি তাতেও কাজ না হয় তাহলে অন্য কোনও গাড়ি থামিয়ে, তার সাহায্য নিতে হবে। অন্য গাড়ির ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্টার্ট করিয়ে নেওয়া যাবে। কিংবা চেন বা দড়ি দিয়ে অন্য গাড়ির সঙ্গে বেঁধে স্টার্ট করে নেওয়া সম্ভব।

ব্যাটারী যদি একেবারে কেটে যায়, তাহলে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যাবার পর ডায়নামোতে চার্জ করে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে হবে। এতে ডায়নামোর ক্ষতি হতে পারে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যাবে। তারপর ব্যাটারী পাল্টে নেওয়া যাবে।

২। যদি কোন স্পার্কিং প্লাগ কাজ না করে তাহলে অন্য প্লাগগুলো পরিষ্কার

করে নিতে হবে, যদি তাতেও কাজ না হয়, তাহলে ইনসুলেটারের অংশ একটু শর্ট করে দিতে হবে।

৩। যদি গাড়ির পেট্রোল-ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল চুঁইয়ে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে কোনও জায়গা ফুটো হয়েছে। কোন্ জায়গা থেকে পেট্রোল পড়ছে, তা দেখে ঐ জায়গাটা বন্ধ করে দিতে হবে।

এজন্যে অনেকে গাড়িতে কাপড়কাচা সাবান রাখেন। যদি পেট্রোল-ট্যাঙ্কের পাইপ ভেঙে যায়, তাহলে সাময়িকভাবে ঐ পাইপের জায়গায় রবারের নল লাগিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। পরে তা পাল্টাতে হবে।

৪। যদি এ. সি. পাম্প কজে না করে কিংবা পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ফেটে যায় তাহলে একটা ছোট টিনে পেট্রোল ভরে উঁচু করে সেটা ঐ জায়গায় বেঁধে দিতে হবে। ঐ টিনে একটা রবারের নল লাগিয়ে মুখ দিয়ে একটু পেট্রোল টেনে নলের আগা পর্যন্ত আনতে হবে। তারপর ঐ নলের মুখ কার্বোরেটারের ইনলেট ইউনিয়নের ফ্লুইডের সঙ্গে জড়ে দিতে হবে।

এভাবে করলে ধীরে ধীরে পেট্রোল কার্বোরেটারের মধ্যে যেতে থাকবে। গাড়িও আবার চলতে থাকবে। পরে ভালভাবে মেরামত করতে হবে।

৫। যদি ডায়নামোতে কারেন্ট উৎপন্ন হচ্ছে না বলে দেখা যায়, অর্থাৎ সেটি চার্জ না করে, তাহলে এর কমপুটেটারটি ভাল করে সাফ করে দিতে হবে। তারপর দেখতে হবে ফ্যান বেল্ট ঢিলা আছে কিনা। যদি ঢিলা থাকে, তাহলে বেশ ভালভাবে টাইট করে দিতে হবে।

ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে যে, ডায়নামোর কানেক্শন ও কাট আউট টার্মিন্যাল ঢিলা না থাকে। যদি দেখা যায়, সেটা ঢিলা আছে, তাহলে খুব ভালভাবে কষে দিতে হবে।

যদি দেখা যায়, বুরুশ ঘষা খেয়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তার জায়গায় কাঁসা নরম কাঠের টুকরো লাগিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এতে সাময়িকভাবে কাজ চলবে।

৬। যদি ইগ্নিশান সুইচ ঠিকমতো কাজ না করে, বা অকেজো হয়ে যায় তবে দুটি তার খুলে নিয়ে, একসাথে জুড়ে দিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করে নিতে হবে। ইঞ্জিন বন্ধ করার সময় আবার দুটি তারই খুলে দিতে হবে, যাতে সুইচ অফ

হবার কাজ করে। আপনা থেকেই যদি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেও তার দুটি অবশ্যই খুলে নিতে হবে।

৭। যদি ব্যাটারীর থেকে কয়েলের মধ্যে শর্ট থাকে বা কোনও গোলমাল থাকে, তাহলে সেটা আগে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝে নিতে হবে। তারপর পজিটিভ থেকে একটা তার নিয়ে, ইগ্নিশান সুইচ থেকে আসা তারের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ও তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট করে নিতে হবে। এইভাবে কৌশলে সাময়িক কাজটুকু সেরে নেওয়া যায়।

এই তার খুলে নিলে, সুইচ অফ্ করার কাজ করবে। যদি সুইচের চাবি হারিয়ে যায়, তাহলেও এইভাবে গাড়ি স্টার্ট করে নেওয়া যায়।

৮। যদি ডায়নামো ঠিকমতো কাজ করে কিন্তু আউট্ কারেণ্ট ডায়নামোর আগে অর্থাৎ বাইরের দিকে এগিয়ে যেতে না পায়, তাহলে কাট-আউটের পয়েণ্ট টার্মিন্যাল সাফ করে নিতে হবে।

কিন্তু যদি সাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও কাজ না হয়, তাহলে ডায়নামোর আর্মেচারের তার খুলে ব্যাটারীর তারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে হবে এবং বাতি জ্বালিয়ে দিতে হবে। তবে এর ফলে, অনেক সময় আর্মেচার জ্বলে যাওয়া সম্ভব। তাই এতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তবে নেহাৎ বিপাকে পড়লে এছাড়া উপায় থাকে না।

ইঞ্জিন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আর্মেচার ও ব্যাটারীর তারখুলে ফেলতে হয়। খুলে না দিলে অনর্থক কারেণ্ট নষ্ট হয়। এইভাবে বেশীক্ষণ চালানো উচিত নয়—সত্বর মেরামত করতে হবে।

৯। এবার বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং খারাপ হলে কি কি করতে হবে তা দেখা যাক্। হঠাৎ যদি একটি বিগ্ এণ্ড বিয়ারিং জ্বলে যায়, তাহলে চেম্বার খুলে বিয়ারিং-এর জায়গায় এক টুক্‌রো চামড়া লেপ্‌টে দিতে হবে যদি চামড়া না পাওয়া যায় জুতোর চামড়া সামান্য কেটে লাগিয়ে দেওয়া চলে। তাতেও যদি কোনও কাজ না হয় তাহলে পিস্টন শুদ্ধ বিয়ারিং খুলে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাময়িকভাবে এতে কাজ চলে যাবে।

১০। যদি ইঞ্জিনের একটা পিস্টন হঠাৎ ভেঙে যায়, তাহলে ইঞ্জিনের হেড ও চেম্বার খুলে ভাঙা পিস্টনটি খুলে নিতে হবে। তারপর তিনটি বা পাঁচটি

পিস্টন দিয়ে (৪ বা ৬টি থাকলে) ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর পিস্টন পাল্টে নিতে হবে।

অবশ্য এই সময় ইঞ্জিনের শক্তি খুব কম থাকে। এতে গাড়ি চলবে বটে, তবে ভারী মাল টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই প্রয়োজন হলে গাড়ি খালি করে নিতে হবে।

১১। অনেক সময় কোনও নির্জন স্থানে বা বনে-জঙ্গলে হঠাৎ চাকার টিউব পাংচার হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে অতিরিক্ত চাকা নেই বা মেরামত করার (ভলকানাইজিং) ব্যবস্থাও নেই।

তখন টিউবটি চাকা থেকে খুলে নিতে হবে। তারপর টায়ারের মধ্যে ঘাস, কাগজের টুকরো ইত্যাদি ভরে, গাড়ি আস্তে আস্তে কারখানার উদ্দেশে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ অবস্থায় কখনোই প্রথম ও দ্বিতীয় গীয়ার ব্যবহার করতে নেই।

১১। যদি গাড়ির ব্রেক জাম হয়ে যায়, তাহলে তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাতেও কাজ না হয়, তাহলে ফুটব্রেকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বুঝে ধীরে ধীরে হ্যাণ্ডব্রেকের সাহায্যে গাড়ি কারখানায় নিয়ে যেতে হবে। অনেক সময় ব্রেক ড্রাম খুলে পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে নিলেও ভালভেবে ব্রেক কাজ করে।

১৩। গাড়ির চাকা (টায়ার), পাথরের কুচি বা রেতে (File) ঘষা লেগে কেটে গেলে, এক্সিলের উপরে জ্যাক লাগিয়ে গাড়ি উঁচু করে কাঁচা রবার গরম করে সেটা ঠিক করে লাগিয়ে দিতে হবে। এইজন্যে একটা ল্যাম্প ও কিছুটা কাঁচা রবার গাড়িতে রাখা উচিত।

১৪। যদি গীয়ার সিস্টেম খারাপ হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারা যায়, তাহলে খুব ধীরে ধীরে ১নং গীয়ার দিয়ে গাড়িকে কারখানায় পৌঁছে দিতে হবে।

১৫। সব সময় গাড়ি পরীক্ষা করার সময় দেখতে হবে, রেডিয়েটার এবং ব্যাটারীতে জল আছে কিনা। ব্যাটারীর জন্য চাই ডিস্টিলড্ ওয়াটার—তা না পেলে পরিষ্কার জল নাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিয়ে সাময়িকভাবে চালানো যায়।

এই সব ছোটখাটো রিপেয়ারিং বা মেরামতী আরও আছে। এগুলো সব নির্ভর করে ড্রাইভারের উপস্থিত বুদ্ধির উপরে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গাড়ি রাখার নিয়ম বা গ্যারেজিং (Garaging)

মোটর গাড়ি ফিরে এলেই তাকে নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে রেখে দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজন্যে গ্যারেজ ঘর ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে হুড, গদি পিঠ, পাপোস্ প্রভৃতি সব কিছু ভাল করে বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে হয়। তারপর প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল দিয়ে গাড়ির বডির বাইরের দিকে ধুয়ে ফেলতে হয়।

গাড়িতে ধুলো জমলে তা আগে ঝেড়ে নিতে হয়, তা না হলে ধুলোর দ্বারা বডির রঙ-এর উপর দাগ হতে পারে। তারপর জল দিয়ে ধুলে, ধুলোগুলি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। অনেকে ভেজা কাপড় দিয়ে বডি মোছেন।

আজকাল অনেকে জলের স্প্রে দিয়ে গা ড়র বডি ধুয়ে থাকেন। এটিও খুব ভাল। স্প্রে না থাকলে শ্যাময় লেদার দিয়ে মুছে ফেললেও ভাল হয়।

অনেকে মাড্গার্ডের কাদা চেঁছে তুলে দেন। এটি ভাল নয়। এতে মাড্-গার্ডের রঙ উঠে যায় ও তার নিচের লোহা বের হয়ে পড়ে। কাদার মধ্যে নানা এ্যাসিড জাতীয় পদার্থ থাকতে পারে। তার ফলে, লোহা বের হলে ম্যাডগার্ডে খুব তাড়াতাড়ি মরচে পড়তে পারে। এটি দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। তাই মাড্-গার্ডের কাদা ও মাটি আগে ভাল করে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। কাদা ভিজে নরম হবে। তারপর মোটা একখন্ড কাপড় বা ক্যাম্বিস ও বুরুশ দিয়ে এটি পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে করতে সময় একটু বেশী লাগে বটে, তবে মাড্গার্ডের রঙ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

সব সময় লক্ষ্য করতে হবে, যেন টিউবের ভাল্বের সব প্যাঁচগুলি ভাল-ভাবে লাগানো থাকে। তা না হলে ঐ স্থান দিয়ে চাকায় জল ঢুকতে পারে।

তার ফলে টায়ার, টিউব ইত্যাদি তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যদি গাড়িটি কিছুদিন ব্যবহার করতে না হয়, তাহলে চাকাগুলি মাটি থেকে উঠিয়ে কাঠের পাটাতন বা ইটের উপরে রাখতে হবে এবং টিউবের মধ্যকার বাতাসের চাপ একটু কম করে দিতে হবে। পরে যখন গাড়ি আবার বের করতে হবে, তখন পাম্প করে দিতে হবে। এইভাবে না রাখলে টায়ার ও টিউবের ক্ষতি হয়।

সব জয়েন্ট বা সংযোগস্থগুলি ভাল করে কভার দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। তাহলে এসব জায়গায় ধুলো লাগে না ও সেগুলি নষ্ট হয় না। জয়েন্টগুলিতে গ্রিজ দেওয়া উচিত।

উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ ও সামনের আয়না বা Mirror ভাল করে পালিশ করে রাখা উচিত। এগুলি গ্লিসারিন ও শ্যাময় লেদার দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কাঁচে জল লেগে থাকলে, তা পরিষ্কার করে মুছে ফেলতে হয়। যদি গাড়িতে বেশী পরিমাণে পিতলের ফিটিংস থাকে, তাহলে সেগুলি মেটাল পালিশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। একাজে 'ব্রাসো' ব্যবহার করা ভাল।

যদি নিকেল বেশী থাকে, তাহলে সেগুলি খড়িমাটির গুঁড়ো বা প্লেটপালিশ দিয়ে পালিশ করা উচিত। বডির রং ঠিক রাখার জন্য অনেকে আজকাল ওয়াণ্ডারমিষ্ট বা মার্কোলাইজড্ ওয়াক্স ব্যবহার করেন। এটির সাহায্যে বডি পালিশ করলে গাড়ির রঙ ভাল থাকে ও গাড়ি সব সময় নতুনের মতো দেখায়। এটি একটি তরল পদার্থ। স্প্রে করে এটিকে বডিতে ছিটিয়ে দিয়ে শ্যাময় লেদার দিয়ে বডি মুছতে হবে—তাহলে গাড়ি থেকে চকচকে আভা বের হবে।

অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর, যদি পথের মাঝে কোথাও দীর্ঘ সময় গাড়ি পার্ক করিয়ে রাখা হয়, তাহলেও তারপর গাড়ি মুছে নেওয়া উচিত। বেশীক্ষণ ধুলো জমে থাকলে তাতে বডির ক্ষতি হয়। এই জন্যে মোটা কাপড় বা ক্যাম্বিস গাড়িতে রাখতে হয়।

পথের মধ্যে যেসব জায়গায় 'No Parking' লেখা থাকে, সেইসব জায়গায় গাড়ি কখনো রাখতে নেই—সেটা বে-আইনী। গাড়ী যেখানে পার্ক করার নিয়ম ঠিক সেখানে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে সেখান থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে কর্মস্থলে যেতে হবে।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় বড় রাস্তার কাছেই পার্কিং করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকে—সেখানে গাড়ি রাখাই নিয়ম।

বাঁদিকে গাড়ি চালাতে চালাতে যদি ডানদিকে পার্ক করাতে হয়, তাহলে গাড়ি কোণাকুণি চালাতে নেই। সব সময় গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোদিকের পথে গিয়ে তারপর তা পার্ক করাতে হবে।

বড় লরী বা বাস চালানোর নিয়ম

সাধারণতঃ ছোট গাড়ি ও বড় লরী বা বাস চালাবার নিয়ম প্রায় সবই এক। তবে ছোট গাড়ি নিয়েই প্রথমে চালনা শিক্ষা করতে হয়। তারপর হাত বেশ পরিপক্ক হলে ও ভাল ড্রাইভিং শিখলে, পরে বড় লরী বা বাস চালানো অভ্যাস করতে হয়।

বাস ও লরীর ইঞ্জিনও ছোট গাড়ির ইঞ্জিনের মতো—তবে বড় গাড়ির ইঞ্জিনগুলি আকারে বড় হয় ও বেশী ভারী হয়। এতে যদি কার্ডেন শ্যাফ্‌ট্‌ থাকে, তাহলে পিছনের এ্যাক্সিলে বেভেল গীয়ারের বদলে ওয়াস গীয়ার বা চেন ড্রাইভ ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লরী বা বাসের চেসিস্‌ বড় হয়। এদের চেসিস্‌ প্রায় একই রকম হয়—পরে কাজ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক পৃথক বডি ব্যবহৃত হয়।

আজকাল বাস ও লরীতে বেশীর ভাগই ডিজেল চালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সুবিধা এই যে, ভারী মোটরযান ডিজেলে সহজে চলতে পারে ও খরচ পেট্রোলের চেয়ে কম হয়।

লরী বা বাস, সাধারণতঃ ছোট মোটরের চেয়ে অনেক কম গতিতে চালাতে হয়। তার কারণ হলো, একে ব্রেক কষে দাঁড় করাতে সময় লাগে বেশী। বড় গাড়ি তার নিজের ভার ও গতিতে (momentum) আপনা থেকেই অনেকটা এগিয়ে তারপর ব্রেক করে। লরী বা বাস কতটা চওড়া তা মনে রেখে খুব সন্তর্পণে তা চালাতে হয়।

লরী বা বাসে কখনো নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ওজন বহন করতে নেই—তার কারণ তাহলে অতি সহজেই চাকা ফেটে যেতে পারে। লরী বা বাসের চাকা বেশী মোটা ও ভারী হয়—তবে কতটা ওজন বহন করা যাবে সেইমতো

চাকা ও টায়ার তৈরী হয়। বেশী ওজন নিলে একদিকে যেমন চাকা ফেটে যাবার আশংকা থাকে, তেমনি অন্যদিকে দুর্ঘটনা ঘটারও ভয় থাকে। লরীগুলি ৬ টন থেকে ৭ টন মাল বহন করতে পারে। যে লরী যতটা মাল বহন করে তার চাকা তত শক্ত ও টায়ার তত মোটা হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও তার চিকিৎসা

আগুন নেভানো

পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি তৈলাক্ত পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় বলে, অনেক সময়ই গাড়িতে আগুন লাগার আশংকা থাকে। তাছাড়াও গাড়িতে দাহ্য পদার্থ বহন করলে নানা কারণে আগুন লাগতে পারে। তাই আগুন কি করে নেভাতে হবে সেটা যেনে রাখা কর্তব্য।

পেট্রোল প্রভৃতি তেলে যদি আগুন লাগে, তবে তা নেভানো সহজ নয়। জলের সাহায্যে পেট্রোলের আগুন তো নেভেই না বরং আরও ছড়িয়ে পড়ে। এই সব আগুন নেভানো হয় প্রচুর ধুলো, মাটি চাপা দিয়ে বা মোটা কম্বল চাপা দিয়ে।

যদি গ্যাসে আগুন লাগে—তাও জল দিয়ে নেভানো যায় না। এই আগুন সোডি-বাই-কার্ব দিয়ে নেভাতে হয়। গ্যাসের আগুন নেভানোর জন্য এসিড মিকশ্চারও ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ যে সব আগুন জল নিয়ে নেভানো যায় না, নেভানোর জন্য দু'ধরনের পদ্ধতির প্রচলন আছে। তা হলো :—

(১) অক্সিজেন গ্যাস, আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। তাই যদি কোনও ভাবে তার বিপরীত গ্যাস, যেমন কার্বন মনোঅক্সাইড্‌ প্রভৃতি কোনভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং ঐ গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে ছাড়া যায় তাহলে আগুন নিভে যাবে। অক্সিজেন গ্যাস আগুন জ্বালাতে বা তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কার্বন

মনোঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস আগুন নেভায় অর্থাৎ আগুনের ব্যাপারে তার Action বিপরীত হয় বলে, তাকে অক্সিজেনের বিপরীত গ্যাস বলা হয়। তাছাড়া কোনও শক্ত জিনিস চাপা দিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে দিলেও আগুন নিভতে বাধ্য।

(২) তরল জিনিসে আগুন লাগলে তার সঙ্গে এমন জিনিস মেশানো হয়, যা তার আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

এই দুটি থিয়োরীর উপরে ভিত্তি করে আগুন নেভানোর জন্য যে সব জিনিস ব্যবহৃত হয় তা বলা হচ্ছে।

সোডি-বাই-কার্ব ও করাতের গুঁড়ো—(Saw-dust) তরল তেলে আগুন লাগলে তা নেভাবার জন্য প্রচুর করাতের গুঁড়ো তার উপরে চাপা দেওয়া যায়। ভারী তেল, গালা, আলকাতরা প্রভৃতিতে আগুন লাগলে করাতের গুঁড়ো দিয়ে আগুন নেভানো ভাল পদ্ধতি। করাতের গুঁড়োর সঙ্গে সোডি-বাই কার্ব মেশালে ভাল ফল হয়। তবে করাতের গুঁড়ো দিয়ে পেট্রোলের আগুন নেভানো যায় না।

(খ) **ফেনা তৈরীর মিকশ্চার** (Frothy mixture)—এটি অগ্নি নির্বাপণের খুব ভাল উপযোগী পদার্থ। এটি একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। তরল পদার্থে বা গ্যাসে যদি আগুন লাগে, তাহলে তার উপরে ঐ পদার্থ ছিটিয়ে দিলে তা থেকে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয় ও আগুন নিভে যায়। এটি তরল পদার্থ, তাই এটি হোস (Hose) পাইপ দিয়েও ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

(গ) **নির্বাপণকারী গ্যাস**—ফায়ার ব্রিগেডে এটি খুব ব্যবহৃত হয়। গ্যাস সিলিণ্ডারে, প্রচুর অগ্নি নির্বাপনকারী গ্যাস মজুত থাকে। ঐ গ্যাস সিনেমা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে বিপদের সময়ের জন্য স্টকও রাখা হয়। আগুন জ্বালার সময় একটি পাইপে করে খুব জোরে ছাড়া হয় ও তাতে আগুন নিভে যায়।

(ঘ) **কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড**—আজকাল আগুন নেভানোর কাজে এটি খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি জলের মতোই তরল পদার্থ—তবে এটি জলের চেয়ে অনেক ভারী। তাই এটি পাইপ দিয়ে আগুনের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

আবার এটি একটি পিচকারী সাহায্যেও আগুনের উপরে ছড়িয়ে দিতে পারা যায়। আজকাল অনেক আগুন নেভানোর মিকশ্চার বের হয়েছে—তবে সবার মূলে এই কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid)

মোটর চালনায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। নিজের দুর্ঘটনা হোক বা না হোক, অপরেরও হতে পারে—তাই এই কাজ পেশা হিসাবে যারা গ্রহণ করে, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি (First aid) জানা অবশ্য কর্তব্য। নীচে কতকগুলি প্রধান প্রধান দুর্ঘটনা ও তার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হলো।

অগ্নিদগ্ধ বা আগুনে পোড়া

যদি আগুনে বা উত্তপ্ত জলে দেহ পুড়ে যায়, তাহলে কি করে তার চিকিৎসা করতে হবে তা বলা হচ্ছে। কতটা পুড়ে গেছে, সেই অনুযায়ী তার নানা লক্ষণ দেখা দেয়। আগুনে পোড়া ৩।৪ ধরনের হয়।

১। প্রথম প্রকারের সামান্য পোড়াতে চামড়া লাল হয়। কিছু পরে ফোস্কা পড়ে ও তাতে জ্বালা হয়।

২। এতে চামড়া ও তার নীচের মাংস নষ্ট হয়। দেহের অনেকটা জায়গা পুড়ে গেলে বা তার মাংস নষ্ট হলে প্রাণের আশংকা থাকে।

৩। তৃতীয় প্রকারের পোড়া হলো দেহের অর্ধেকটা অংশ পুড়ে যাওয়া। এতেও বাঁচার আশা কম থাকে।

যদি অল্প জায়গায় পুড়ে যায় ও সামান্য পোড়া হয় তাহলে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখলে ভাল হয়। স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে বেঁধে রাখলে জ্বালা কমে যায়। অনেক সময় পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পিরিট দিয়ে, পটি বেঁধে রাখলে ফোস্কা হয় না।

বেশী জায়গা পুড়ে গেলে নারকেল তেল ও চুণের জল মিশিয়ে তাতে কাপড় ভিজিয়ে পোড়া জায়গার চারদিকে বেঁধে রাখতে হয়।

যদি সম্ভব হয়, তাহলে Acriflavin lotion ও গ্লিসারিন মিশিয়ে তা কাপড়ে ভিজিয়ে পটি বাঁধতে হয়।

Penicillin মলম পোড়া জায়গায় লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে ভাল ফল

হয় তবে পোড়া জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বা কাপড় ছাড়া তুলো ব্যবহার করা উচিত নয়। Burnol-ও ভাল কাজ দেয়। বেশী পুড়লে ফার্স্ট এড দিয়ে তারপর ভাল চিকিৎসককে দেখানো উচিত।

ক্ষত (Wound)

মোটরের কাজে প্রায়ই হাতে পায়ে আঁচড় লাগে বা কেটে যেতে পারে। এই রকম হয়ে থাকলে আগে ক্ষতটি ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে। স্পিরিট দিয়ে তা করা ভাল। তারপরে Tincture Benzene, কাপড় বা তুলোতে লাগিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাতে হয়।

বোরিক তুলোতে ভাল করে পেনিসিলিন মলম বা সালফা পাউডার লাগিয়ে তা ক্ষতস্থানে লাগালে ভাল কাজ দিয়ে থাকে।

শরীরে বড় বড় ক্ষত হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে দেখিয়ে Anti-tetanus ইনজেকশন নেওয়া উচিত। যদি কোনও শিরা বা ধমনী কেটে যায়, তাহলে চিকিৎসককে সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে হবে। তবে তার আগে ক্ষতস্থানের রক্ত চেপে বন্ধ করে তাতে ঔষধ (আগে বর্ণিত) লাগালে ভাল হয়। সামান্য ক্ষতে ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিলেই ভাল হয়ে যায়।

হাড়ভাঙা (Fracture)

শরীরের মধ্যে যে-কোনও হাড় আঘাতের ফলে ভেঙে যেতে পারে। সাধারণতঃ হাড় ভেঙে গেলে অসহ্য ব্যথা হয়। তাছাড়া ভাঙা হাড়ের দুটি মাথা ঠিকমতো মুখোমুখি থাকে না। হাত বা পা ভাঙলে, তা নাড়তে গেলে সামান্য কর্কশ শব্দ হয়।

মোটর চালাবার সময় নানা ধরনের দুর্ঘটনার ফলে হাড় ভেঙে যেতে পারে। হাড়ভাঙা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি কোনও ভাল চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করানো অবশ্য কর্তব্য। তবে সব সময় খুব কাছাকাছি ভাল চিকিৎসক পাওয়া যায় না।

তখন আহত লোকটিকে শুশ্রূষা করে তাকে নিকটবর্তী চিকিৎসকের কাছে পাঠানো কর্তব্য। এই জন্যে লোকটিকে যদি সুস্থ অবস্থায় কোন রকম নাড়াচাড়া না করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টাই করা

উচিত। যদি তা করা সম্ভব না হয়, অর্থাৎ ব্যথা বেশী হয়, তাহলে হাত বা পা টান করে যেখানটা ভেঙেছে তার দু'পাশে কাঠের লম্বা টুকরো বা বাঁশের কঞ্চি লাগিয়ে টাইট্ করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। তাহলে ভাঙা হাড় অনেকটা স্থির থাকবে এবং ব্যথা কম হবে। এইভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর লোকটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে।

সন্ধিভঙ্গ (Fracture of Joint)

শরীরের কোনও সন্ধি—যেমন কনুই, কাঁধ, হাঁটু প্রভৃতি ভেঙে গেলে এটি খুবই খারাপ একটি দুর্ঘটনা জানতে হবে।

সন্ধিভঙ্গ হলে, দেহের সেই অংশটি একেবারে নাড়াচাড়া করা যায় না। সেটি অবশ বা একেবারে অকেজো হয়ে যায়।

সন্ধিভঙ্গ হয়েছে জানতে পারলে কখনো তার চিকিৎসা নিজে করা উচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শীঘ্রই রোগীকে চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে। রোগীর অসুবিধা হলে তাকে স্ট্রেচার বা ইজিচেয়ারে বসিয়ে বহন করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সন্ধিতে মোচড় (Tortion)

সন্ধিতে মোচড় লেগে তা ভেঙে না গেলে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। তার কারণ হলো সন্ধির চারদিকে যে আবরণ Synovial membrane থাকে, তা এই মোচড়ের ফলে আহত হয় এবং অনেক সময় তার অংশবিশেষ ছিঁড়ে যায়। সন্ধিতে মোচড় লাগলে তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অংশের পেশী বা Muscle এবং বন্ধনী বা Tendon পর্যন্ত আহত হয়।

সন্ধিতে মোচড় বা পেশীতে মোচড় লাগলে সবার আগে ঐ স্থানে বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিতে হয়। এক টুকরো কাপড় ঐ স্থানে জড়িয়ে তার উপরে ঠাণ্ডা জল দিলেও উপকার হয়।

যদি মোচড়ের ফলে ব্যথা খুব বেশী হয়, তাহলে কাঠের ফলক দিয়ে স্থানটি ভাল করে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

মোটা করে কাপড় বেঁধে দিয়ে তার উপরে ঘন ঘন গুলার্ডস্ লোশন প্রয়োগ করলেও ভাল ফল হয়। পেশীতে টান ও সন্ধিতে মোচড়ের প্রথম অবস্থায় বরফ প্রয়োগ খুবই ফলদায়ক, তা মনে রাখতে হবে।

সন্ধিতে মোচড় লাগলে রোগীকে নড়াচড়া করতে দিতে নেই। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বিশ্রাম এই দুর্ঘটনার একটি প্রধান চিকিৎসা। যদি সম্ভব হয়, তাহলে যত সত্বর সম্ভব রোগীকে চিকিৎসক দ্বারা দেখানো কর্তব্য।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস বহানো (Artificial Respiration)

হঠাৎ যদি শরীরের উপর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় অথবা দুর্ঘটনার জন্যে গাড়ি জলে পড়ে কেউ জলে ডুবে যায়, তাহলে প্রায়ই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বহানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বহানোর নানা উপায় আছে।

জলে ডুবে গেলে রোগীকে মাটির উপরে চিৎ করে শুইয়ে কোমরে চাপ দিয়ে তার পেট থেকে সব জল বের করে ফেলতে হবে। তারপর কৃত্রিম শ্বাস বহানোর চেষ্টা করতে হবে।

যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাস ব্যবহার চেষ্টা করা উচিত।

রোগীকে প্রথমে উপুড় করে শোয়াতে হবে। তারপর তার মাথাটা এক পাশে ঘুরিয়ে রাখতে হবে। রোগীর উরুর উপরে একজন লোক বসবে। তার আগে রোগীর জিভটি একজন মুখ থেকে বের করে দেবে।

যে লোকটি উরুর উপরে বসবে, সে তার হাতের আঙুলগুলি রোগীর পাঁজরের নীচের দিকে বিছিয়ে দেবে। তারপর একবার পাঁজরে চাপ দেবে—আবার চাপ কমাবে এইভাবে একবার চাপ দিয়ে ও একবার চাপ কমিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে শুরু হবে। এখানে একটা কথা বলা উচিত। উপুড় করে রোগীকে শোয়াবার আগে তার হাত ঠিক সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলে তাতে ভাল ফল হয়।

মিনিটে ১২।১৪ বার এইরূপে চাপ দিতে ও চাপ আলগা করতে হয়। তাহলে ২।৩ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসে। তারপর হাতে-পায়ে গরম জলের বোতল দিয়ে সেঁক দিতে হয়। জ্ঞান হলে, কড়া কফি বা চা খেতে দিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানো উচিত।

আকস্মিক অবসাদ (Shock)

কোনও আকস্মিক আঘাত অথবা মানসিক কোনও রকম দুর্বলতার জন্যে শরীর হঠাৎ নিস্তেজ বা অবসন্ন হয়ে পড়ে। তাকে অবসাদ বলে।

অবসাদ হলে দেহের হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে উঠতে থাকে, মাথা ঘোরে, রোগী বসতেও পারে না। নাড়ি দ্রুত ও দুর্বল হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়। দেহে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে। রোগী একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ে। এরূপ হলে দেহের ভিতরে কোনও রক্তস্রাব (Internal Haemorrhage) হচ্ছে কিনা তা কোনও ভাল চিকিৎসককে দিয়ে দেখানো উচিত।

এরূপ হলে রোগীর মাথা নীচু করে তাকে গরম কাপড় বা Flannel দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে। কাপড় গরম করে হাতে পায়ে সেঁক দিলে ভাল হয়। কড়া চা বা কফি খাওয়ালে উপকার হয়। আধঘণ্টা অন্তর ২০।৩০ ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি অথবা Spirit ammon aromat খেতে দিলে ভাল হয়। তবে ব্র্যাণ্ডি না দিয়ে পরের ঔষধটি দেওয়াই ভাল। যদি সম্ভব হয় স্মেলিং সল্ট শোঁকাতে হবে—তাতে ভাল ফল হয়। যদি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয় বা তা খুব আস্তে আস্তে পড়তে থাকে, তাহলে কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস বহাবার ব্যবস্থা করা উচিত।

যদি রোগী এতেও চাঙা হয়ে না ওঠে, তাহলে অবিলম্বে ভাল একজন চিকিৎসকের সাহায্য দেওয়া উচিত।

ফার্স্ট এডের দরকারী বস্তু

মোটরের সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি রাখা উচিত।

টিংচার আইয়োডিন, টিংচার বেনজিন, স্মেলিং সল্ট, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, গ্লিসারিন, অলিভ অয়েল, কাঠের ফলক বা কঞ্চির টুকরো, কার্বলিক এসিড, স্পিরিট এমন এরোম্যাট, গজ, ভাইনাম গ্যালিসিয়া (ব্র্যাণ্ডি) ২ আউন্স। এই সমস্ত জিনিস একটি বাক্সে রাখা হয়। তাকে বলে First Aid Box। এর উপরে Red Cross চিহ্ন দিতে হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রোড সিগ্‌ন্যাল

মোটর গাড়ি চালাতে গেলে চালককে অবশ্যই কতকগুলি চিহ্ন বা সিগ্‌ন্যাল শিখতে হবে। তাকে বলা হয় রোড সিগ্‌ন্যাল। এগুলি দিনের আলোতে হাতের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

এখানে প্রতিটি সিগ্‌ন্যাল সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

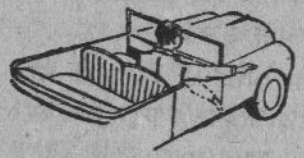

(১) গাড়ি থামানোর বা গতি কমানোর সংকেত।

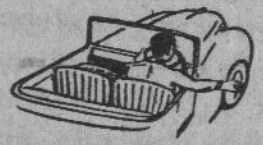

(২) ডানদিকে ঘোরার সংকেত।

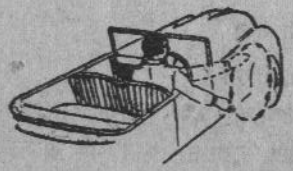

(৩) বাঁদিকে ঘোরার সংকেত।

(৪) আমাকে ওভারটেক করতে পারেন।

দিনের বেলায় ড্রাইভারের বিভিন্ন ধরনের সংকেত।

সিগ্‌ন্যাল ১—আমি গতি কমাব বা থামব

যদি চালক গাড়ির গতি কমাতে বা থামাতে চায়, তা হলে পথের বাঁদিকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে হর্ণ বাজাতে হবে। তারপর ডান হাত বের করে অল্প একটু উপর-নীচ করতে হবে।

সিগ্‌ন্যাল ২—আমি ডাইনে ঘুরব

যদি গাড়ি চালাতে চালাতে চালক গাড়িকে ডানদিকে ঘুরিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে ডান হাতখানা সোজা বাইরে বের করে প্রসারিত করতে হবে। এর অর্থ চালক সোজা না গিয়ে এবার ঘুরে ডানদিকের পথ দিয়ে যাবে।

সিগ্‌ন্যাল ৩—আমি বাঁয়ে ঘুরব

যদি চালক গাড়ি বাঁদিকে ঘোরাতে চান, তাহলে গাড়িকে মোড়ের মাথায় বাঁদিক ঘেঁষে থামাতে হবে। তারপর ডান হাত বের করে হাতটা গোলভাবে ঘোরাতে হবে। তাহলেই পিছনের গাড়ি বা পুলিশ বুঝবে যে, গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরবে।

চালকের পাশে অন্য লোক থাকলে, সে বাঁদিক দিয়ে হাত বের করেও সংকেত দিতে পারে।

সিগ্‌ন্যাল ৪—আমাকে ওভারটেক করতে পারেন

যদি পিছনের অন্য গাড়ি আপনার গাড়িকে ওভারটেক করার জন্য ঘন ঘন হর্ণ দিতে থাকে, তাহলে তাকে ওভারটেক করার নির্দেশ দেবেন। এর সংকেত হলো, ডান হাত বের করে হাতের কব্জি নীচের দিকে দিয়ে হাত পিছনে ও সামনে দোলাতে হবে। তাহলে পিছনের গাড়ির চালক তখন ওভারটেক করবে।

রাতের বেলা হাতের সিগ্‌ন্যাল দেখা যায় না বলে গাড়ির পিছনের ব্যাক লাইট দ্বারা সিগ্‌ন্যাল দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ লাইট দ্বারা তিনটি সিগ্‌ন্যাল করা হয়ে থাকে। এখানে তাই তিনটি ব্যাক লাইট সিগ্‌ন্যাল ছবি দ্বারা বোঝানো হলো। এই সব সিগ্‌ন্যাল হাতের সিগ্‌ন্যালের পাশাপাশি দেখিয়ে তুলনামূলকভাবে বোঝানো হয়েছে।

ব্যাক লাইট ও হাতের সিগন্যাল

ডাইনে ঘোরানোর সংকেত
(শুধু ডানদিকের আলো জ্বলবে)

বাঁদিকে ঘোরানোর সংকেত
(শুধু বাঁদিকের আলো জ্বলবে)

সোজা যাওয়ার সংকেত
(শুধু দুটি আলোই জ্বলবে)

এই তিনটি প্রধান সংকেত হলো ডাইনে যাবার, বাঁয়ে যাবার ও সামনে সোজা চলার সংকেত।

সোজা চালাতে হলে হাতের সংকেত হলো ডান হাত বের করে সামান্য উপর-নীচ করা। দিনের বেলা অবশ্য এটা ততো প্রয়োজন হয় না—কিন্তু রাতের বেলা এটি বিশেষ প্রয়োজন—তা না হলে পিছনের গাড়ি সামনের গাড়ির উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারবে না ও দুর্ঘটনা ঘটবে।

ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল

প্রায় সব বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ বা সিগন্যাল লাইট থাকে। এই সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালানো সব সময় কর্তব্য—অন্যথায় তা আইন মতে দণ্ডনীয়। ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যালগুলি কি কি তা দেখানো হচ্ছে।

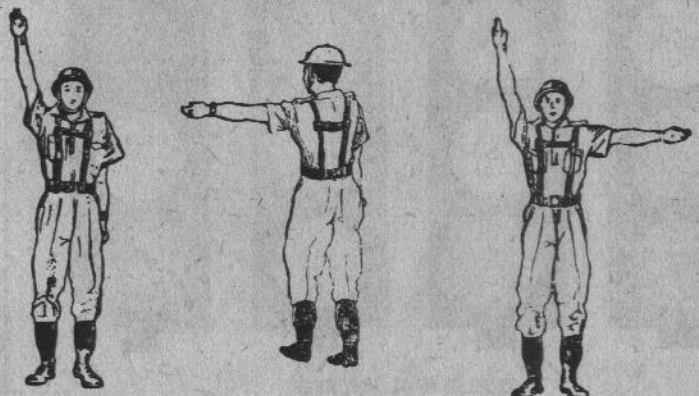

1 2 3

পুলিশের বিভিন্ন সংকেত

(১) যে-গাড়ি সামনের দিক কিংবা দুই পাশের যে-কোনও পাশ থেকে আসছে, তাকে থামাবার জন্য ট্রাফিক পুলিশ তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, ডান হাতের চেটো সেই গাড়ির দিকে রেখে, কাঁধের উপর হাত তুলে তাকে থামাবেন।

(২) যে গাড়ি পিছন থেকে আসছে, তাকে থামাবার জন্য কনস্টেবল তাঁর বাঁ হাত, সমান্তরালভাবে বাড়িয়ে রাখেন। চেটোর পিছন দিকটা থাকে গাড়ির দিকে।

(৩) যে-সব গাড়ি সামনের দিক থেকে আসছে, এবং যে-সব গাড়ি পিছন দিক থেকে আসছে, তাদের যখন একই সঙ্গে থামাতে হয়, তখন (১) ও (২) সিগন্যালকে একসঙ্গে দেখিয়ে কনস্টেবল তাদের থামান।

আলোর সিগন্যাল

যে সব পথে পুলিশ দ্বারা সিগন্যাল না দিয়ে লাইট দিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে কিভাবে তা দেওয়া হয় তা বোঝানো হচ্ছে।

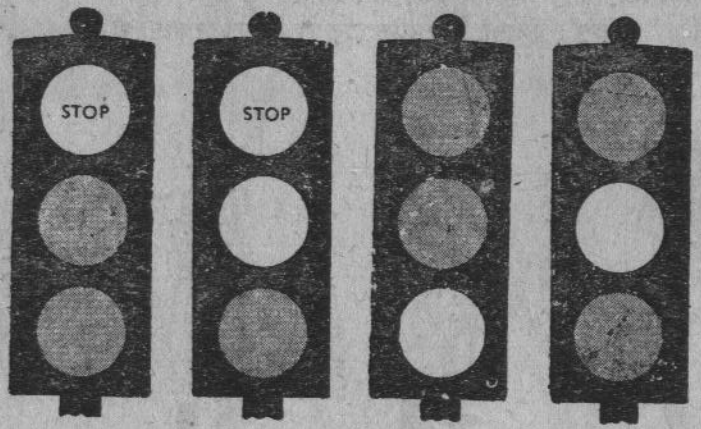

আলোর দ্বারা সিগন্যাল

আলোর সংকেত তিন রকম হয়—**লাল, হলুদ** ও সবুজ। উপরে লাল, মাঝে হলুদ, নীচে সবুজ থাকে।

১। লাল আলো জ্বললে—গাড়ি বন্ধ করুন।

২। লাল ও হলুদ জ্বললে—গাড়ি স্টার্টের জন্যে তৈরী থাকুন।

৩। ঐ দুটি বাতি নিভে নীচের সবুজ বাতি জ্বললে—গাড়ি স্টার্ট করুন।

৪। সবুজ নিভে হলুদ জ্বললে—গাড়ি বন্ধ করুন।

ট্রাফিক সাইন

যে সব রাস্তায় ট্রাফিক সাইন বা পথের ধারে নানা চিহ্ন টাঙানো থাকে, তা মানতেই হবে। এই সব চিহ্ন বা সাইনের অর্থ কি তা প্রত্যেক গাড়ির চালককে অবশ্যই মানতে হবে। দুই রঙা ছবি দ্বারা তা স্পষ্ট বোঝানো হলো।

পথচারীদের প্রতি পরামর্শ

পথচারীদের কতকগুলি আইন মেনে চলতে হয়—যাতে তাঁরা দুর্ঘটনা এড়াতে পারেন। পথচারীদেরও অনেক কর্তব্য আছে।

১। ফুটপাত ছাড়া চলবেন না। নিরাপদ বুঝলে পথ পার হবার জন্য রাস্তায় নামবেন।

২। যে পথ শুধু সাইকেল চালাবার জন্যে নির্দিষ্ট—তা দিয়ে হাঁটবেন না—সেটা সাইকেলকেই ছেড়ে দিতে হবে।

৩। যেখানে ফুটপাত নেই, সেই জায়গায় কেবল ডানদিক দিয়ে হাঁটতে হবে—তাহলে উল্টোদিকের গাড়ি সহজেই দেখা যাবে।

৪। ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি হেঁটে রাস্তা আটকাবেন না। তাতে যান-বাহনের গতিরোধ করা হয় ও দুর্ঘটনায় আহত হবার আশংকা থাকে।

৫। রাস্তার বাঁকে এমন কোনও জায়গায় দাঁড়াবেন না, যেখানে চালক পথিককে দেখতে না পায়। যদি গল্পগুজব করতে হয়, তা সব সময় ফুটপাতে করা উচিত।

৬। চলন্ত অবস্থায় ট্রাম বা গাড়ি থেকে নীচে নামবেন না। তাতে পিছলে যাবার আশংকা থাকে এবং তার ফলে নানা দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব।

৭। ট্রাফিক সিগন্যাল শুধু গাড়ির জন্য নয়—সেটা পথচারীদের জন্যেও প্রযোজ্য। সেই অনুযায়ী নজর রেখে পথ পারাপার করতে হবে।

৮। পথচারীদের হাঁটার জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। কোথাও বা ওভারব্রিজ বা সাবওয়ে থাকে—সব সময় সেই পথে হাঁটতে হবে—অন্য পথে নয়।

৯। রাস্তা ঠিক আছে কিনা না জেনে কোনও গাড়ির পিছন থেকে চট্ করে রাস্তা পার হবেন না। উল্টো দিক থেকে গাড়ি এসে দুর্ঘটনা অনিবার্য হয়ে উঠবে।

১০। পিচ্ছিল পথ বিপজ্জনক—বৃষ্টির দিনে খুব সাবধানে পথ চলতে হবে।

১১। সৌজন্য আর দয়ার পরিচয় দিন। শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ প্রভৃতিদের পথ পার হতে সাহায্য করুন।

১২। শিশুদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। শিশুরা পথ চলতে জানে না।

তাদের একা ছেড়ে দেবেন না। পথে চলার নিয়ম অল্পবয়সেই তাদের শিখিয়ে দিন।

১৩। অন্যের পথ চলার সুযোগ-সুবিধার দিকেও সব সময় নজর রাখা কর্তব্য।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোটর এ্যাক্ট বা মোটর গাড়ি চালাবার আইন-কানুন

মোটর গাড়ি চালাতে গেলে, প্রথমে কতকগুলো সাধারণ আইন-কানুন মানতেই হবে। এগুলি না মানলে, তা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় এবং এর জন্য ফাইন (জরিমানা) বা প্রয়োজন হলে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই সব বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

সাধারণ আইন

১। সবার আগে মোটর গাড়ি রেজেস্ট্রী করতে হবে। গাড়ি রেজেস্ট্রী না করে কদাচ চালানো যায় না। এই জন্যে রেজেস্ট্রী করার অফিসে যেতে হবে।

২। গাড়িটি রেজেস্ট্রী হয়ে যাবার পর রেজেস্ট্রী অফিস থেকে একটি নম্বর পাওয়া যাবে। যেমন ধরা যাক WBC 3459। ঐ নম্বরটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তা দুটি নম্বর শ্লেটে লিখে নিতে হবে এবং গাড়ির সামনে ও পিছনে তা লাগিয়ে নিতে হবে। এই নম্বর শ্লেট এমনভাবে লাগাতে হবে যেন বহু দূর থেকেও তা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

৩। আঠারো বছরের কম বয়স্ক কোনও লোক কদাচ গাড়ি চালাতে পারবেন না—এটা বে-আইনী কাজ। যদি ট্যাক্সি চালাতে হয়, তাহলে চালকের বয়স অন্ততঃ কুড়ি বছর বা তার বেশী হতেই হবে।

৪। পথে গাড়ি চালাতে গেলে যদি পথের বিধি ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার জন্যে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তাই সব সময় প্রতিটি

নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো উচিত। রাস্তা পার হওয়া, গাড়ির গতি, ট্রাফিক নির্দেশ, সংকেত প্রভৃতি সব নির্দেশ সর্বদা মেনে চলতে হবে। এই সব নিয়ম ভঙ্গ করলে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গাড়ির নম্বর নিয়ে কেস ফাইল করবে।

৫। ড্রাইভারকে গাড়ি চালাবার সময় সর্বদা মানুষ, জন্তু, অন্য গাড়ি প্রভৃতির দিকে নজর রেখে চালাতে হবে। এতে ভুল-ত্রুটি হলে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়।

লাইসেন্সের নিয়ম

১। কোনও ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে গেলেই, তার সঙ্গে লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো বে-আইনী ও অপরাধ বলে গণ্য হয়।

২। একজনের লইসেন্স নিয়ে আর একজন গাড়ি চালাতে পারবে না। যদি পুলিশ কোনও সময় লাইসেন্স দেখতে চায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা দেখাতে হবে। তাই ড্রাইভারের কাছে সব সময় লাইসেন্স রাখা কর্তব্য। যে নির্দিষ্ট স্থানের জন্য লাইসেন্স সেই জায়গাতেই গাড়ি চালানো যায়। অন্য জায়গায় চালালে তা হলো একটি বে-আইনী কাজ বা অপরাধ।

৩। কখনো লাইসেন্স হাতছাড়া করতে নেই। যদি কখনো কোনও পুলিশ অফিসার ড্রাইভারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে নিতে চান, তাহলে সব সময় তাঁর কাছ থেকে একটি রসিদ চেয়ে নিতে হবে।

৪। লাইসেন্স প্রাপ্ত ড্রাইভারকে নীচের নিয়ম-কানুন মেনে গাড়ি চালাতে

(ক) সব সময় পথের বিধি মেনে ও ভালমন্দ বিবেচনা করে, গাড়ি চালাতে হবে।

(খ) কখনো মদ বা মাদক দ্রব্য খেয়ে গাড়ি চালাতে পারবে না।

(গ) কোনও দুষ্কার্যে সহায়তা করতে পারবে না।

(ঘ) নির্দেশ ছাড়া পথ পার হতে পারবে না।

(ঙ) ট্রাফিক নিয়ম-কানুন সব মেনে চলতে হবে।

৫। লাইসেন্সের উল্টো পিঠেই গাড়ি চালাবার নিয়ম-কানুন—কোন্‌টা

ন্যায় কোন্‌টা অন্যায় সব লেখা থাকে। তা ভাল করে ড্রাইভারকে জেনে নিতে হবে।

৬। মোটর চালানো পূর্ণভাবে শিক্ষার আগে মোটর চালাবার শিক্ষার লাইসেন্স নিতে হবে।

যে-সব গাড়ি দ্বারা এইভাবে চালনা শিক্ষা করা হয়, সেই গাড়ির সামনে ও পিছনে বড় বড় করে লাল অক্ষরে 'L' অর্থাৎ (Learning car) এই কথাটা লিখে রাখতেই হবে।

৭। যদি কোনও গাড়ির মালিক তাঁর নিজস্ব বাড়ির বা গ্যারেজের ঠিকানা পাল্টে ফেলেন, তা সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়।

বিশেষ নিয়মাবলী

মোটর গাড়ির ড্রাইভারকে যে-সব নিয়ম মেনে চলতে হবে তা এখানে বলা হচ্ছে।

১। গাড়ির হর্ণ, ব্রেক, গিয়ার ও স্টিয়ারিং ঠিক থাকা চাই। তা না হলে গাড়ি বের করা চলবে না।

২। রাতের বেলা গাড়ি চালাতে গেলে গাড়ির আলো ঠিকমতো থাকা চাই।

৩। সূর্য অস্ত যাবার আধ ঘণ্টা পর থেকে ও ভোর হবার আধঘণ্টা আগে পর্যন্ত গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

৪। যে গাড়ি যতটা মাল বহন করার উপযোগী ঠিক ততটা মালই নিতে পারবে—তার বেশী বা কম নেওয়া চলবে না। তাহলে তা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

৫। সব সময় গাড়ি পথের বাঁদিক দিয়ে চলবে; যদি পথ ক্রস করতে হয় তবে সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে।

৬। যেখানে যতটা স্পিডে গাড়ি চালাবার নির্দেশ আছে, সেই গতিতেই গাড়ি চালাতে হবে। যেমন হয়তো সিগ্‌ন্যাল আছে 20 M.P.H.—সেখানে ২০ মাইলের বেশী গতি কদাচ হবে না।

৭। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আইন হলো, আঘাতপ্রাপ্ত লোককে গাড়িতে তুলে নিকটবর্তী ডাক্তারখানা

বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। নিকটবর্তী থানাতে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে দিতে হবে। এরূপ করলে ড্রাইভারের শাস্তি কম হয় বা হয় না—কিন্তু পালিয়ে গেলে শাস্তি বেশী হয়।

৮। পার্বত্য এলাকায় কখনো খারাপ বা অসুবিধাযুক্ত গাড়ি চালানোর নিয়ম নেই। যদি বিশেষ প্রয়োজন হয়, নিকটবর্তী থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৯। কোনও রকম নেশার দ্রব্য গাড়িতে রাখা কদাচ কর্তব্য নয়। তা বে-আইনী। ধরা পড়লে শাস্তি হবে।

১০। যে জায়গার লাইসেন্স সেখানেই গাড়ি চালাতে হবে। যদি অন্য জায়গায় যেতে হয় তবে অনুমতি নিতে হবে। পুলিশ অফিসারের অনুমতি ছাড়া তা করা যায় না।

১১। গাড়িটি যদি বাস হয়, তা হলে আরোহীর সুযোগ-সুবিধা দেখতে হবে। যদি ঝগড়া-বিবাদ হয়, তাহলে আপোষে তার মীমাংসা করার চেষ্টা করতে হবে। যদি গাড়ির কোনও আরোহী পার্শ্ববর্তী কোনও নারীর সঙ্গে কুব্যবহার করে, তৎক্ষণাৎ তা থানায় জানিয়ে দিতে হবে ও পুলিশের সাহায্য নিতে হবে।

১২। ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন সহকারী বা আরোহী বসার নিয়ম আছে। তার বেশী ড্রাইভারের পাশে বসানো উচিত নয়।

১৩। গাড়ি চালাতে হলে, দিনের বেলা হাতের সংকেত ও রাতের বেলা আলোর সংকেত সব সময় ঠিকমতো করতে হবে। তাতে ভুল হলে তা আইন অনুযায়ী অপরাধ।

১৪। অযথা রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, অন্যের অসুবিধা করা চলবে না।

১৫। বাসে কোনও জিনিস এমনভাবে রাখা চলবে না, যা অন্যদের বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

১৬। যদি পথে গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে লোক বা কোনও পশু পড়ে যায়, তাহলে গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করাতে হবে। যদি বেশী চোট না লাগে, তাহলে ড্রাইভারকে তার নম্বর ও ট্রাফিক পুলিশকে দিতে হবে ও যার ধাক্কা লেগেছে

তার ঠিকানা নিতে হবে।

১৭। যদি পথে কোনও জন্তু হঠাৎ চমকে যায় বা ইতস্ততঃ করে তাহলে গাড়ি থামাতে হবে।

১৮। পুলিশের কোনও লোক (পোশাকসহ) যদি পথে কোনও সময় গাড়ি থামাতে বলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে হবে।

১৯। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে বা নিয়মের গোলমাল হয় এবং পুলিশ নম্বর অনুযায়ী চিঠি লিখে সব কথা জানাতে চায় বা হাজির হতে বলে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতে হবে।

২০। যদি থানা বা কোর্ট থেকে কোনও বিবরণ চায়, তাহলে অবশ্যই ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই বিবরণ পৌঁছে দিতে হবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গাড়ি চালাবার বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১—গাড়ি বের করার আগে কি কি বিষয়ে সবার আগে দেখতে হবে?

উত্তর—গাড়ি বের করার আগে দেখতে হবে গাড়ির ব্রেক, প্যাডেল, গীয়ার ও স্টিয়ারিং ঠিক কাজ করছে কিনা। পেট্রোল ট্যাঙ্কে কতটা পেট্রোল আছে। ব্যাটারী ঠিক আছে কিনা—ইগ্নিশান সুইচ ও স্পার্ক প্লাগ কাজ করছে কিনা। জল কতটা আছে।

প্রশ্ন ২—বাঁদিকে একটা গাড়ি পার্ক করা বা চলমান থাকলে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হলে সাধারণতঃ কত গতিতে গাড়ি চালাতে হবে?

উত্তর—আগে দেখতে হবে উল্টোদিক থেকে কি গতিতে গাড়ি আসছে। যদি না আসে ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে ২ সেকেণ্ডেই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। মাত্র দশ গজ পথ পার হলেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়।

যদি বাঁদিকের গাড়ি ঘন্টায় ২০ মাইল গতিতে চলে তাহলে ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে চালানো যায় এবং ৬ সেকেণ্ডের মধ্যেই পাশের গাড়িটাকে ওভারটেক করা

সম্ভব হয়। এই সময়ের উল্টোদিক থেকে গাড়ি আসছে কিনা বা তা কি গতিতে আসছে, তা লক্ষ্য করতে হবে।

প্রশ্ন ৩—যে সব পথে গাড়ি কত গতিতে চলবে তা লেখা থাকে, সেই সব পথে গাড়ি চলে নির্দিষ্ট গতিতে। কিন্তু যে সব পথে কোনও গতিসীমা লেখা থাকে না—সে সব পথে গাড়ি কি গতিতে চলবে?

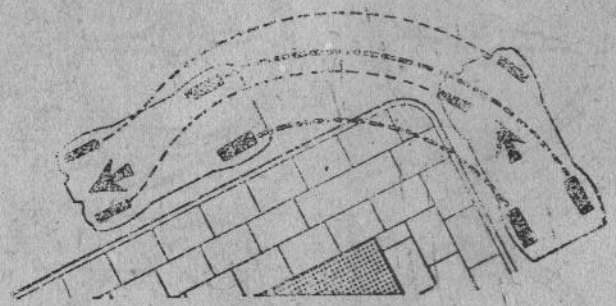

ফুটপাথের পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালানো

উত্তর—সবার আগে দেখতে হবে পথের অবস্থা কি রকম। পথ ভিজা কিনা, ভিড় বেশী কিনা, পথ উঁচু-নিচু কিনা। এইসব বিচার করে, ড্রাইভারকে মন দিয়ে গাড়ির গতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণতঃ কোনও পথেই ৩০। ৫০ মাইলের বেশী গতিতে গাড়ি চালানো উচিত নয়।

প্রশ্ন —ফুটপাথের পাশ দিয়ে কিভাবে গাড়ি মোড় ঘুরবে?

উত্তর—সব সময় সামনের চাকার উপর নির্ভর করেই মোড় ঘোরানো চলে না। মনে রাখতে হবে যে, সামনের চাকা ধার ঘেঁষে ঘুরলেও পিছন দিকের চাকা ফুটপাতের উপর দিয়ে যেতে পারে ছবি দেখে তা বোঝা যাচ্ছে (পূর্ব পৃষ্ঠায়)। তাই জ্যামিতিক জ্ঞান রেখে হিসেব করে মোড় ঘোরাতে হবে। ফুটপাথে গাড়ি ওঠা সব সময় বে-আইনী।

প্রশ্ন ৫—ডানদিকে ও বাঁদিকে গাড়ি ঘোরাতে হলে স্টিয়ারিং-এর চাকায় কিভাবে হাত রেখে কাজ করতে হবে?

উত্তর—পরের পৃষ্ঠায় ছবি ছবি দ্বারা এই সম্পর্কে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

বাঁদিকে মোড় ঘোরানোর ও ডানদিকে মোড় ঘোরানোর এই ছবি দু'টি দেখলেই ভাল বোঝা যাবে। ডানদিকে মোড় ঘোরাতে গেলে বাঁ হাত ঢিলে দিয়ে ডান

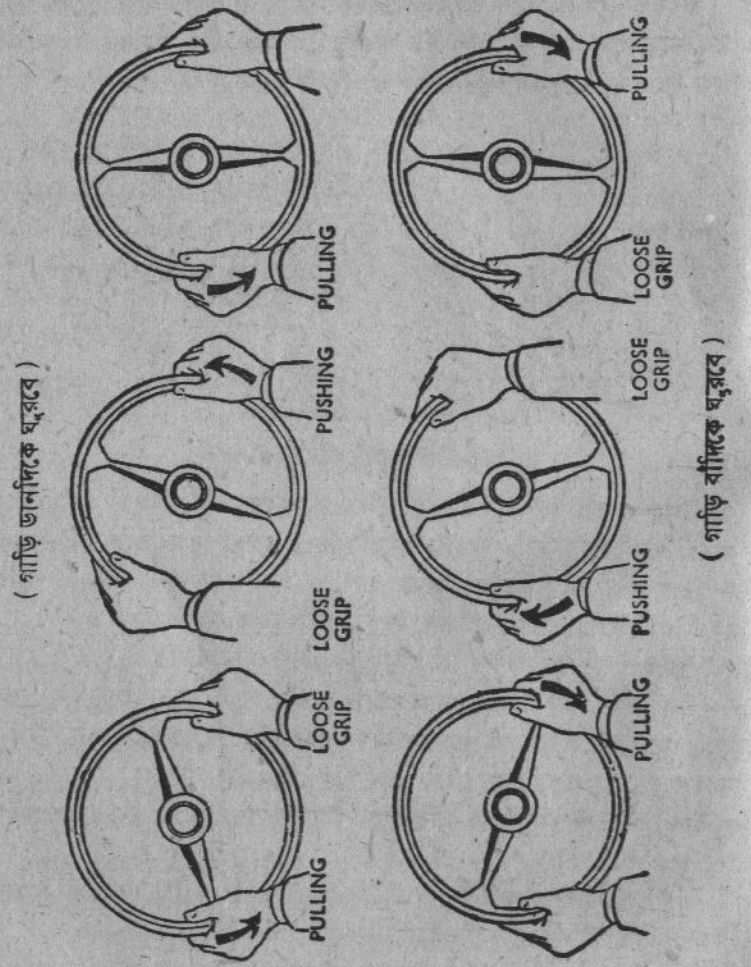

স্টিয়ারিং দিয়ে গাড়ি ঘোরানো

হাতে টান দিতে হবে, তারপর ডান হাত ঢিলে দিয়ে বাঁ হাতে ঠেলতে হবে।

তারপর আবার বাঁ হাত দিয়ে ঢিলে ডান হাতে টান দিতে হবে।

বাঁদিকে মোড় ঘোরাতে হলে ডান হাত ঢিলে দিয়ে বাঁ হাতে টানতে হবে। তারপর বাঁ হাত আল্‌গা দিয়ে ডান হাতে উপরে ঠেলতে হবে। তারপর ডান হাত আল্‌গা দিয়ে বাঁ হাতে টানতে হবে। এইভাবে করলে স্টিয়ারিং সহজে ইচ্ছামতো অনেকটা ঘোরানো যায়।

প্রশ্ন ৬—মোটর গাড়ির সারাদিনে সবচেয়ে বেশী কত পথ চলা উচিত? দৈনিক চলার কোনও বাঁধা সীমারেখা আছে কি?

উত্তর—মোটর গাড়ির উপযুক্ত খাদ্য থাকলে—অর্থাৎ তার জল, পেট্রোল বা ডিজেল ইত্যাদি ঠিকমতো তাতে ভর্তি করে নিয়ে গাড়িতে যত দূর ইচ্ছা চালানো যায়। রেসিং গাড়ির একদিনে সাত আটশো মাইলেরও অনেক বেশী পথ অতিক্রম করার বহু রেকর্ড আছে। আসলে এটা নির্ভর করে চালকের উপরে। চালক শ্রান্ত হয়ে পড়লে আর চালানো উচিত নয়—তাতে দুর্ঘটনার ভয় থাকে।

প্রশ্ন ৭—গাড়ি ড্রাইভ শুরু করার আগে সবচেয়ে প্রথমে ডানদিকে বা কি কি জিনিসের দিকে নজর দিতে হবে?

উত্তর—(১) হর্ণ (২) ব্রেক (৩) প্যাডেলগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা।

প্রশ্ন ৮—আপনি একটি ক্রসিং পার হচ্ছেন, সেখানে কোনও সিগ্‌ন্যাল লাইট বা পুলিশ নেই। যে পথে গাড়ি চালাচ্ছেন, সেই পথের মাঝ বরাবর একটি লোক এসে পড়েছে সেখানে কি করা কর্তব্য?

উত্তর—দুটি কাজ করা উচিত।

১। গাড়ির গতি একেবারে কম করে, হর্ণ দিয়ে সাবধানে এগোন।

২। গাড়ি থামিয়ে তাকে পাশ করতে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৯—আপনার গাড়ি একটি সরু গলিপথ থেকে বড় রাস্তায় পড়বে। সেখানে আপনাকে কি করতে হবে?

উত্তর—মোড়ের মাথায় এসেই গাড়ির গতি বন্ধ করতে হবে। তারপর চার-দিক বিবেচনা করে গাড়ি চালাতে হবে।

প্রশ্ন ১০—আপনি একটি বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার সামনে একটি

গাড়ি খুব ধীরে ধীরে চলছে। সামনের পথ পরিষ্কার। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—প্রথমে হর্ণ দিয়ে সামনের গাড়িকে সাবধান করে দিতে হবে। তারপর আপনি গতি বাড়িয়ে তাকে ওভারটেক করবেন।

প্রশ্ন ১১—আপনি একটি জংশন পার হতে যাচ্ছেন। সামনের লাইট সিগ্‌ন্যাল সবুজ। একটি পুলিশ এসে আপনাকে গাড়ি থামাতে বললে। আপনি চলবেন না কি করবেন ?

উত্তর—আপনার কর্তব্য হলো পুলিশকে ডাকা। তাকে সবুজ সংকেত দেখিয়ে প্রশ্ন করা, কেন সে গাড়ি থামাতে বললে ? তারপর তার কথা শুনে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ১২—আপনি একটি মোড় পার হতে যাচ্ছেন, সেখানে কোন্ সময় আপনার হাত দিয়ে বা রাতের বেলা আলো দিয়ে সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে ?

উত্তর—মোড়ের অন্তত ৫০ ফুট আগেই পরিষ্কারভাবে সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে। তা না হলে মোড়ের কাছাকাছি এসে সিগ্‌ন্যাল দিলে অন্য গাড়িগুলির পক্ষে অসুবিধা হবে।

প্রশ্ন ১৩—আপনি একটি বড় রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে চলেছেন। এমন সময় অন্য একটা গাড়ি প্রাইভেট পথ থেকে বা গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ছে। সেখানে কে আগে যাবে ?

উত্তর—এক্ষেত্রে আপনার উচিত সবার আগে হর্ণ দেওয়া ও জানানো যে আপনিই আগে যাওয়ার অধিকারী। তাহলে অন্য গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির গতি বন্ধ করবেন।

প্রশ্ন ১৪—আপনি একটি রাস্তার ক্রসিং-এ গাড়িকে একেবারে থামাতে চান। সেখানে কি সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে ?

উত্তর—সেখানে হাত ও বাহু সম্পূর্ণভাবে উপরের দিকে তুলতে হবে যার অর্থ হলো আপনি গাড়ি থামাচ্ছেন।

প্রশ্ন ১৫—আপনি একটি মোড়ের পথ ক্রস করছেন। এমন সময় সবুজ আলো জ্বলছিল কিন্তু হঠাৎ হলুদ জ্বলে উঠল। আপনি কি ধীরে যাবেন, না গাড়ির গতি বন্ধ করবেন ?

উত্তর—আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৬—আপনি একটি ট্রাফিক লাইটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত U-চিহ্নের মত পথে গাড়ি চালাতে যাচ্ছেন। মোড়ের লাল আলো জ্বলল। আপনি কি গাড়ি থামাবেন, না U পথে পার হয়ে অন্য মোড়ে গাড়ি থামাবেন ?

উত্তর—যে মুহূর্তে লাল আলো দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে হবে। সবুজ আলো না জ্বলা পর্যন্ত গাড়ি থামানো কর্তব্য হয়।

প্রশ্ন ১৭—একটি পথের জংশনের কতটা দূরে গাড়িকে পার্ক করাতে হবে ?

উত্তর—গাড়িকে মোড় থেকে অন্ততঃ ৩০ ফুট দূরে পার্ক করাতে হবে। তার আগে গাড়ি পার্কিং করলে তা বে-আইনী জানবেন।

প্রশ্ন ১৮—একটা পথে চলতে চলতে আপনি গাড়ির বাঁদিকে ঘোরাতে চান। আপনাকে হাত দিয়ে কি সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে ?

উত্তর—হাতটি সোজা বের করে, গোলভাবে তা ঘোরাতে হবে।

প্রশ্ন ১৯—একজন পথচারী অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আড়াআড়িভাবে জংশন পার হচ্ছে। আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন—কি করবেন ?

উত্তর—সবার আগে হর্ণ দিতে হবে। তারপর যে পথ ঠিকমতো পার হচ্ছে জানলে, সাবধানে ধীরে ধীরে তাকে কাটিয়ে গাড়ি চালাবেন।

প্রশ্ন ২০—আপনি ড্রাইভিং করতে করতে এক গলিপথ থেকে অন্য গলিপথে যেতে চান। সেখানে কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—আপনি ব্যাক মিরারে তাকিয়ে দেখবেন গলিপথে ঘুরতে গেলে কোনও অসুবিধা হবে কি না। তারপর উপযুক্ত সিগ্‌ন্যাল দিয়ে ধীরে ধীরে একটি গলি থেকে অন্য গলিতে যেতে হবে। সব দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২১।—আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনলেন। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—আপনি গাড়ির গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব বাঁ দিক দিয়ে যাবেন। দেখবেন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি কোন্ দিক দিয়ে আসছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে দেবেন। গাড়ি দ্রুত ব্রেক কষতে হবে—তারপর সরে যেতে হবে।

কিভাবে গাড়ি দ্রুত ব্রেক কষতে হয় তা ছবিতে দেখানো হলো। A মানে

এ্যাকসিলারেটার, B মানে ব্রেক, ও C মানে ক্লাচ। দ্রুত ব্রেক কষার সময় A তে থেকে পা তুলে B-তে চাপ দিতে হবে।

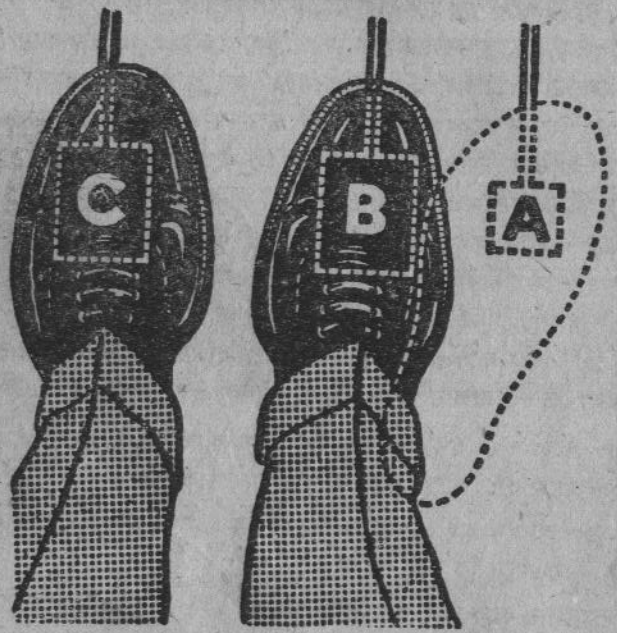

পা দিয়ে গাড়ির হঠাৎ ব্রেক কষার নিয়ম

প্রশ্ন ২২—আপনার গাড়ির সামনে একটি ট্রাম বা বাস থেকে যাত্রীরা নামছে। আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—আপনি বাঁদিক দিয়ে গিয়ে ট্রাম বাসের অন্ততঃ ৫ ফুট পিছনে থাকবেন। গাড়ি থেকে যাত্রীরা নেমে, নিরাপদে ফুটপাতে না ওঠা পর্যন্ত গাড়ি চালাবেন না। যদি ডানদিকে এরূপ গাড়ি থাকে তাহলে অন্যদিক থেকে আগত গাড়ির দিকে এবং যাত্রীর দিকে নজর রেখে হর্ণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে হবে।

প্রশ্ন ২৩—অনেক রাস্তার মোড়ে একটি জটিল ক্রসিং-এ আপনি এসেছেন। সেখানে আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—ধীরে ধীরে আপনার গাড়ির গতি কমিয়ে অবস্থা বুঝে আইনসম্মত-ভাবে গাড়িকে পাশ করাতে হবে। সামনে, পিছনে, ডাইনে ও বামে পূর্ণ দৃষ্টি রাখতেই হবে।

প্রশ্ন ২৪—আপনি একটি গাড়ির পিছন পিছন চলেছেন। সেখানে সামনের গাড়ি থেকে কতটা দূরত্ব রেখে বা কি চিন্তা করে গাড়ি চালাতে হবে ?

উত্তর—আপনি অন্ততঃ একটি গাড়ির সমান দৈর্ঘ্য বজায় রেখে অনুসরণ করবেন। কখনো বেশী কাছে যাওয়া নিয়ম নয়। আপনার গাড়ি সব সময় সামনের গাড়ি যে, গতিতে চলেছে, সেই গতিতে চালাতে হবে।

প্রশ্ন ২৫—যদি আপনার গাড়ির দ্বারা কোনও পথচারী আহত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—আপনাকে সবার আগে গাড়ি থামাতে হবে। লোকটার আঘাত কতটা, তা দেখতে হবে। যদি আঘাত গুরুতর হয় ; সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপনার গাড়িতে করেই হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। আর যদি আঘাত অতি সামান্য হয়, তার নাম ঠিকানা লিখে নিতে হবে এবং নিকটবর্তী—থানায় খবর দিতে হবে।

প্রশ্ন ২৬—আপনি গাড়িকে থামিয়ে দরজা ডানদিকে খুলতে পারেন কি ?

উত্তর—কখনো এরূপভাবে খোলা উচিত নয়। তবে যদি পিছনে গাড়ি না থাকে এবং সামনে সিগ্‌ন্যাল দিয়ে গাড়ির গতি বন্ধ থাকে, তাহলে অল্প সময়ের জন্যে খোলা যায়। তবে তা না করাই ভাল।

প্রশ্ন ২৭—আপনি সবুজ আলোর সংকেত পেয়ে একটি পথের মোড়ে বাঁদিকে গাড়ি ঘোরাচ্ছেন। কয়েক গজ এগিয়ে যাবার পরই, হঠাৎ আলো সবুজ থেকে লাল হয়ে গেল। তখন কি করা কর্তব্য।

উত্তর—সবার আগে দেখতে হবে বাঁদিকের পথে কি ধরনের বা কত গাড়ি আছে। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থা অনুযায়ী চালিয়ে বাঁদিকে ঘুরতে হবে। গাড়ি থামলে পিছনের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে, তা মনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২৮—বেলা ৫টা বাজে। তখন আপনি একজন যাত্রীকে বাঁদিকের

দোকানে জিনিস কেনার জন্য নামাতে চান। সামনে লেখা আছে ৪টা থেকে—৬টা পর্যন্ত নো পার্কিং। এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ?

উত্তর—এক্ষেত্রে গাড়ি থেকে যাত্রীকে নামতে দেওয়া উচিত নয়। আরও এগিয়ে অন্য উপযুক্ত পার্কিং-এর জায়গায় গাড়ি থামাতে হবে। অনেক গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে, গাড়ি সামান্য থামিয়ে যাত্রী নামিয়ে প্রতীক্ষা করে—কিন্তু তা করা উচিত নয়। সব সময় সিগ্‌ন্যাল মেনে চলা উচিত।

প্রশ্ন ২৯—একটা গলির মোড়ে এসেছেন। আপনি দেখলেন সামনে সিগ্‌ন্যাল লেখা বাঁদিকে যান (Left Turn)। আপনি সোজা যেতে চান। কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—ডানদিকে ট্রাফিক না থাকলেও গাড়ি সব সময় বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কখনো সিগ্‌ন্যাল অমান্য করতে নেই।

প্রশ্ন ৩০—একটি গাড়ি থামিয়ে কোনও প্রহরা না রেখে ড্রাইভার একটু অন্যত্র যেতে চায়। তার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—গাড়িকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে তা তালাবন্ধ করে যেতে হবে। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে বন্ধ করে রেখে গেলে আরও ভাল হয়।

প্রশ্ন ৩১—পথে খুব বৃষ্টি, বরফপাত, কুয়াশা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সামনের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে সব কিছু ঘোলাটে দেখাচ্ছে। সেখানে ড্রাইভারের কি করা উচিত ?

উত্তর—অনেক ওয়াইপার চালু রেখে ধীর গতিতে গাড়ি চালান। কিন্তু তা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে কর্তব্য হলো, গাড়িকে পথের একধারে বাঁদিকে নিয়ে গিয়ে তার গতি বন্ধ রাখা।

প্রশ্ন ৩২—আপনি একটি গাড়ির পিছনে আছেন। সামনের গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরছে। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—হর্ণ বাজিয়ে প্রথমে তাকে সাবধান করতে হবে। তারপর তার ডানদিক দিয়ে পথের অবস্থা দেখে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন ৩৩—আপনি দেখলেন সবুজ আলো দেওয়া হলো। কিন্তু মোড় পার হবার আগেই দেখতে পেলেন, সামনে অন্য গাড়ির জন্য পথ বন্ধ। সে ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ?

উত্তর—সিগ্‌ন্যাল দিয়ে পিছনের গাড়ির গতি বন্ধ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হর্ণ দিতে হবে, তাতে সামনের গাড়ি বুঝতে পারবে যে, তারা বে-আইনীভাবে অবস্থান করছে।

তারপর সময়মতো পথ পরিষ্কার হয়েছে দেখে, পথ পার হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়া খুব অন্যায়।

প্রশ্ন ৩৪—আপনি একটি ক্রসিং পার হচ্ছেন। সংকেত সবুজ হলো। এমন সময় দেখলেন সামনে একটা মৃতদেহ নিয়ে ছোট মিছিল যাচ্ছে। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—সবুজ আলো পর্যন্ত গিয়ে, হাত তুলে পিছনের গাড়িকে থামতে সংকেত করে মিছিল চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মিছিল চলে গেলে হর্ণ দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে।

প্রশ্ন ৩৫—আপনার গাড়ি একজন অন্য চালককে চালাতে দিলেন। আপনি তার কাছে কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস দেখে নেবেন ?

উত্তর—দেখতে হবে, তার ড্রাইভিং লাইসেন্স (নিজস্ব) আছে কিনা এবং সে গাড়ি চালাবার নিয়ম-কানুন সব জানে কিনা।

প্রশ্ন ৩৬—গাড়ি থামাবার লাল সংকেত বা পুলিশের সংকেত পেলে কোথায় গাড়িটাকে দাঁড় করাতে হবে ?

উত্তর—মোড়ের থেকে একটু পিছনে যে সাদা দাগ (জেব্রা ক্রসিং) থাকে, সেইখানে গাড়ি থামাতে হবে।

প্রশ্ন ৩৭—আপনি খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাচ্ছেন। আপনার সামনে একটি লরী বাঁক নিচ্ছে। সেখানে কতক্ষণ পরে ওভারটেক করবেন ?

উত্তর—লরীটি সম্পূর্ণ বাঁক নেবার পর। সামান্য জায়গা থাকলেও দ্রুত ওভারটেক করা উচিত নয়, তাহলে দুর্ঘটনার ভয় থাকে। বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। সব সময় মনে রাখতে হবে অতি দ্রুততাই অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়।

প্রশ্ন ৩৮—আপনার সামনে একটা বড় গাড়ি উল্টো দিক থেকে আসছে। আর একটি গাড়ি খুব কম জায়গা দিয়ে ওভারটেক করতে চলেছে। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—গাড়ির গতি খুব কম করে বা বন্ধ রেখে, তাকে ওভারটেকের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৩৯—আপনি গ্রাম বা শহরতলীর পথ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। উল্টো দিকে একটি তীব্র আলো দেখা গেল। আপনি কি করবেন ?

উত্তর—উল্টো দিক থেকে আর একটা গাড়ি আসছে বুঝতে হবে এবং হর্ণ দিয়ে ও সাইড লাইট জেবলে বাঁদিক ঘেঁষে অপেক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন ৪০—একটা পথের কিছু অংশ জলে ডোবা। আপনি তখন কি করবেন ?

উত্তর—আগে দেখতে হবে জল খুব বেশী কিনা ও পার হওয়া যাবে কিনা। যদি জল খুব বেশী না হয় ধীরে ধীরে রাস্তা পার হতে হবে। জল বেশী হলে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৪১—আপনি একটা জলে ডোবা পথ পার হতে গিয়ে দেখলেন, আপনার ব্রেক কাজ করছে না। তখন আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—ব্রেক প্যাডেলকে মাঝে মাঝে চাপ দিয়ে খুব ধীরে ধীরে জলটা পার হবেন। তারপর ব্রেক কাজ করলে ও জল পার হবার পর চালাবেন।

প্রশ্ন ৪২—আপনি পথে একজন মোটরচালককে গাড়ি খারাপ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আপনার কি কর্তব্য ?

উত্তর—গাড়ি থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে হবে, সে আপনার সাহায্য চায় কিনা। চাইলে তাকে সব রকম সাহায্য করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৩—একটি মোড়ের মাথায় আপনার গাড়ি থেমেছে। আপনার ডান-দিকে একটি গাড়ি আছে। সংকেত পেলে কে আগে চালাবে ?

উত্তর—ডানদিকের গাড়িটাই আগে চলবে—তাকে সে সুযোগ না দিলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

প্রশ্ন ৪৪—আপনি একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভার। অপর একজন লোকের গাড়ি চালাবার জ্ঞান আছে, কিন্তু তার লাইসেন্স নেই। আপনি তাকে লাইসেন্স ধার দিতে পারেন কি ?

উত্তর—লাইসেন্স ধার দেওয়া সব সময়ই বে-আইনী।

প্রশ্ন ৪৫—আপনার পিছনের ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে। সে ওভারটেক করতে

চায়। আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—সব সময় গাড়ি বাঁদিকে রেখে ও গতি কমিয়ে তাকে ওভারটেক করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ৪৬—আপনি গাড়ি বাঁদিকে ঘোরাতে চান। কোন্ জায়গায় আপনাকে গাড়ি রাখতে হবে ?

উত্তর—সবচেয়ে বাঁদিকে গাড়ি রাখতে হবে ও মোড় ঘোরার জন্য সিগন্যাল দিতে হবে।

প্রশ্ন ৪৭—রাতের বেলা গভীর কুয়াশার মধ্যে আপনাকে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। সে অবস্থা উপস্থিত হলে আপনার কি করা কর্তব্য ?

উত্তর—সব লাইটগুলি জেবলে হর্ণ দিতে দিতে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে হবে।

পরিশিষ্ট

আরো কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

এ. সি. পাম্প

ইঞ্জিনের যে পাশে ক্যাম শ্যাফট থাকে, এ. সি. পাম্প সেই দিকে থাকে। ইঞ্জিন চালু হলে ক্যাম শ্যাফটের সাহায্যে এ. সি. পাম্পও চালু হয়। এটি চালু হয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে পাইপের সাহায্যে পেট্রোল নিয়ে কারবোরেটারের ফ্লোট চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়। এ. সি. পাম্পের ভিতরে সাতটি অংশ থাকে। যথা—(১) ডায়াফারম, (২) রকার আর্ম, (৩) ইনলেট ভাল্‌ব, (৪) আউটলেট ভাল্‌ব, (৫) স্প্রীং, (৬) ফিলটার নেট এবং (৭) বাওয়েল বা ক্যাপ।

ক্যাম শ্যাফট ঘুরলে রকার আর্মের সাহায্যে এর ডায়াফারম উপর নীচে ওঠানামা করে। যখন ডায়াফারম নেমে আসে তখন ইনলেট ভাল্‌ব খুব পেট্রোল টেনে আনে। ঐ পেট্রোল ফিলটার নেটের ভিতরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে বাওয়েল বা ক্যাপে জমা হয়। আবার যখন ডায়াফারম উপরে ওঠে তখন ইনলেট ভাল্‌ব বন্ধ হয়ে আউটলেট ভাল্‌ব খুলে যায় আর ঐ পথে পরিষ্কার পেট্রোল কারবোরোটারের ফ্লোট চেম্বারে চলে যায়।

কয়েল

কয়েলের কাজ ব্যাটারীর 'কম ভোল্ট' কারেণ্টকে 'বেশী ভোল্ট' কারেণ্টে পরিণত করে ডিস্ট্রিবিউটারে পাঠিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে দু-ধরনের তার জড়ানো থাকে। সরু তাদের নাম 'সেকেণ্ডারী ওয়াইণ্ডিং' ও মোটা তারের নাম 'প্রাইমারী ওয়াইণ্ডিং'। এই বেশী ভোল্ট কারেণ্টের সাহায্যেই প্লাগ পেট্রোল মিকশ্চারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

ডিস্ট্রিবিউটার

ইঞ্জিনের ফায়ারিং ওর্ডার অনুসারে 'বেশী ভোল্ট' কারেণ্টকে ঠিক ঠিক সময়ে প্রতিটি প্লাগে পাঠিয়ে দেয়। ডিস্ট্রিবিউটারের মধ্যে আছে ছয়টি অংশ। যথা—(১) রোটার, (২) কনডেন্সার, (৩) সি, বি, পয়েণ্ট, (৪) সিগমেন পয়েণ্ট, (৫) কার্বন ও (৬) ডিস্ট্রিবিউটার শ্যাফট।

কনডেন্সারের প্রধান কাজ হলো—কারেণ্টকে ধরে 'সি, বি, রয়েণ্ট'কে জ্বলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা, আর রোটারের কাজ—হাই ভোল্ট কারেণ্টকে ঠিক ঠিক প্রতিটি সিগমেন পয়েণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া।

লুব্রিকেশান

ইঞ্জিনের ভিতরে ঘূর্ণায়মান অংশগুলিকে যথাযথ চালু রাখতে হলে ঐ সব যন্ত্রাংশগুলিকে সদা-সর্বদা তেলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এই তেলে ভেজানো বা তৈলসিক্ত প্রথাকে ইংরিজিতে বলা হয় লুব্রিকেটিং।

লুব্রিকেশানের দরুণ ইঞ্জিন খুব ভাল থাকে আর তার কার্যক্ষমতা ও স্থায়িত্বও অনেকগুণ বেড়ে যায়।

ইঞ্জিনের লুব্রিকেটিং সচরাচর দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

যথাঃ—(১) অয়েল পাম্প আর (২) স্প্লাস সিস্টেম।

(১) **অয়েল পাম্প**—ইঞ্জিনের নীচে অয়েল চেম্বারে মবিল থাকে। অয়েল পাম্পের শ্যাফট ইঞ্জিনের ক্যাম শ্যাফটের সঙ্গে পিনিয়ান দিয়ে সংযুক্ত থাকে। ইঞ্জিন চালু হলে ক্যাম শ্যাফটের সাহায্যে অয়েল পাম্পও চালু হয়। তারপর মবিলকে অয়েল চেম্বার থেকে টেনে এনে পাইপের সাহায্যে প্রেসার দিয়ে ইঞ্জিনের ভালব, রকার, শ্যাফট, পুশ রড, ক্যাম শ্যাফট বিয়ারিং, মেন বিয়ারিং, বিগ এন্ড বিয়ারিং ও সিলিণ্ডারের গায়ে পাঠিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনকে ঘর্ষণজনিত উত্তাপ ও ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায়।

(২) **স্প্লাস সিস্টেম**—অনেক ইঞ্জিনে আবার স্প্লাসের সাহায্যে পিস্টনের গায়ে ঐ মবিলকে পাঠানো হয়। এই পদ্ধতি যে কেবল ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশগুলিকে লুব্রিকেটিং করে তা নয়, উপরন্তু ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। সর্বদা উচ্চমানের পরিষ্কার মবিল ব্যবহার করতে হবে, না হলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হতে পারে।

নতুন ইঞ্জিনে প্রথম এক হাজার কিঃ মিঃ গাড়ী চালাবার নিয়ম

নূতন ইঞ্জিনে বিভিন্ন বিয়ারিং এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপরের, ভিতরের বা বাহিরের বিভিন্ন অংশগুলি নূতন অবস্থায় ঠিকমত কর্মক্ষম থাকে না। এই অবস্থায় গাড়ী খুব জোরে চালালে ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়ে বিয়ারিংয়ের উপরের মেটাল বা ধাতুর আবরণ গলে যেতে পারে বা সিলিণ্ডারের ভিতরের পিস্টন 'সীজ' করে

যেতে পারে। তাই যন্ত্রবিজ্ঞানীরা প্রথম একহাজার কিলোমিটার পথ নিম্নলিখিত গতিতে গাড়ীকে চালাবার উপদেশ দিয়েছেন—

(ক) প্রথম ১৫০ কিমি 'টপ গীয়ারে' ঘণ্টায় ৪৯ কিমি হিসেবে এবং 'থার্ড-গীয়ারে' ঘণ্টায় ২৫ কিমি হিসেবে চালাতে হবে।

(খ) ১৫০—৭০০ কিমি 'টপ গীয়ারে' ঘণ্টায় ৬৫ কিমি হিসেবে এবং 'থার্ড' গীয়ারে' ঘণ্টায় ৫০ কিমি হিসাবে চালাতে হবে।

(গ) ৭০০ কিমি—১০০০ কিমি 'টপ গীয়ারে' ঘণ্টায় ৮০ কিমি হিসেবে এবং 'থার্ড'গীয়ারে' ঘণ্টায় ৫৫ কিমি হিসেবে গাড়ী চালাতে হবে।

ট্রান্সমিসন পদ্ধতি

ইঞ্জিনের শক্তি যাদের সাহায্যে চাকার পৌঁছায় ও চাকাকে ঘুরতে সাহায্য করে তাকেই বলে ট্রান্সমিশন পদ্ধতি। এটি চার ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) ক্লাচ, (২) গীয়ার বক্স, (৩) প্রপেলার শ্যাফট এবং (৪) ডিফারেন্সিয়াল।

(১) ক্লাচ—এর কাজ হলো ইঞ্জিনের শক্তিকে গীয়ার বক্সের সঙ্গে যুক্ত করে বা আলাদা করে। নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে ক্লাচ এ্যাসেম্বলী গঠিত। (ক) ক্লাচ, প্লেট, (খ) প্রেসার প্লেট, (গ) স্প্রীং, (ঘ) ফিঙ্গার, (ঙ) ফিঙ্গার ফর্ক, (চ) লক্, (ছ) কভার, (জ) এ্যাডজাস্টিং নাট, (ঝ) ক্লাচ হাউসিং এবং (ঞ) থার্স বিয়ারিং।

ক্লাচ সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়।

১। অয়েল ফিল্ড—আগেকার পুরোনো মডেলের গাড়ীতে ব্যবহৃত হতো।

২। ফ্রিকশান ক্লাচ—এটি ক্লাই হুইল ও ক্লাচ প্লেটের সাহায্যে কাজ করে।

৩। হাইড্রোলিক ক্লাচ—এটি ব্রেকের সাহায্যে কাজ করে। আজকাল ফ্রিকশান ক্লাচ বা হাইড্রোলিক ক্লাচই গাড়ীতে ব্যবহৃত হয়।

(২) গীয়ার বক্স—গীয়ারে বক্সের বিষয়ে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

(৩) প্রপেলার শ্যাফট—এটি দুটি ইউনিভার্সাল জয়েন্ট দ্বারা গীয়ার বক্স আর ডিফারেন্সিয়ালের সঙ্গে যুক্ত থেকে ইঞ্জিনের শক্তিকে ডিফারেন্সিয়াল টেল পিনিয়ানে পাঠিয়ে দেয়।

(৪) ডিফারেন্সিয়াল—এটি গাড়ীর পিছনের দিকে ডিফারেন্সিয়াল হাউসিংএর মধ্যে দুই দিকের এক্সিল—হাফ—শ্যাফটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর

প্রধান কাজ হলো, গাড়ী যখন সোজা চলে তখন পিছনের চাকা দুটিকে সমান শক্তিতে ও সমান গতিতে ঘোরাতে থাকে। গাড়ী যখন কোনো দিকে মোড় নেয় তখন এক চাকার শক্তি অন্য চাকায় পাঠিয়ে গাড়ীকে ভাল ভাবে মোড় নিতে সাহায্য করে।

এর মধ্যে থাকে টেল পিনিয়ান, ক্রাউন পিনিয়ান, স্পাইডার পিনিয়ান ও ব্যাভেল পিনিয়ান।

গাড়ী যখন সোজা চলে তখন স্পাইডার পিনিয়ান থাকে নিষ্ক্রিয় আর যখন কোনো মোড় নেয় তখন পিছনের চাকা দুটির ভারসাম্য বজায় রাখে।

ব্রেক পরীক্ষা

গাড়ী নিশ্চল অবস্থায় ব্রেক পরীক্ষা করতে হলে—ব্রেক প্যাডেল চাপলে যদি ব্রেক প্যাডেল ১"—১½" ইঞ্চি বসে যাবার পর জোরের সঙ্গে চাপতে হয় তাহলে ব্রেক ঠিক আছে। আর যদি সবটা বসে যায় সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে ব্রেক খারাপ আছে বুঝতে হবে।

চালু গাড়ীর ব্রেক পরীক্ষা করতে গেলে গাড়ীকে ঘণ্টায় ২৫ কিমি হিসেবে চালিয়ে ব্রেক করলে, গাড়ী যদি ৫-৬ মিটারের মধ্যে থেমে যায় তাহলে ব্রেকে কোনও দোষ ত্রুটি নেই বুঝবেন।

ব্লিডিং পদ্ধতি

যদি ব্রেক লাইনের ভিতরে বাতাস ঢুকে যায় তবে ব্লিডিং করে বাতাস বের করে দিতে হবে। না হলে ব্রেক কাজ করবে না।

ব্লিডিং করার জন্যে দু'জন লোকের দরকার। একজনকে গাড়ীতে বসে ব্রেক প্যাডেলকে বার কয়েক চাপতে আর ছাড়তে হবে, অন্য জনকে হুইল সিলিণ্ডারের ব্লিডিং নাট্‌কে খুলতে হবে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ব্রেক অয়েলের সঙ্গে বাতাসও ফেনাযুক্ত ভাবে বের হবে। আবার ব্লিডিং নাট্‌কে শক্ত করে আটকে দিতে হবে। আর ব্রেক প্যাডেলকে বার কতক চাপতে ও ছাড়তে হবে ও পুনরায় ব্লিডিং নাট্ খুলতে হবে। এইভাবে কয়েক বার করার পর যখন কেবল ব্রেক অয়েলই বের হবে তখন বুঝতে হবে ব্রেক লাইনে আর বাতাস নেই।

যদি ব্রেক প্যাডেল চেপে ছেড়ে দিলে আর তা উঠে না আসে তবে বুঝবেন

যে মাস্টার সিলিণ্ডারে তেল কম আছে কিংবা ব্রেক প্যাডেলের রিটার্ণিং স্প্রীং অকেজো হয়ে গেছে। তখন নতুন করে মাস্টার সিলিণ্ডারে ব্রেক অয়েল দিতে হবে বা নতুন একটা রিটার্ণিং স্প্রীং লাগাতে হবে।

টায়ার ব্যবহার করার নিয়ম

১। টায়ারে বেশী কিংবা কম হাওয়া ভরলে টায়ার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই সব সময়ে ঠিকমত হাওয়া ভরা উচিত।

২। গাড়ীতে মাল বোঝাই করার সময়ে একদিকে বেশী, আর একদিকে কম মাল তুললে গাড়ী একদিকে ঝুঁকে থাকে, তাতে চাপ বেশী পড়ার দরুণ ঐ দিকের টায়ার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই সমান ভাবে সব দিকে মাল বোঝাই করা উচিত।

৩। বেশী স্পীডে গাড়ী চালালে, ঘন ঘন ব্রেক চাপলে কিংবা হঠাৎ ব্রেক চাপলে কিংবা খারাপভাবে মোড় নিলে টায়ারের যে শব্দ হয় তাতে টায়ারের টেকসইতা কমে যায়।

৪। গাড়ীর চাকার টায়ার মাঝে মাঝে আগু পিছু করে পাল্টে দিলে সমান ঘর্ষণ ও চাপের জন্য অনেক দিন চলতে পারে।

৫। বেশী ঘষা অর্থাৎ প্লেন টায়ার কখনো ব্যবহার করবেন না। টায়ারকে রোদ, পেট্রোল ও অন্যান্য তেল লাগার হাত থেকে রক্ষা করার সাধ্যমত চেষ্টা করা দরকার।

চালকের বসার নিয়ম

গাড়ীর চালককে এমন ভাবে তাঁর সীটে বসতে হবে, তিনি যেন বসলে তাঁর সামনের দৃশ্য সোজাভাবে ও ভালভাবে দেখতে পান। যদি তিনি গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্রাংশগুলিতে হাত ও পা সহজে নাড়াচাড়া করতে পারেন তবেই তিনি বেশী পরিশ্রম না করে, বহু সময় ধরে, বহু দূর পর্যন্ত সুচারু ভাবে গাড়ী চালাতে পারবেন।

ঠিক ভাবে হাঁটু মুড়ে না বসলে বা ঠিক ভাবে স্টীয়ারিং ধরতে না পারলে হাঁটুতে ও বাহুতে ব্যথা হবে। প্যাডেল চাপবার সময় গোড়ালি যাতে সব সময় গাড়ীর ফুটবোর্ডে লেগে থাকে সে ভাবে বসার চেষ্টা করবেন। স্টিয়ারিংয়ের

সঙ্গে খুব কাছাকাছি হয়ে বসবেন না, অন্তত কাঁট দুটো যেন কম করেও ২৫-৩০ সেমি দূরে থাকে।

সব সময় নিজের সুবিধা অনুযায়ী ও দরকার মত ড্রাইভিং সীটকে এদিক-ওদিক সরিয়ে, পিঠে বা কোমরে অথবা পাছার তলায় কিছু রেখে বসতে পারেন। বসবার পর সীটে বসে রিয়ার ভিউ আয়নাটাকে ঠিক মত জায়গায় স্থাপন করবেন—যাতে আপনি বসে বসেই আয়না দিয়ে পিছনের দিক অনায়াসে লক্ষ্য করতে পারেন।

সাধারণ জ্ঞান

প্রশ্ন ঃ—ব্লু বুক কি? তাতে কি লেখা থাকে?

উত্তর ঃ—ব্লু বুক থেকে গাড়ীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতেগাড়ীর 'ওনার'-এর নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশান নম্বর, চেসিস ও ইঞ্জিনের নম্বর, কত হর্স-পাওয়ার ও কত সিলিণ্ডারের ইঞ্জন, কোন মডেলের, কোন সালের ও কোন কোম্পানীর গাড়ী, খালি গাড়ির ওজন, কত ওজনের মাল বইতে পারে, কত লোক বসতে পারে ইত্যাদি। মোটর ভিকলস্ অথরিটি এই ব্লু বুক ইসু করে থাকেন। যদি কখনো গাড়ীর কোন কিছু পরিবর্তন হয় তাব মোটর ভিকলস্ ডিপার্টমেণ্টে তা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে ব্লু বুক রেকটিফাই করে নিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ—ট্যাক্স টোকেন কি? এতে কী লেখা থাকে?

উত্তর ঃ—পথে গাড়ী চালাবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যে ট্যাক্স দিতে হয়, এটা তারই রসিদ। ড্রাইভারের সামনের কাচে বাঁ দিকে লাগানো থাকে। এতে গাড়ীর নম্বর, কতদিনের ট্যাক্স জমা দেওয়া হয়েছে—তার তারিখ ইত্যাদি লেখা থাকে।

প্রশ্ন ঃ—গাড়ী চালাতে চালাতে চালককে কি কি জিনিসের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে?

উত্তর ঃ—১। এম-মিটার, ২। অয়েল মিটার, ৩। হীট মিটার, ৪। স্পীডো মিটার লক্ষ্য করতে হবে। ৫। রিয়ার ভিউ দিয়ে পিছন দিক লক্ষ্য করতে হবে। ৬। রাত্রিকালে গাড়ীর হেডলাইট, সাইড লাইট বা ব্যাক লাইট জ্বলছে কিনা।

প্রশ্ন ঃ—গাড়ীতে সাধারণতঃ কি কি তেল দিতে হয়?

উত্তর :—গাড়ীতে সাধারণত ৫ রকমের তেল দিতে হয়—পেট্রোল, মবিল, গীয়ার অয়েল, ব্রুড অয়েল আর ব্রেক অয়েল।

প্রশ্ন :—কত কিমি অন্তর মবিল পাল্টাতে হয় ?

উত্তর :—নতুন ইঞ্জিন হলে ৮০০ কিমি, পুরোনো ইঞ্জিন হলে ৩০০০ থেকে ৫০০০ কিমি পথ চলার পর মবিল পাল্টানো দরকার।

প্রশ্ন :—মবিল বেশী হলে কী ক্ষতি হবে ?

উত্তর :—মবিল বেশী হলে প্লাগে মবিল উঠে যায়। ফলে ফায়ারিং চেম্বারে ঠিকমত ফায়ারিং হয় না। তখন মবিল চেম্বারের তলায় যে ড্রেন প্লাগ থাকে তা খুলে বাড়তি মবিলটুকু বার করে দিতে হয়।

প্রশ্ন :—গীয়ার অয়েল কত কিমি অন্তর পাল্টাতে হয় ?

উত্তর :—গাড়ী ১৫০০০ কিমি পথ চলার পর পাল্টানো দরকার।

প্রশ্ন :—ব্রুড অয়েল কোথায় দিতে হয় ? কত কিমি অন্তর পাল্টে দিতে হয় ?

উত্তর :—ব্রুড অয়েল ডিফারেন্সিয়াল হাউসিং এর স্টিয়ারিং বক্সে দিতে হয়। এই তেল প্রতি ১৫০০০ কিমি পথ চলার পর পাল্টে পাল্টে দিতে হয়। ডিফারেন্সিয়াল হাউসিং-এর মাঝখানে একটি লেভেল প্লাগ থাকে, তাকে খুলে ঐ তেল দিতে হয়।

প্রশ্ন :—গাড়ীতে পেট্রোল কিংবা মবিল বেশী খরচ হচ্ছে কিনা কি করে বোঝা যায় ?

উত্তর :—একজস্ট পাইপ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া বার হলে পেট্রোল আর নীল ধোঁয়া বার হলে মবিল বেশী খরচ হচ্ছে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন :—এয়ার ক্লীনার কোথায় থাকে ? কাজ কি ? কার ভিতরে থাকে ?

উত্তর :—এটি থাকে কারবোরেটারের উপরে লাগানো। বাইরে থেকে যে বাতাস কারবোরেটারে ঢোকে, তাকে ছেঁকে পরিষ্কার করে দেয়। এর ভেতর পাতলা তারের জাল ও মবিল থাকে।

প্রশ্ন :—ইঞ্জিনে কয়টি পুলি থাকে ? কি কি ? তাদের কাজ কি ?

উত্তর :—ইঞ্জিনে তিনটি পুলি থাকে—স্টার্টিং পুলি, ডায়নামো পুলি ও ওয়াটার পাম্প পুলি।

ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট ঘুরলে স্টার্টিং পুলি ঘুরবে। এবং ওটি ঘুরে ক্যান বেল্টের সাহায্যে অপর দুটি পুলিকে ঘোরায়। ডায়নামো পুলি ঘুরে ডায়নামো চালু করে এবং ওয়াটার পাম্প পুলি ঘুরলে ওয়াটার পাম্প চালু হয় এবং পাখা ঘুরতে শুরু হয়।

প্রশ্ন :—ঢালু পথে হঠাৎ ব্রেক ফেল করলে কি করতে হবে ?

উত্তর :—ইগ্নিশান সুইচকে বন্ধ করে গাড়ীকে নীচু গীয়ারে আনতে হবে।

প্রশ্ন :—একবার ইলেকট্রিক হর্ণ বাজাবার পর তা একটানা বেজে গেলে কি করতে হবে ?

উত্তর :—'কাট-আউট'-এর তার খুলে দিলেই থেমে যাবে।

প্রশ্ন :—ইগ্নিশান সুইচ চালু করার পর এম-মিটারে চার্জ দেখাবার কারণ কি ?

উত্তর :—ব্যাটারীর তার উল্টোপাল্টা লাগালে এমন দেখায়। ইঞ্জিন চালু করলে ডিসচার্জ দেখাবে।

প্রশ্ন :—গাড়ী চলবার সময় ধাক্কা দিতে দিতে বন্ধ, আবার কখনো কোনো শব্দ না করে বা ধাক্কা না দিয়েই বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী ?

উত্তর :—ধাক্কা দিতে দিতে গাড়ী বন্ধ হয়ে গেলে বুঝতে হবে পেট্রোল লাইনে কোনো গোলমাল ঘটেছে ; আর নিঃশব্দে কিংবা ধাক্কা না দিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে ইলেকট্রিক লাইনে কোনো গোলমাল ঘটেছে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন :—গাড়ীতে ব্রেক প্যাডেল চাপলে গাড়ী কখনো কখনো একদিকে সরে যায় কেন ?

উত্তর :—(ক) যদি ব্রেক লাইন ঠিকমত অ্যাডজাস্ট না করা থাকে, (খ) যদি চার চাকার ঠিকমত হাওয়া না ভরা থাকে, (গ) যদি পথ পিছল থাকে, (ঘ) স্পীডে চালাতে চালাতে হঠাৎ যদি ব্রেক কষা হয়।

প্রশ্ন—ক্লাচের প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তর—ইঞ্জিন আর গীয়ারে বক্সের মাঝখানে থাকে ক্লাচ। গাড়ির বিভিন্ন গতিবেগের সময় ইঞ্জিনের পাওয়ার এর মাধ্যমেই গীয়ার বক্সে সঞ্চালিত হয়।

প্রশ্ন—গীয়ার বক্স থাকার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—গীয়ার বক্স থাকার উদ্দেশ্য ২টি : (১) গাড়ির গতিশক্তির পরিবর্তন

করা আর (২) গাড়িকে পিছুদিকে চালান। গীয়ারের অবস্থান পাল্টে এই দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্রশ্ন—এ্যাক্সিল কত টাইপের হয়?

উত্তর—এ্যাক্সিল প্রধানতঃ দু' টাইপের হয়। (১) ডেড এবং (২) লাইভ। ডেড এ্যাক্সিল থাকে গরুর গাড়িতে। এটি দৃঢ়ভাবে থাকে, চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে না শুধু চাকাই ঘোরে। আর লাইভ এ্যাক্সিল চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে নিজেও ঘুরপাক খেতে থাকে।

প্রশ্ন—লাইভ (বা রিয়ার) এ্যাক্সিল কত টাইপের হয়?

উত্তর—লাইভ (বা রিয়ার) এ্যাক্সিল প্রধানতঃ তিন টাইপের হয়। (১) হাফ ফ্লোটিং (২) থ্রী-কোয়ার্টার ফ্লোটিং আর (৩) ফুল ফ্লোটিং।

প্রশ্ন—টায়ার কত রকমের হয়?

উত্তর—টায়ার দু' রকমের হয়। (১) টিউব সমেত আর (২) টিউব ছাড়া।

প্রশ্ন—টায়ার সচরাচর কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

উত্তর—অত্যধিক ভ্রমণ ছাড়াও নানাবিধ তেল, গ্রীজ আর ডিজেল ফুয়েল টায়ারের ক্ষতি করে। ইলেকট্রিক মোটর, গ্যাস হীটার এবং প্রখর সূর্যের আলোও টায়ারের ক্ষতির অন্যতম কারণ। সূর্যের আলোয় যে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি থাকে তা লেগে লেগে টায়ার ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে।

প্রশ্ন—কোন টায়ারের সাইজ যদি ৮০০ × ১৪ হয় তবে তার ব্যাস কত হবে? ১৬", ২৮" না ৩০"?

উত্তর—৩০"।

প্রশ্ন—ব্রেক মাঝে মাঝে অকার্যকর হয় কেন?

উত্তর—অতিরিক্ত তৈলাক্ত, খারাপ অথবা ভুল টাইপে ব্রেক লাইনিং ব্যবহার করার জন্য।

প্রশ্ন—ব্রেকের কার্যকারিতা যদি শতকরা ৩০. ৫০. ৭০ ভাগ হয় তবে ঐ কার্যকারিতাকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

উত্তর—শতকরা ৩০ ভাগ হলো বিপজ্জনক; ৫০ ভাগ মাঝারি; আর ৭০ ভাগ হলো খুব ভাল।

প্রশ্ন—সাসপেনসন কাকে বলে আর তার কাজ কী?

উত্তর—বিভিন্ন আকৃতির স্প্রীং গাড়ির সামনে ও পিছনের এ্যাক্সিলে ফিট্ করা থাকে। রাস্তার ঝাঁকুনি বা উঁচুনীচু পথের ধাক্কা এই স্প্রীংগুলি সহ্য করে গাড়িকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ধকল সহ্য করার এই প্রণালীকেই সাসপেনসন বলে। তাই সাসপেনসনের কাজ হলো যে কোন ধরনের পথে গাড়িকে মসৃণভাবে চালানো।

প্রশ্ন—ইন্টারনাল কম্বাসশান ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর—যে ইঞ্জিন তার নিজের অভ্যন্তর ভাগেই জ্বালানিকে দাহ করে, তাকেই ইন্টারনাল কম্বাসশান ইঞ্জিন বলে। যেমন—পেট্রোল আর ডিজেল চালিত মোটর গাড়ির ইঞ্জিন।

প্রশ্ন—এক্সটারনাল কম্বাসশান ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর—যে ইঞ্জিন তার বাইরে অন্যত্র তার জ্বালানিকে দাহ করে তাকেই বলে এক্সটারনাল কম্বাসশান ইঞ্জিন। যেমন—লোকোমোটিভ ইঞ্জিন এবং শিল্পাদিতে ব্যবহৃত কল-কারখানার ইঞ্জিন।

প্রশ্ন—কার্বোরেটার থেকে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে পেট্রোল প্রবাহিত হবার পেট্রোল পাম্প কত রকমের হয়?

উত্তর—দু' রকমের। (১) যান্ত্রিক আর (২) বৈদ্যুতিক।

প্রশ্ন—কার্বোরেটারের কাজ কী?

উত্তর—পেট্রোল আর বাতাসের অক্সিজেনের মিশ্রণ ইঞ্জিনের কম্বাসশান চেম্বারে গিয়ে পুড়তে থাকে। কার্বোরেটারের কাজ হলো এই পেট্রোল ও বাতাসের অক্সিজেনের সঠিক পরিমাণে মিশ্রিত করার একটা কল।

প্রশ্ন—এয়ার ফুয়েল রেশিও 15 : 1 বলতে কি বোঝায়?

উত্তর—অর্থাৎ 15 kg বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে তা 1 kg পেট্রোলকে পোড়াতে পারে।

প্রশ্ন—গাড়ির কোন কোন অংশে প্রধানতঃ লুব্রিকেশান বা তৈলাক্ত করার দরকার?

উত্তর—১। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট্ বিয়ারিং, ২। ক্র্যাঙ্কপিনস্, ৩। বিগ এণ্ড কানেক্টিং রড, ৪। স্মল এণ্ড কানেক্টিং রড, ৫। গাজন পিনের বুশ, ৬।

সিলিণ্ডারের ভিতরের অংশ, ৭। পিস্টন রিং, ৮। গীয়ার ৯। ক্যামশ্যাফট, ১০। ভালব অপারেটিং মেকানিজিম বিয়ারিং ইত্যাদি।

প্রশ্ন—রেডিয়েটারের ক'টি অংশ ?

উত্তর—৫টি। যথাক্রমে : রেডিয়েটার্ সটল, ওভার ফ্লো পাইপ, ক্যাম এবং টপ।

প্রশ্ন—রেডিয়েটার কীভাবে কার্যকরী রাখা যায় ?

উত্তর—প্রধানতঃ ৩টি উপায়ে রেডিয়েটার বহুদিনের জন্য কার্যকারী রাখা যায়। প্রথমতঃ, ওয়াটার পাইপের ক্লিপ একটি স্ক্রু-ডাইভারের সাহায্যে যথেষ্ট ভাবে আঁট করে রাখতে হবে ; দ্বিতীয়তঃ রেডিয়েটারের জাল আর বাতাস চলাচলকারী ছিদ্রগুলিকে সব সময় পরিষ্কার ও উন্মুক্ত রাখতে হবে : তৃতীয়তঃ নিয়ম করে বছরে ৩।৪ বার রেডিয়েটারকে জল আর বাতাসের সাহায্যে ফ্লাশ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন—গাড়িতে ব্যাটারী রাখা হয় কেন ?

উত্তর—গাড়িতে ব্যাটারী রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, ব্যাটারী হলে শক্তির ভাণ্ডার। ডায়নামো থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি এতে এসে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জমা হয়। প্রয়োজন মত এই শক্তিকে ইঞ্জিনে যথেচ্ছা ব্যবহার করা যায়। ইঞ্জিন যখন বন্ধ থাকে তখন ঐ রাসায়নিক শক্তি পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি রূপে স্টার্টার, ইগ্নিশান সিস্টেম এবং লাইটিং সিস্টেম সঞ্চালিত করা যায়।

প্রশ্ন—গাড়িতে ডায়নামো থাকে কেন ?

উত্তর—ব্যাটারী হলো ডাইরেক্ট কারেণ্টের ভাণ্ডার। ব্যাটারীকে সব সময়ে চার্জড কণ্ডিশানে রাখার জন্যই গাড়িতে ডায়নামো রাখতে হয় আর এই ডায়নামো রাণ করে ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের সাহায্যে।

সমাপ্ত